
অভিরূপ সরকার
চৌধুরি বাড়ির রহস্য
চৌধুরি বাড়ির রহস্য

# চৌধুরি বাড়ির রহস্য

## অভিরূপ সরকার

**পাবলিশিং প্লাস**
২০৬, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬

CHOWDHURY BARIR RAHASHYA

*by*

Abhirup Sarkar

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা ২০১৯

পুনর্মুদ্রণ : অক্টোবর ২০১৯

প্রচ্ছদ : সৌজন্য

প্রকাশক : দীপ্তাংশু মণ্ডল

২০৬, বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক : কল্পনা অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৫

নীরেনকাকার স্মৃতির উদ্দেশে

# মুখবন্ধ

ছেলেবেলা থেকেই গোয়েন্দা কাহিনির উৎসাহী পাঠক ছিলাম, বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই উৎসাহ বেড়েছে বই কমেনি। হাতের কাছে স্বদেশি-বিদেশি যেকোনও গোয়েন্দা গল্প পেলেই গোগ্রাসে পড়েছি। তবে কোনও দিন ভাবিনি, নিজেই আস্ত দুটি গোয়েন্দা উপন্যাস লিখে ফেলতে পারব। বছর কুড়ি আগে একবার আট-ন'মাসের জন্য মার্কিন দেশে অধ্যাপনা করতে গিয়েছিলাম। পরিবার সঙ্গে যেতে পারেনি। একা একা সন্ধেগুলো কাটতেই চাইত না। নিসঙ্গতা এড়াতে 'ভূতুড়ে টেলিফোন' লিখতে শুরু করি। শুরু হলেও সে যাত্রা উপন্যাসটা শেষ করা হয়নি, বহু বছর সেটা অসমাপ্ত অবস্থায় পড়েছিল। তারপর বছর দুয়েক আগে যখন সদ্যপ্রয়াত কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী উৎসাহ দিলেন তখন মনে হল লেখাটা শেষ করা দরকার। বস্তুত, তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা, উৎসাহ এবং প্রশ্রয় না পেলে লেখাটা শেষই হত না। সেই প্রেরণা সম্বল করে অন্য উপন্যাস 'চৌধুরি বাড়ির রহস্য'-ও লিখে ফেললাম। আমার পরম সৌভাগ্য, এই উপন্যাসটাও নীরেন্দ্রনাথ আদ্যোপান্ত পড়ে পরিমার্জনা করে দিয়ে গেছেন। এই প্রসঙ্গে আমার বিলেত-প্রবাসী বন্ধু পরন্তপ বসুর কথাও বলা দরকার, যাঁর অনর্গল পরামর্শ দুটি উপন্যাসকেই সমৃদ্ধ করেছে।

আমার আগে কোনও পেশাদার অর্থনীতিবিদ গোয়েন্দা কাহিনি লিখতে সাহস করেছেন কিনা জানি না। তবে উপন্যাস দুটো লিখতে লিখতে মনে হচ্ছিল গোয়েন্দা কাহিনি লেখার সঙ্গে তাত্ত্বিক অর্থনীতি গবেষণার মিল আছে। দুটি ক্ষেত্রেই নিশ্ছিদ্র যুক্তির কাঠামো তৈরি করতে হয়, যুক্তির সঙ্গে কল্পনাকে মেশাতে হয়, কল্পনার সঙ্গে মেশাতে হয় বাস্তবকে।

'ভূতুড়ে টেলিফোন' ১৪২৫ সালের শারদীয় 'সংবাদ প্রতিদিন'এ প্রকাশিত হয়েছিল, 'চৌধুরি বাড়ির রহস্য' আগে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। দীপ প্রকাশনের কর্ণধার শ্রী শংকর মণ্ডলের উৎসাহে লেখা দুটি বই হয়ে বেরল। তাঁর কাছে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

**অভিরূপ সরকার**

# সূচিপত্র

চৌধুরি বাড়ির রহস্য
ভূতুড়ে টেলিফোন

# চৌধুরি বাড়ির রহস্য

## পূর্বকথা

বউবাজার অঞ্চলের একটা প্রায়ান্ধকার সরু গলির ভেতর অতি প্রাচীন একটা বাড়ির সামনে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। বাড়ির গা দিয়ে বটের ঝুরি নেমেছে। রাত নটা। ট্যাক্সি থেকে নামল পাজামা শার্ট পরা গায়ে আলোয়ান জড়ানো গ্রাম্য চেহারার এক যুবক আর আটপৌরে শাড়ি পরা, ঘোমটা দেওয়া এক যুবতী। যুবকের গালে কয়েকদিনের না কামানো দাড়ি, কাঁধে ক্যাম্বিসের ব্যাগ। যুবতীর হাতে শাঁখা-পলা-লোহা, দুগাছা ইমিটেশন চুড়ি। দুজনে খানিকটা ভয়ে ভয়ে সদর দরজা পেরিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকল। ভেতরটা গলির থেকেও অন্ধকার। একটু আগে কিছু শব্দ করে ট্যাক্সিটা চলে গেছে। এখন চারদিকে থমথমে নিস্তব্ধতা।

মনে হয় বাড়ির সব লোকজন এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে, কিংবা হয়তো এ-বাড়িতে কেউ থাকেই না। যুবকটি ব্যাগ থেকে একটা টর্চ বার করে চারদিকটা দেখে নিল। তারপর তার সঙ্গিনীকে নিচু স্বরে বলল, 'ওই দিকে একটা সিঁড়ি দেখতে পাচ্ছি। চল দোতলায় উঠে দেখি।'

তারা সন্তর্পণে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। সঙ্গিনী বলল, 'রেলিং-এর দিকে বেশি যেয়ো না। নড়বড় করছে।'

যুবক-যুবতীর উচ্চারণে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার টান। দোতলায় উঠে দেখা গেল কোণের দিকে একটা ঘরের বন্ধ দরজার তলা দিয়ে একটু আলো আসছে। তারা ধীরে ধীরে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। যুবকটি দরজায় টোকা দিয়ে চাপা গলায় ডাকল, 'কবিরাজ মশাই, কবিরাজ মশাই।'

উত্তর নেই। উত্তর না পেয়ে আর একটু গলা তুলে যুবকটি বলল, 'কবিরাজ মশাই, দরজা খুলুন, আমরা গোসাবা থেকে আসছি।'

এবার দরজার আড়ালে হাঁটাচলার শব্দ শোনা গেল। এক সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ দরজা খুলে বললেন, 'ভেতরে এস।'

ঘরের একদিকে একটা তক্তপোশ, একটা অতি প্রাচীন আরাম-কেদারা, বাকি তিন দিকের দেয়াল জুড়ে শেকড়-বাকড়, ওষুধ-পত্র ঠাসা পুরোনো আমলের কাচের আলমারি। ঘরে ঢুকলেই বোঝা যায় ঘরের মালিক আয়ুর্বেদের চর্চা করেন। বদ্ধ ঘরের বাতাসে একটা ওষুধ-ওষুধ গন্ধ থমকে রয়েছে। বৃদ্ধ কবিরাজ মশাই আরাম-কেদারাটি দখল করে বসলেন। যুবক-যুবতী বসল তক্তপোশের ওপর। কবিরাজ মশাই তাঁর অতিথিদের কিছুক্ষণ চোখ দিয়ে জরিপ করলেন। তারপর বললেন, 'তোমাদের নাম বল।'

'আমার নাম বিজয়, বিজয় মাকাল। আর ইনি আমার ইস্ত্রী করবি মাকাল। আমরা আপনাকে চিঠি দিয়েছিলাম। আপনি পত্তর দিয়ে আমাদের আসতে বলেছিলেন। এই দেখুন।'

যুবকটি শার্টের বুকপকেট থেকে একটি পোস্টকার্ড বার করে বৃদ্ধের হাতে দিল। বৃদ্ধ পোস্টকার্ডটি ভাল করে দেখে ফেরত দিয়ে বললেন, 'তোমাদের তো সন্ধে সাতটায় আসার কথা ছিল। এত দেরি করলে কেন?'

'কী করব কবিরাজ মশাই, সেই ভোরবেলা উঠে ইস্টিমার ধরেছি। তখনও ভাল করে আলো ফোটেনি। ক্যানিং পৌঁছে শুনি ট্রেনের গন্ডগোল। কখন ছাড়বে কোনও ঠিক নেই। সারাদিন বসে রইলুম। বিকেলের আগে ট্রেন ছাড়ল না। শেয়ালদায় ঢুকল সাড়ে আটটায়। এদিকটা তো ভাল চিনি না। ভাবলুম একটা ট্যাক্সি নিয়ে নিই। গৌর দে লেন সে-ই চিনিয়ে নিয়ে যাবে। তা এতটা কম রাস্তা কেউ আসতে চায় না। শেষে হাতে-পায়ে ধরে, বেশি টাকা কবুল করে এক ব্যাটাকে রাজি করিয়ে এখানে এলুম।'

'এলে তো বটে, কিন্তু ফিরবে কী করে? কলকাতায় থাকার জায়গা আছে?'

'হ্যারিসন রোডে একটা হোটেল আছে। আমাদের গেরামের লোক কলকাতায় এলে সেখানে থাকে। সেখানে জানিয়ে রেখেছি। মনে হয় রাত্তিরটুকু কাটানোর ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

যুবতীটির অবগুণ্ঠন কিছুটা সরে গিয়েছিল। কবিরাজ মশাই লক্ষ করলেন যুবতীটির রং ময়লা, মাথাভরা সিঁদুর, কপালে সস্তার টিপ, বাঁদিকের গালে একটা লালচে জড়ুল, চেহারায় বেশ চটক আছে। খুব

হালকাভাবে কবিরাজ মশায়ের মনে হল মেয়েটিকে তিনি যেন কোথায় দেখেছেন। তবে কোথায়, তিনি মনে করতে পারলেন না। তিনি যুবকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী করা হয়?'

'আজ্ঞে, গোসাবা-হ্যামিলটন অঞ্চলে কয়েকটা মাছের ভেড়ি আছে। শ্রীমানি মার্কেটে মাছ চালান যায়।'

'তাহলে তো তোমাকে মাঝে মাঝেই কলকাতায় আসতে হয়। কলকাতা চেন না কেন?'

'আমি খুব বেশি কলকাতায় আসি না। আমার ভাই এদিকটা সামলায়। আমি ভেড়িগুলো দেখাশোনা করি।'

'তা বেশ, তা বেশ।' কবিরাজ মশাই কিছুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবলেন। তারপর থেমে থেমে বললেন, 'এবার কাজের কথায় আসি। তোমাদের সমস্যাটা তো চিঠিতে লিখেছ। এব্যাপারে কোনও অ্যালোপ্যাথি ডাক্তার দেখিয়েছ তোমরা? রিপোর্ট-প্রেসক্রিপশন কিছু আছে?'

'ডায়মন্ডহারবার হাসপাতালে দেখিয়েছিলুম। কাগজপত্তর সব সঙ্গে এনেছি। আপনি তো আনতে বলেছিলেন।'

বিজয় মাকাল তার ক্যাম্বিসের ব্যাগ থেকে একতাড়া কাগজ বার করল। কাগজগুলো হাতে নিয়ে কবিরাজ মশাই বললেন, 'আমরা সাত পুরুষের কবিরাজ। কিন্তু তা বলে অ্যালোপ্যাথি শাস্ত্রটাকে ধুর ছাই করি না। আমার বাবা মেডিকেল কলেজের পাশ করা ডাক্তার ছিলেন যদিও আয়ুর্বেদ ছাড়া অন্য কোনও চিকিৎসা কখনও করেননি। বাবা আমাকে কারমাইকেল থেকে ডাক্তারি পাশ করিয়ে তারপর আয়ুর্বেদ চর্চার অনুমতি দিয়েছিলেন। আমার ছেলে আর বউমাও অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার, বিলেতে থাকে। কিন্তু ওরা বাপ-দাদার এত পুরুষের আয়ুর্বেদ চর্চাটা আর রাখল না। আমিই আমাদের কবিরাজ বংশের শেষ প্রদীপ, টিমটিম করে জ্বলছি। অ্যালোপ্যাথদের শাস্ত্রে এমন অনেক কিছু আছে যা আমাদের নেই। আমি তাই আমার রুগিদের দরকার মতো অ্যালোপ্যাথিক পরীক্ষা-টরিক্ষাগুলো করিয়ে আনতে বলি। তবে হ্যাঁ, শেষ কথাটা কিন্তু আয়ুর্বেদ শাস্ত্রই বলতে পারে। আমি বহুবার প্রমাণ করে দিয়েছি, অনেক অসুখে অ্যালোপ্যাথির চিকিৎসা নেই কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে আছে।'

কবিরাজ মশাই চুপ করলেন। কিছুক্ষণ মন দিয়ে রিপোর্ট-প্রেসক্রিপশনগুলো দেখলেন। তারপর করবী মাকালের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দ্যাখো মা, এই রিপোর্টগুলো থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে তুমি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। যা কিছু খামতি সব তোমার কর্তার। তা তোমার কর্তার জন্য আমি ওষুধ তৈরি করে রেখেছি। সমস্যা হল, ওষুধটা মারাত্মক কড়া। হার্টের অবস্থা খুব শক্তপোক্ত নাহলে এই ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। হার্ট দুর্বল হলে ওষুধ খাওয়ার পর হার্ট ফেল হতে পারে। তাই আগে তোমার কর্তাকে আমি পরীক্ষা করে দেখব। তারপর ঠিক করব আদৌ ওষুধটা দেব কিনা।'

করবী মাকালের মুখে চিন্তার ছাপ পড়ল। সে তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে ভয়ার্ত গলায় বলল, 'আমার এসবের দরকার নেই। তোমার কোনও ক্ষতি হলে আমি মরে যাব।'

বৃদ্ধ বধূটিকে স্নিগ্ধভাবে বললেন, 'মা, তোমার এই বুড়ো ছেলেটাকে পুরো বিশ্বাস করতে পার। পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল কোবরেজি করছি। কতবার কত লোককে যে এই ওষুধটা দিয়েছি তার হিসেবও রাখিনি। অনেককে আবার, তাদের শরীরের অবস্থা দেখে, ওষুধটা দিইনি। যাদের ওষুধটা দিয়েছি, তাদের বেশিরভাগেরই উপকার হয়েছে। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয়ওনি। আমি তো আর ভগবান নই যে সব অসুখ সারাতে পারব। তবে একটা কথা জোর দিয়ে বলতে পারি। আমার ওষুধ খেয়ে অপকার হয়েছে এমন লোক একটাও নেই। অপকারের কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকলে আমি নাড়ি দেখে টের পাই। তাকে আমি ওষুধটা দিই না। এবার কী করবে তোমরাই ঠিক করো।'

এবার বিজয় মাকাল মুখ খুলল। বলল, 'ওসব মেয়েলি কথায় আপনি কান দেবেন না কবিরাজ মশাই। ও কী বলতে কী বলেছে। ও কি কিছু বোঝে? আপনি আমাকে পরীক্ষা করে দেখুন। যদি সব ঠিকঠাক মনে হয়, ওষুধ দিন। নাহলে আর কী করা যাবে। মন খারাপ নিয়ে ফিরে যেতে হবে।'

বিজয় মাকাল কবিরাজ মশাই-এর দিকে আর একটু সরে এল। কবিরাজ বললেন, 'অ্যালোপ্যাথি রিপোর্টে দেখছি তোমার হার্টের অবস্থা যথেষ্টই ভালো। আমি নাড়ি দেখে সেটা যাচাই করে নেব। আমার দিকে আর একটু সরে এস। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিকভাবে নেবে। বেশি নড়াচড়া করবে না। নাড়ি দেখতে আমার একটু সময় লাগবে। ধৈর্য ধরে বসবে।'

কবিরাজ মশাই বিজয়ের নাড়ি ধরে চোখ বন্ধ করলেন। বোঝা যায় তিনি প্রবলভাবে মনঃসংযোগ করছেন। ঘরে নিখাদ স্তব্ধতা। হঠাৎ বাইরের গলি দিয়ে একটা রিক্সা চলে যাবার শব্দ শোনা গেল। আবার অনেকক্ষণ কোনও শব্দ নেই। একটা টিকটিকি টিকটিক করে উঠল। আবার স্তব্ধতা। বিজয় মাকাল একটু উসখুস করছে। তার স্ত্রী কিন্তু একগলা ঘোমটা টেনে ঠায় মাথা নিচু করে বসে আছে, নড়ন-চড়ন নেই, সাড়াশব্দ নেই।

প্রায় মিনিট দশেক পরে কবিরাজ মশায় চোখ খুললেন। বিজয় মাখালের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কোনও চিন্তা নেই, সব ঠিক আছে। আমি ওষুধটা দিয়ে দিচ্ছি।'

তারপর করবী মাকালের দিকে তাকিয়ে নিয়ে কবিরাজ মশাই বিজয়কে বললেন, 'শোনো, খুব মন দিয়ে শোনো। এই যে ওষুধটা দিচ্ছি, এটা তিন মাস খাবার ওষুধ। রোজ ভোরবেলা উঠে খালি পেটে এক চামচ মধুর সঙ্গে মিশিয়ে একবার খাবে। এই তিন মাস তোমাকে নিয়মিত স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করতে হবে। যদি ওষুধ খাবার পর তোমার কোনও রকম অসুবিধে হয়, মানে বুক খুব ব্যথা করে বা নিশ্বাসের কষ্ট হয় কিংবা দরদর করে ঘাম হয় অথবা শরীরে অন্য কোনও তীব্র কষ্ট হয়, সঙ্গে সঙ্গে এই যে আরেকটা ওষুধ দিচ্ছি, এটা খেয়ে নেবে। আর প্রথম ওষুধটা সেদিন থেকে একেবারে বন্ধ করে দেবে। তবে আমার ধারণা তেমন কিছু ঘটবে না। আমি বলছি, তিন মাসের মধ্যে তোমার স্ত্রী গর্ভবতী হবে। নাহলে আমার সঙ্গে তিন মাস বাদে দেখা কোরো।'

কবিরাজ মশাই উঠে দাঁড়ালেন। আলমারি খুলে ওষুধ বার করে বিজয় মাখালের হাতে দিলেন। বিজয় ওষুধের পুঁটলিটা ব্যাগে পুরে বলল, 'আপনার দক্ষিণা আর ওষুধের দাম বাবদ কত দেব কবিরাজ মশাই?'

'আমাকে তুমি সব মিলিয়ে তিনশো পঁচিশ টাকা দেবে। একশো টাকা ফি আর দুশো পঁচিশ টাকার ওষুধ।'

কবিরাজ মশাই আলমারির দরজা খুলে একটা খাতা বার করলেন। খাতার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার কথা তোমরা জানলে কী করে? মানে, আমার কাছে তোমাদের কে আসতে বলল?'

'আজ্ঞে, আমার বাপের বাড়ির গেরামের লীলারাণী হালদার আর পরেশ হালদার আপনাকে দেখিয়ে খুব উপকার পেয়েছে। তাদের কাছ থেকে আপনার কথা জেনেছি।' এবার করবী মাকাল উত্তর দিল।

'তোমার বাপের বাড়ির গ্রামের নাম কি মা?'

'চর মাদারিপাড়া, পোস্টাপিস বাসন্তী।'

খাতায় ছক কাটা আছে। কবিরাজ মশাই পেশেন্ট'স নেম-এর নীচে লিখলেন 'বিজয় মাকাল, করবী মাকাল, গোসাবা কালী মন্দির, ব্লক গোসাবা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা', রেফারড বাই-এর খোপে লিখলেন 'লীলারাণী হালদার, পরেশ হালদার, গ্রামচর মাদারিপাড়া, পোঃ বাসন্তী, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা', ডাওগনোসিস-এর জায়গায় খসখস করে কীসব লিখলেন আর প্রেস্ক্রিপশন-এর খোপে ওষুধের নাম লিখলেন অশ্বগন্ধেশ্বরী। তারপর বিজয়ের হাত থেকে টাকাটা নিয়ে একটা রসিদ কেটে দিয়ে বললেন, 'এখানে একটা সই কর।' বলে খাতাটা এগিয়ে দিলেন।

খাতাটা নিয়ে বিজয় মাকাল গোটা গোটা অক্ষরে তার নাম লিখল। বলল, 'আমরা আজ চলি কবিরাজ মশাই। ভাল-মন্দ যাই হোক আপনাকে পত্তর দিয়ে জানাব।'

কবিরাজ মশাই বললেন, 'সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে নেমো, আলোটা খারাপ হয়ে গেছে।'

'চিন্তা নেই কবিরাজ মশাই, সঙ্গে টর্চ আছে।'

দরজা খুলে দুটি মূর্তি অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কবিরাজ মশাই কপালে দু-হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে বললেন, 'দুর্গা, দুর্গা, হরিনারায়ণ।'

## প্রথম পরিচ্ছেদ

(১)

কাক ভোরে টেলিফোন এল। সাড়া দিতেই ওপারে নারীকণ্ঠ। গলায় উদ্বেগ। 'হ্যালো, আদিত্য মজুমদারের সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'বলছি।' আদিত্যর ঘুমের রেশ তখনও কাটেনি।

'আমার নাম সোহিনী মৈত্র। একটা গোপনীয় ব্যাপারে আপনার সাহায্য দরকার। খুবই দরকার। আপনার সঙ্গে দেখা করা যাবে?'

'বউবাজারে আমার একটা আপিস আছে। আজ রোববারে তো আপিস বন্ধ। সোমবার আসতে পারবেন?'

'সোমবার আমার একটু অসুবিধে। মঙ্গলবারেও। বুধবারে হতে পারে কিন্তু অত দিন অপেক্ষা করলে দেরি হয়ে যাবে। আজ দেখা করা যায় না? আপনার বাড়িতে?

কোনও মহিলা মক্কেল তার মেসবাড়ির এক চিলতে ঘরে তার সঙ্গে দেখা করতে আসছে ভেবেই আদিত্য শিউরে উঠল। যেটুকু ঘুম চোখে লেগেছিল, নিমেষে উধাও। তার ঘরের চেহারা দেখলে মক্কেল নির্ঘাত পালাবে। সে বলল, 'আমার বাড়িতে ঠিক সুবিধে হবে না। তার থেকে বাইরে কোথাও দেখা করা যেতে পারে।'

ওপারে নারীকণ্ঠ বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। ফোন কেটে দিল, নাকি কল ড্রপ? নিজের উপস্থিতি জানাতে আদিত্য গলা খাঁকারি দিল, 'হ্যালো, হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। শুনুন, আপনাকে আমি তুলে নেব। তারপর কোথাও বসে কথা বলা যাবে। কোথা থেকে তুলব?'

'আমি কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে থাকি। কফি হাউসের সামনে থেকে তুলবেন?'

'এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছি।'

আদিত্যকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ফোনটা কেটে গেল। আদিত্য দেখল ঘড়িতে ছটা পনেরো। শীতের ভোর। এখনও ভাল করে আলো ফোটেনি। তার ওপর ক'দিন শীতটাও জাঁকিয়ে পড়েছে। এই উদ্ভট সময়ে খুব হতভাগ্য ছাড়া কাউকে বিছানা ছাড়তে হয় না। কিন্তু আদিত্যকে উঠতেই হবে, বিছানা ছাড়তে হয় হোক, মক্কেল ছাড়া চলবে না। তার গোয়েন্দা-জীবনে মক্কেল ব্যাপারটা বড়ই দুর্লভ। কিন্তু সবার আগে এক কাপ চা দরকার। আদিত্য জানলা দিয়ে দেখল, রাস্তার ওপারে সার দিয়ে চালকহীন ট্যাক্সিগুলো দাঁড়িয়ে আছে। দু'একটা ধোয়া-মোছাও চলছে। রাস্তাটাই ওদের গ্যারেজ। ট্যাক্সিগুলোর ফাঁক দিয়ে একটু ঠাহর করে দেখে মনে হল, ওপারের ফুটপাথে চায়ের দোকানটা খুলে গেছে। সে ঘর থেকে বেরিয়ে হাঁক দিল, 'বলরাম, এই বলরাম, একবার ওপরে আয়।'

বলরাম মেসের চাকর। সে আদিত্যকে সকালে চা এনে দেয়।

আদিত্য যখন মেস থেকে বেরোল তখনও শহরের শরীরে ঘুমের গন্ধ লেগে আছে। দু'চারজন ফুটপাথবাসী রাস্তায় মশারি খাটিয়ে দিব্যি ঘুমোচ্ছে। কয়েকজন উঠে দাঁত মাজতে মাজতে রাস্তার কলে লাইন দিয়েছে। দোকানপাট সবই প্রায় বন্ধ, শুধু একটা-দু'টো পানের দোকান সদ্য খুলছে। আদিত্য এক প্যাকেট সিগারেট কিনল, দেখল ঘড়িতে পৌনে সাতটা। তার মেস থেকে কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস মিনিট দশেকের হাঁটা পথ। হাতে সময় আছে।

কফিহাউসের সামনে পৌঁছে আদিত্য সিগারেট ধরাল। কে জানে আবার কতক্ষণ পরে সিগারেট খাওয়া যাবে। আজকাল অনেকেই সিগারেটখোরদের কুষ্ঠরুগির সমগোত্রীয় মনে করে। আদিত্যর হবু মক্কেলও হয়তো সেই দলে। কফি হাউসের সামনেটা সাধারণত গাড়ি, বই ভর্তি ভ্যানরিক্সা আর পথচারীর ভিড়ে ঠাসা থাকে। কিন্তু একে রোববার তায় সাতসকাল, তাই রাস্তা প্রায় ফাঁকা। দু'একটা গাড়ি না-থেমে চলে যাচ্ছে।

ফাঁকা ট্যাক্সিও কয়েকটা চলে গেল। শেষে একটা সময়ে যখন নীল রঙের একটা মারুতি ডিজায়ার বড় রাস্তা থেকে খুব আস্তে আস্তে কফি হাউসের গলিটাতে বাঁক নিয়ে কফি হাউসের সামনে এসে দাঁড়াল, তখন সাড়ে সাতটা বেজে গেছে, আদিত্য আর একটা সিগারেট ধরাবে কিনা ভাবছে। চালকের আসনে বছর চব্বিশ-পঁচিশের এক তরুণী, তার চোখ এবং মুখের একটা অংশ বড় রোদ-চশমায় ঢাকা।

'উঠে পড়ুন।'

চালকের পাশের দরজাটা খুলে আদিত্য গাড়িতে উঠল। সিট বেল্ট বেঁধে নিতে নিতে জিজ্ঞেস করল,

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'রাজারহাট নিউ টাউনে একটা নতুন ক্লাব হয়েছে। আমরা সেখানে বসে কথাবার্তা বলব।'

রোদ-চশমা ঢাকা মুখে সেই যে তালাচাবি পড়ল, আধ ঘণ্টা বাদে খোলা মাঠের মধ্যে 'নিউ টাউন সিটিজেন্স ক্লাব' লেখা একটা সাদা ছিমছাম বাড়ির মধ্যে গাড়ি ঢোকা অব্দি সে-তালাচাবি আর খুলল না।

একটু আগে ক্লাবের লনে ছাতার তলায় বসে টোস্ট-অমলেট-বেকন সহযোগে ব্রেকফাস্ট সমাপ্ত হয়েছে। আদিত্য অত সকালে কিছু খেয়ে বেরোতে পারেনি। তার বেশ খিদে পেয়ে গিয়েছিল। এখন পটে চা এসেছে। চমৎকার ফ্লেবার। চায়ে একটা চুমুক দেবার সঙ্গে সঙ্গে আদিত্যর মধ্যে ধূমপানের ইচ্ছেটা চিড়বিড়িয়ে উঠল। সিগারেট ধরাবে কিনা ভাবছে এমন সময় নিজের হাতব্যাগ থেকে ডানহিলের একটা প্যাকেট বার করে সোহিনী বলল, 'চলবে?'

ধূমপায়ী মহিলা আদিত্যর পছন্দ নয়, যদিও সে নিজে রোজ গোটা তিরিশেক সিগারেট খেয়ে থাকে। এই একটা ব্যাপারে সে মোটেই যুক্তিবাদী নয়, সে জানে। কিন্তু পছন্দ-অপছন্দের ওপর তো আর যুক্তি খাটে না। অবশ্য এই মুহূর্তে এই অচেনা ধূমপায়ী তরুণীটিকে তার পরম বন্ধু মনে হল। সোহিনীর সিগারেটটা ধরিয়ে দিয়ে সে ধীরে-সুস্থে নিজেরটা ধরাল। একটা সুখটান দিয়ে বলল, 'এবার বলুন কেন আমার সাহায্য চাইছেন।'

'আমার ধারণা আমার মাকে কেউ খুন করতে চাইছে। মার প্রোটেকশনের জন্য আপনাকে দরকার।'

'দেখুন, আমি ব্যাপারটা এখনও ডিটেলে জানি না, কিন্তু জানার আগেই বলছি, আপনার মাকে প্রটেক্ট করার জন্য যদি আপনার মাসল পাওয়ার দরকার হয় তাহলে আমি সে কাজটা ভাল পারব না। যে-কোনও ভাল সিকিউরিটি এজেন্সিকে কাজটা দিলে তারা অনেক ভালভাবে আপনার মাকে প্রোটেক্ট করতে পারবে।'

'আমি ফিজিকাল প্রোটেকশনের কথা বলছি না, তার জন্য মার পে-রোলে অনেক লোক আছে। আমি জানতে চাই, সত্যিই কি কেউ মাকে খুন করতে চায়? চাইলে, কে চাইছে?'

'বেশ'।

আদিত্য পকেট থেকে মোবাইলটা বার করতে করতে বলল, 'আপনার কথাগুলো টেপ করে রাখলে পরে আমার কাজের সুবিধে হবে। আপনার আপত্তি নেই তো?'

সোহিনী খানিকটা ইতস্তত করে বলল, 'ঠিক আছে।'

আদিত্য মোবাইলের রেকর্ডারটা চালিয়ে টেবিলের ওপর রাখল। তারপর বলল, 'এবার বলুন, আপনার মা কোথায় থাকেন, কী করেন, কেনই বা কেউ তাঁকে খুন করতে চাইবে?'

'আপনি হয়তো চৌধুরি এন্টারপ্রাইজেস-এর নাম শুনেছেন। আমার মা চৌধুরি এন্টারপ্রাইজেস-এর কর্ণধার।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান। আপনি কি মন্দাকিনী চৌধুরির কথা বলছেন? প্রাক্তন অভিনেত্রী চৌধুরি এন্টারপ্রাইজেস-এর মন্দাকিনী চৌধুরি আপনার মা? তাঁর ছবি তো প্রায় রোজই কাগজে দেখি।'

'দ্যাটস রাইট। আমার মায়ের নাম মন্দাকিনী চৌধুরি। আমি অবশ্য আমার বাবার পদবিটাই ব্যবহার করি।'

'একটু গোড়া থেকে বললে সুবিধে হত। গুলিয়ে যাচ্ছে।'

'গোড়া থেকে বলার চেষ্টা করছি। তবে কোথায় শুরু করা উচিত, জানি না। আমার মার দুটো বিয়ে। আমি প্রথম বিয়ের সন্তান। আমার বাবার নাম নীলাঞ্জন মৈত্র। বাবা অভিনয় জগতের মানুষ। মূলত গ্রুপ থিয়েটারের লোক। দুএকটা সিনেমা-সিরিয়ালেও অভিনয় করেছিল। তেমন নাম করতে পারেনি। এখনও ছোটখাটো একটা নাটকের দল চালায়। বাবার নাটক খুব ভাল চলে বলে মনে হয় না। তবু হাল ছাড়েনি। লড়ে যাচ্ছে। মা-ও একসময় বাবার দলে অভিনয় করত, সেই সূত্রেই ঘনিষ্ঠতা, বিয়ে।'

'আপনার বাবা-মায়ের ছাড়াছাড়ি হয় কবে?'

'বছর দশেক আগে। আমার বয়েস তখন পনেরো। শান্তিনিকেতনের পাঠভবনে পড়ি। হস্টেলে থাকি। সদ্য ক্লাস টেনে উঠেছি। রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারে বাবার একটা এন্ডিয়োরিং ইনটারেস্ট ছিল, এখনও আছে। তাই শান্তিনিকেতন। বাবা চেয়েছিল আমি আশ্রমিকদের মতো করে বড় হই।'

'সেটা হল না?'

'না। মার বিয়েটা ভেঙে যাবার পর আরও এক-দেড় বছর শান্তিনিকেতনে ছিলাম। ওখান থেকেই মাধ্যমিক পাশ করলাম। ততদিনে মা চৌধুরি এন্টারপ্রাইজেস-এর সুবীর চৌধুরিকে বিয়ে করেছে। সুবীর চৌধুরির ইচ্ছেতে এবং আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমাকে নৈনিতালের পাবলিক স্কুলে পাঠানো হল। প্রথম প্রথম অ্যাডজাস্ট করতে খুব অসুবিধে হয়েছিল। তারপর আস্তে আস্তে মানিয়ে নিলাম। শুধু যে মানিয়ে নিলাম তাই নয়, পাবলিক স্কুলের জীবনটা রীতিমতো এনজয় করতে শুরু করলাম। ছুটিতে বাড়ি আসতে চাইতাম না। কোথায় আসব? আমার বাবা আর বিয়ে করেনি বটে, কিন্তু পাবলিক স্কুলে পড়তে যাবার পর থেকে বাবার সঙ্গে একটা মানসিক দূরত্ব তৈরি হচ্ছিল। তাছাড়া মা ছেড়ে যাবার পর বাবার জীবনটা একেবারে ছন্নছাড়া হয়ে গিয়েছিল। তাই ছুটিতে কলকাতায় এসে বাবার সঙ্গে থাকা সম্ভব ছিল না। মা-ও সেটা অ্যালাও করত না। উল্টোদিকে চৌধুরি বাড়ির পরিবেশটা জঘন্য লাগত।'

'আপনার সৎ বাবার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল?'

'একটু দূরের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সম্পর্কটা খারাপ ছিল না। দেখুন, মাই স্টেপ ফাদার ওয়াজ বেসিক্যালি আ জেন্টলম্যান। হার্ড ওয়ার্কিং, অনেস্ট, প্রিন্সিপলড টু দ্য কোর। মনেপ্রাণে সাহেব। ছেলেমেয়েদের স্নেহের আধিক্য দেখানো তাঁর ধাতে ছিল না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তিনি তাদের জন্য ভাবতেন না। সুবীর চৌধুরির সঙ্গে একটা চলনসই সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব ছিল। আমি সেটা রাখতামও। আসল সমস্যাটা ছিল অন্য জায়গায়।'

আদিত্যর আবার ধূমপানের ইচ্ছে হল। পকেট থেকে তার সস্তার সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে একটা ধরাতে যাবে, সোহিনী টেবিলের ওপর রাখা ডানহিলের প্যাকেটটা দেখিয়ে বলল, 'প্লিজ হেল্প ইয়োরসেলফ।'

'থ্যাঙ্কস। থাক। অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে।' নিজের সিগারেটটা ধরিয়ে আদিত্য বলল, 'তারপর?'

'সুবীর চৌধুরির দুটো বিয়ে। আমার মাকে বিয়ে করার আগে তিনি আরেকটা বিয়ে করেছিলেন। দুটি সন্তানের জন্ম দিয়ে যখন তাঁর প্রথম স্ত্রী মারা যান তখন সুবীর চৌধুরির বয়েস মধ্য চল্লিশ। তারপর দীর্ঘ দিন তিনি বিয়ে করেননি। আমার মাকে দেখে তাঁর তপোভঙ্গ হল। তিনি আবার বিয়ে করলেন। সে সময়ে সুবীর চৌধুরির বয়েস বাষট্টি-তেষট্টি, মার বয়েস সাঁইতিরিশ-আটতিরিশ।'

'কী করে আপনার মার সঙ্গে সুবীর চৌধুরির দেখা হয়েছিল?'

'শুনেছি চৌধুরি এন্টারপ্রাইজেস-এর কোনও একটা অ্যাড ফিল্মে মা অভিনয় করেছিল। সেই থেকে পরিচয়।'

'তখন কি আপনার মা-বাবার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে?'

'না। লোকে বলে, সুবীর চৌধুরির সঙ্গে মার ঘনিষ্ঠতা বাড়ছিল বলেই বাবা-মার মধ্যে দূরত্ব তৈরি হচ্ছিল। ব্যাপারটা আমি ঠিক আঁচ করতে পারিনি। আমি তখন শান্তিনিকেতনে পড়ি। হঠাৎ একদিন ছুটিতে বাড়ি এসে

দেখলাম, বাবা-মার সম্পর্কটা ভেঙে গেছে। মা আলাদা থাকতে শুরু করেছে। কিছুদিন পরে মিউচুয়াল ডিভোর্স হয়ে গেল। তার ছ'মাসের মধ্যে মা আবার বিয়ে করল।'

'আপনি একটা সমস্যার কথা বলছিলেন। আপনার মার নতুন বাড়িতে।'

'হ্যাঁ, সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম। সুবীর চৌধুরির আগের পক্ষে দুটি সন্তান। ছোট জন মেয়ে, নাম শঙ্খমালা, সবাই বলে মালা। আমার থেকে বছর পাঁচেকের বড়। সুবীর চৌধুরির একটু বেশি বয়েসের সন্তান। বড় জন ছেলে, নাম শঙ্খদীপ, ডাকনাম দীপ। এ প্রায় আমার মায়েরই বয়সি। মা মরা ছেলেমেয়েদের সুবীর চৌধুরি তেমন নজর দিতে পারেননি। ফলে কেউই ঠিকঠাক মানুষ হয়ে ওঠেনি। তবে দুজনের সমস্যা দুরকম।' সোহিনী একটু থামল। বলল, 'আর একবার চা খাবেন?'

'চায়ে না বলা আমার ধাতে নেই। তাছাড়া এদের চা-টাও চমৎকার। খাঁটি দার্জিলিং।' আদিত্য হাসল।

'আমার মা মন্দাকিনী চৌধুরি এই নতুন ক্লাবটার একজন বড় পৃষ্ঠপোষক। চা-টা আসে মন্দাকিনী চৌধুরির নিজস্ব চা-বাগান থেকে।'

চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে সোহিনী আবার শুরু করল, 'প্রথমে মালার কথা বলি। ছোট থেকেই মালার লেখাপড়ায় বিশেষ মন ছিল না। বুদ্ধি-সুদ্ধি প্রচুর ছিল, তাছাড়া শি ওয়াজ অ্যান এক্সেলেন্ট অ্যাথলিট। কিন্তু কোনও কিছুতেই লেগে থাকার মতো মনের জোর তার ছিল না। পড়ার বই-এর তুলনায় সিনেমা পত্রিকা, টিভি, ফিল্মস্টারদের রসাল গসিপ তাকে অনেক বেশি টানত। আর খেলাধুলোটাও তো প্র্যাকটিস করতে হয়। রোজ সকালে উঠে প্র্যাকটিসে যাবার কথা ভাবলে মালার গায়ে জ্বর আসত। আমি যখন তাকে প্রথম দেখি তখন তার বছর কুড়ি বয়েস। কয়েকবার চেষ্টা করেও আই এস সি পাশ করতে পারেনি। ক্লাস ইলেভেনের ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি মনে রাখতে পারে না, কিন্তু তারকাদের ঠিকুজি-কুষ্ঠি গড়গড় করে বলে যেতে পারে। ইস্কুলে যায় না। লেখাপড়ায় একেবারে ইতি দিতে পারলে বেঁচে যেত। শুধু বাবার ভয়ে সেটা সম্ভব হয়নি। আমি যে বছর নৈনিতালের পাবলিক স্কুলে ভর্তি হলাম সে-বছর মালা বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে তার প্রাইভেট টিউটারকে বিয়ে করল। বিয়েটা এখনও চমৎকার টিকে আছে। একটা ছেলে। ওর স্বামী সুব্রত, সুব্রত সেন, বেহালার দিকে একটা কলেজে পড়ায়। ছোট থেকে মালা যেরকম প্রাচুর্যে মানুষ, স্বামীর সংসারে তার সিকির সিকিও নেই। স্বামী-ছেলে নিয়ে কিন্তু মালাকে বেশ সুখী মনে হয়। আসলে মালা মানুষটা মোটেও খারাপ নয়, শুধু একটু অ্যাটেনশনের কাঙাল, যেটা সে বাবার কাছ থেকে কোনও দিন পায়নি, কিন্তু স্বামী-ছেলের কাছ থেকে পুরো মাত্রায় পায়। মেয়ের ব্যবহারে সুবীর চৌধুরি খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। বয়সের সন্তান বলে মালাকে তিনি একটু বেশিই ভালবাসতেন। যদিও ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ তাঁর ধাতে ছিল না। যাইহোক বিয়ের পর কিছুদিন তিনি মেয়ের মুখ দেখেননি। মালার চৌধুরি বাড়িতে ঢোকা বারণ হয়ে গিয়েছিল। সুবীর চৌধুরি ভেবেছিলেন নিজের সম্পত্তি থেকেও মালাকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করবেন। তারপর আস্তে আস্তে বরফ গলতে শুরু করে। মালা আবার স্বামী ছেলেকে নিয়ে চৌধুরি বাড়িতে আসতে শুরু করল। সুবীর চৌধুরি তার উইলে কিন্তু একটা ছোট মাসোহারা ছাড়া সরাসরি মালাকে কিছু দিয়ে যাননি। সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ মালা পেতেও পারে তবে সেটা আমার মার মৃত্যুর আগে নয়। উইলের প্রসঙ্গে পরে বিস্তারিতভাবে আসব। এখানে শুধু বলে রাখি, আমার মা মন্দাকিনী চৌধুরির কিন্তু প্রথম থেকেই মালার ব্যাপারে একটা সফট কর্নার ছিল। এখনও আছে। বলা যায়, মা-ই সুবীর চৌধুরিকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে মালার সঙ্গে চৌধুরি বাড়ির সম্পর্কটা রিভাইভ করেছিল।'

'মালার স্বামী লোক কেমন?'

'নিরীহ, কিন্তু নির্লোভ নয়। এটা অবশ্য আমার ইম্প্রেশন। ভুলও হতে পারে।'

'তাহলে তো মালাকে নিয়ে আপনার কোনও সমস্যা হবার কথা নয়। চৌধুরি বাড়িতে থাকতে আপনার জঘন্য লাগত কেন?'

'চৌধুরি বাড়ির মূল সমস্যা ছিল দীপ, সুবীর চৌধুরির ছেলে। হি ওয়াজ অ্যান আউটরাইট স্কাউন্ড্রেল। হি স্টিল ইজ। একেবারে বখে যাওয়া বড়লোকের ছেলে বলতে যা বোঝায়। সতেরো-আঠেরো বছর বয়েস থেকেই বোধহয় মদ-জুয়া ধরেছিল। আমি যখন তাকে প্রথম দেখলাম তখন সে কিছুই প্রায় করে না। ব্যবসাও দেখে না। নিশাচর। এখানে-ওখানে ঝামেলা পাকিয়ে বেড়ায়। কেউ তাকে শাসন করতে পারে না। তার বাবাও নয়। দেখতাম সে একজন বিরাট উয়োম্যানাইজার। আজ এই বান্ধবী, কাল ওই বান্ধবী। আমি যখন ছুটিতে চৌধুরি বাড়ি আসতাম সে আমাকেও দিনরাত্তির বিরক্ত করত। মূলত ওর জন্যেই চৌধুরি বাড়িতে থাকতে জঘন্য লাগত।'

'আপনার মা আপনাকে প্রোটেকশন দিতেন না?'

'দেবার চেষ্টা করতেন, সব সময় পারতেন না। সুবীর চৌধুরিকে আমি কাকু বলতাম। কাকুর সঙ্গে পরামর্শ করে মা আমাকে নৈনিতালে পাঠিয়ে দিল। তারপর দিল্লিতে কলেজ। চৌধুরি বাড়ির সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ছাড়াছাড়াই রয়ে গেল।'

'আপনি সুবীর চৌধুরির উইলের কথা বলছিলেন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। এবার উইলের প্রসঙ্গে আসি। সুবীর চৌধুরির নিজের দুই সন্তান তাঁকে এক মুহূর্ত শান্তি দেয়নি। হি ওয়াজ ডিসগাস্টেড উইথ দেম। বোধহয় সেইজন্য তিনি তাঁর উইলে সরাসরি বিশেষ কিছু তাদের জন্য রেখে যাননি। আমার জন্য একটা ছোট মাসোহারার ব্যবস্থা ছিল। মালার জন্যেও তা-ই। প্রথমে দীপের জন্যেও আমাদের মতো মাসে মাসে একটা অল্প টাকা বরাদ্দ ছিল। পরে সেটা বাতিল হয়ে যায়। সুবীর চৌধুরির মৃত্যুর পর তাঁর বিপুল সম্পত্তির প্রায় পুরোটাই পেয়েছে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী মন্দাকিনী চৌধুরি।'

'সুবীর চৌধুরির ছেলেমেয়েরা এ-নিয়ে আপত্তি করেনি?'

'উইল করার সময় মালা ওবাড়িতে ঢুকতই না, আপত্তি জানাবার কোনও জায়গা তার ছিল না। কিন্তু পরেও সে কোনও আপত্তি করেনি কারণ নিজের সংসার নিয়ে শি ওয়াজ কোয়াইট হ্যাপি। তাছাড়া সে জানত মন্দাকিনী চৌধুরি তাকে বঞ্চিত করবে না। কিন্তু উইল নিয়ে কাকুর সঙ্গে দীপের ফাটাফাটি ঝগড়া হয়েছিল। আমি তখন সেখানে ছিলাম না, মার মুখে শুনেছি। মাকে নাকি দীপ বারবার বিচ বলে সম্বোধন করছিল। নিজের বাবাকে বলছিল লেচারাস বাসটার্ড। বেশ কিছুক্ষণ সহ্য করার পর কাকু দীপকে দরোয়ান ডেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দেয়। বলে দেয়, সে যেন আর কখনও এমুখো না হয়। এরপর দীপের স্বল্প মাসোহারাটাও বাতিল হয়ে যায়। তাছাড়া, উইলে নতুন করে যোগ করা হয় যে মন্দাকিনী চৌধুরি চাইলেও চৌধুরি এন্টারপ্রাইজেস-এর সম্পত্তি বা তার কোনও অংশ দীপকে দিয়ে যেতে পারবে না।'

'দীপ বাড়িতে ফেরার চেষ্টা করেনি?'

'দীপ তার বাবাকে ভালই চিনত। সে জানত, সুবীর চৌধুরির উপস্থিতিতে বাড়ি ফেরার চেষ্টা করলে আবার ঘাড় ধাক্কা খেতে হবে। তাই সে লুকিয়ে মন্দাকিনী চৌধুরির সঙ্গে মাঝেমাঝে দেখা করত। যদি আমার মা তার স্বামীকে বলে দীপের জন্য কিছু ব্যবস্থা করতে পারে। অন্তত ওই অল্প মাসোহারাটা যদি পাওয়া যায়। মা দীপকে ঘোর অপছন্দ করত। তবু মনে হয়, মা দীপের জন্য খানিকটা চেষ্টা করেছিল।'

'আপনি আপনার মাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন?'

'সরাসরি কখনও জিজ্ঞেস করা হয়নি। কিন্তু কিছুদিন পরে সুবীর চৌধুরি তাঁর উইল একটু বদলে ছিলেন। হয়তো মার কথা শুনে। নতুন উইল প্রায় আগের মতোই থাকল। শুধু যোগ করা হল, চৌধুরি এন্টারপ্রাইজেস-এর সম্পত্তি মন্দাকিনী চৌধুরি উইল করে তাঁর যাকে ইচ্ছে তাকে দিয়ে যেতে পারবেন। ইচ্ছে করলে, তাঁর জীবদ্দশাতে ছেলেমেয়েদের বাড়তি মাসোহারার ব্যবস্থাও তিনি করতে পারবেন। বলাই বাহুল্য সেটা হবে সুবীর চৌধুরির অবর্তমানে মন্দাকিনী চৌধুরির হাতে সম্পত্তি আসার পর। অর্থাৎ মন্দাকিনী চৌধুরি যদি মনে করেন দীপ খানিকটা শুধরেছে তাহলে তিনি ইচ্ছে করলে দীপকে তার বাপ-দাদার সম্পত্তির অংশ দিয়ে যেতে পারেন। তবে তিনি উইল না করে মারা গেলে সব সম্পত্তি মালা, দীপ আর

আমার মধ্যে সমান ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। আর মন্দাকিনী যদি আবার বিয়ে করেন তাহলেও চৌধুরি এন্টারপ্রাইজেস-এর সমস্ত সম্পত্তি মালা, দীপ এবং আমার মধ্যে সমান ভাগে ভাগ হয়ে যাবে।'

'কমপ্লিকেটেড উইল। ইমপ্লিকেশনগুলো ভাল করে ভেবে দেখতে হবে।'

(২)

কিছুক্ষণ হল সোহিনী মৈত্র তার রোদ-চশমাটি খুলে টেবিলের ওপর রেখেছে। আদিত্য সোহিনীর মুখটা এখন পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছে। বয়কাট চুল। কালো টলটলে দিঘির মতো চোখ। অতল দিঘি। উদ্ধত নাক। উঁচু হনু। চুল-নাক-হনু মুখায়ববকে খানিকটা পশ্চিমি আদল দিয়েছে। অবশ্য মেমসাহেবদের এত দীঘল চোখ হয় না। শুধু যে লেখাপড়ায় শান্তিনিকেতনের সঙ্গে পাবলিক স্কুলের মিশেল ঘটেছে তাই নয়, চেহারার দিক থেকেও প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের চমৎকার মেলবন্ধন। শুধু কপালটা আর একটু কম চওড়া হলে ভাল হত।

'আর একটু চা খাবেন? নাকি এবার কফি?'

'এবার তাহলে কফিই হোক।'

কফিটা আদিত্যকে হতাশ করল। বাজারের ইন্সট্যান্ট কফি। তাও খুব একটা ভালো জাতের নয়। বোধহয় চায়ের মতো কফিটা কোনও পৃষ্ঠপোষকের কাছ থেকে অনুদান হিসেবে পাওয়া যায়নি। সে মনটাকে কফি পানের বিড়ম্বনা থেকে সরিয়ে আনার জন্য জিজ্ঞেস করল।

'আপনার পরিবারের সকলের সম্বন্ধেই তো বললেন, কিন্তু আপনার নিজের সম্বন্ধে তো কিছু বললেন না।'

'খানিকটা তো বললাম। ওই যে বললাম আমার লেখাপড়া প্রথমে শান্তিনিকেতনে, তারপর নৈনিতালের পাবলিক স্কুলে এবং শেষে দিল্লিতে। দিল্লির মিরান্ডা হাউস থেকে সোসিয়োলজিতে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট করেছি, দিল্লি ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স। এখন একটা এনজিওতে কাজ করি। ভালো সুযোগ পেলে পিএইচডি করার ইচ্ছে আছে। এই তো, আর কি বলব? ও হ্যাঁ, সেতার নিয়ে একটু আধটু পিড়িং পিড়িং করি। শান্তিনিকেতনেই শিখতে শুরু করেছিলাম, নৈনিতালে বন্ধ ছিল, দিল্লিতে আরও কিছুদিন শিখলাম, এখন কলকাতায় এসেও ঘষটাচ্ছি। খুব একটা এগোতে পারিনি। তবে গান-বাজনা নিয়ে উৎসাহের কমতি নেই।'

'কোন ঘরে শিখেছেন?'

'যখন যাকে পেয়েছি তার কাছে শিখেছি। এখন অবশ্য যাঁর কাছে শিখছি তাঁর খানদান আছে। একেবারে খাস সেনী ঘরানা। আপনি গান-বাজনা করেন? মিউজিশিয়ান গোয়েন্দা অবশ্য নতুন নয়। শার্লক হোমসই তো বেহালা বাজাতেন।'

'কিছুদিন শিখেছিলাম। বাড়ির ট্র্যাডিশন। সেসব অনেকদিন চুলোয় গেছে। তবে গান না শুনলে চলে না।'

'চমৎকার। আপনার সঙ্গে আমার বনবে মনে হচ্ছে। আমার মূল সমস্যায় আবার ফিরে আসি।'

আদিত্য বলল, 'তবে তার আগে একটা প্রশ্ন। আগেই জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। আপনি আমার সন্ধান পেলেন কার কাছে?'

'ও হো, সেটাই তো বলা হয়নি। আচ্ছা, একটু পরে বলছি।' সোহিনীর চোখ দুটো কৌতুকে হেসে উঠল। ছোঁয়াচে হাসি। আদিত্যও হেসে ফেলল। বলল, 'ঠিক আছে, এই ধাঁধার উত্তরটা না হয় পরেই জানা যাবে। এবার আসল ব্যাপারটা বলুন। কেন আপনার মনে হচ্ছে আপনার মাকে কেউ খুন করার চেষ্টা করছে?'

'প্রথম ঘটনা ঘটে মাস ছয়েক আগে। বাড়ির মধ্যেই। চৌধুরিদের আলিপুরের বাড়িটা তিন পুরুষের পুরোনো। নিয়মিত সারানো হলেও মাঝেমধ্যেই সমস্যা হয়। আজ হয়তো ছাত ফেটে জল পড়তে শুরু করল কিংবা কাল বাথরুমের কোনও ফিটিংস খারাপ হয়ে গেল। এই রকম আর কি। সব থেকে পুরোনো হয়ে গেছে ইলেকট্রিকের কানেকশনগুলো। বারবার তার বদলেও লাভ হচ্ছে না। সে যাই হোক, এবার বিপদটা

এল অন্য দিক থেকে। আলিপুরের বাড়িতে একটা পুরোনো যুগের লিফট আছে। বাড়িটা তিনতলা হলেও ফ্লোরগুলো খুব উঁচু উঁচু। তাই একতলা থেকে তিনতলা উঠতে লিফট লাগে। রোজ রাত্তিরে লিফট-টা অটোমেটিক মোডে দিয়ে তিনতলায় রাখা থাকে। ভোরবেলা, লিফটম্যান আসার আগেই, প্রথম লিফট ব্যবহার করে তিনতলা থেকে একতলায় নেমে আসে আমার মা, মন্দাকিনী চৌধুরি। একতলায় নেমে ঘণ্টাখানেক লনে হাঁটা মার প্রত্যেকদিনের রুটিন। যেদিন ঘটনাটা ঘটল সেদিন মা একটু বেশি ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার আগের রাতে অনেকক্ষণ জেগে কিছু ব্যবসা সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখছিল বলে ঘুমোতে দেরি হয়েছিল। যাই হোক, ঘটনার দিন মা ঘুম থেকে ওঠার আগেই লিফটম্যান ডিউটি করতে চলে আসে এবং সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় পৌঁছে লিফট-এ উঠে একতলায় নামার জন্য লিফট-এর বোতাম টেপে। কয়েক সেকেন্ড নীচে নামার পরেই লিফট-এর দড়ি ছিঁড়ে যায়। বিকট শব্দ করে নীচে আছড়ে পড়ে লিফট। লিফটম্যান মারাত্মক জখম হয় এবং ক-দিন বাদে হাসপাতালে মারা যায়। তার পরিবারকে অবিশ্বাস্য অঙ্কের একটা ক্ষতিপূরণ দিয়ে এবং পুলিশের নানা স্তরে মোটা টাকা খরচ করে চৌধুরি পরিবার ব্যাপারটাকে ধামা চাপা দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আসল প্রশ্ন হল, সাহেবি আমলের শক্তপোক্ত লিফট হঠাৎ দড়ি ছিঁড়ে পড়ে গেল কী করে? বলা দরকার, আগের রাত্তিরেই মেন্টেনেন্স কোম্পানি থেকে একটা লোক এসে লিফটটা চেক করেছিল। রুটিন চেক আপ। কিন্তু মেন্টেনেন্স কোম্পানি বলছে তারা কাউকে পাঠায়নি। তাদের রেকর্ড অনুযায়ী মেন্টেনেন্স ডিউ ছিল দুদিন পরে।'

আদিত্য চুপ করে রইল। সোহিনী কিছুক্ষণ নীরব। আদিত্য বলল, 'তারপর?'

'দ্বিতীয় ঘটনা প্রথম ঘটনার মাস দেড়েক পর। তখনও বেশ গরম চলছে। বিকেলের দিকে মার ফোন এল। ভীষণ উত্তেজিত। প্রায় হাঁপাচ্ছে। আমাকে বলল, একটু আগে সাংঘাতিক একটা অ্যাকসিডেন্টের হাত থেকে বেঁচে গেছে।'

'এক মিনিট। আপনি কি আপনার মার সঙ্গে থাকেন না?'

'না। আমি আলাদা থাকি। বহুদিন একলা থাকতে থাকতে বদভ্যাস হয়ে গেছে। কারও সঙ্গে থাকতে পারি না। পুরোনো বালিগঞ্জে মার একটা ফ্ল্যাট আছে। কলকাতায় ফিরে আসার পর থেকে ওখানেই থাকি।'

'বুঝেছি। তারপর বলুন।'

'হ্যাঁ যা বলছিলাম। ঠাকুরপুকুর, জোকা ছাড়িয়ে ডায়মন্ড হারবার রোডের ওপরে চৌধুরিদের একটা বিস্কুটের কারখানা আছে। সপ্তাহে অন্তত দুদিন মা সেখানে ভিজিটে যায়। সেদিনও যাচ্ছিল। ফ্যাক্টরিতে নানারকম সমস্যা থাকে যেগুলো মা নিজে না গেলে মেটে না। জোকা পেরিয়ে পৈলানের কাছে একটা ট্রাক ভয়ঙ্কর গতিতে উল্টো দিক থেকে এসে মার গাড়িতে ধাক্কা মারে। শৈলেনবাবু চৌধুরি বাড়ির অনেক দিনের ড্রাইভার। ভীষণ ভালো হাত। সেদিনও উনি চালাচ্ছিলেন। উনি না থাকলে সেদিন মার গাড়িটা চুরমার হয়ে যেত। মা বা শৈলেনবাবু কেউই বাঁচত না। শৈলেনবাবু বাঁদিকে কাটিয়েও পুরোপুরি সামলাতে পারেননি। ধাক্কার ইমপ্যাক্টে গাড়ি রাস্তার ধারে নালায় গিয়ে পড়ে। মা শারীরিকভাবে অক্ষতই ছিল, শৈলেনবাবুর সামান্য আঘাত লাগে। ধাক্কা মেরেই ট্রাক পালিয়ে যায়। তার নম্বর নেওয়া যায়নি। এটা দ্বিতীয় ঘটনা।'

সোহিনী দম নেবার জন্য আবার একটু থেমেছে। উত্তর দিক থেকে হাওয়া বইছে বেশ জোরে। হাওয়ায় কনকনে ভাব। অথচ চারদিকটা রোদ ঝলমলে। রোদ্দুরটা বেশ মিঠে লাগছে। আদিত্যর মনে পড়ল, তার ছোটবেলায় বছরের এইরকম সময়ে দেশ থেকে খেজুর গুড় আসত। বাবার নির্দেশে ডিনারে গুড়ের পায়েস মাস্ট ছিল। মাঝেমধ্যে জলখাবারে পয়রা গুড়ের সঙ্গে লুচি। অতি উপাদেয়, কিন্তু খেলেই অম্বল। অম্বল হলে বাবা কী যেন একটা হোমিওপাথিক ওষুধ খাইয়ে দিত। কার্বোভেজ? নাকি অন্য কিছু? আদিত্য অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। মনটাকে বর্তমানে ফিরিয়ে এনে আদিত্য দেখল লনে ভিড় বাড়ছে। আজ রবিবার সম্ভবত ক্লাবে কোনও অনুষ্ঠান আছে। আদিত্য ঘড়ি দেখল। এগারোটা বেজে গেছে। সকালে অমিতাভ-রত্নাদের বাড়িতে

খাবার কথা ছিল। মনে হচ্ছে না যাওয়া হবে। আদিত্যর বাউন্ডুলে স্বভাব ওরা জানে। ঠিক বুঝে নেবে। সে ঘড়ি দেখছে দেখে সোহিনী বলল, 'আপনার কি দেরি হয়ে যাচ্ছে? আমি তাড়াতাড়ি শেষ করছি।'

'কোনও তাড়া নেই। আপনি ধীরে সুস্থে সবটা বলুন। একটা জায়গায় যাবার কথা ছিল ঠিকই, কিন্তু যাবার সময়টা পেরিয়ে গেছে। অতএব আর কোনও তাড়া নেই। আপনি শুরু করুন।'

সোহিনী একটা সিগারেট ধরাল। কিছুক্ষণ নীরবে ধূমপান করার পর আবার বলতে শুরু করল, 'তৃতীয় ঘটনা পনেরো দিন আগের। চৌধুরিদের চা-বাগানের কথা আগেই বলেছি। ইন ফ্যাক্ট, একটা-দুটো নয়, চৌধুরিরা এখনও সবসুদ্ধ সাতটা চা-বাগানের মালিক। মাকে চা-বাগান দেখভাল করার জন্য প্রত্যেক মাসেই দার্জিলিং যেতে হয়। দিন পনের আগেও যেতে হয়েছিল। পাহাড় থেকে নামার পথে গাড়ির ব্রেক ফেল করে। অথচ যাবার সময় ব্রেকটা দিব্যি কাজ করছিল। সমতলে যেমন শৈলেনবাবু, পাহাড়ে তেমনি দীননাথ যোশি বহুদিন ধরে মার গাড়ি চালাচ্ছে। অত্যন্ত বিশ্বাসী, মার জন্য জীবন দিতে পারে। দীননাথের তৎপরতায় গাড়িটা সিরিয়াস অ্যাক্সিডেন্টের হাত থেকে রক্ষা পায়। একটা গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা দিয়ে দীননাথ গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে দিতে পেরেছিল। কথা হচ্ছে, ছ'মাসের মধ্যে এই রকম তিন-তিনটে ঘটনা, আপনি কি একে কোয়েন্সিডেন্স বলবেন?'

'আপাতত আমি কিছুই বলব না। আপনি বলবেন। আমি শুধু শুনব। আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে। প্রথম প্রশ্ন, সুবীর চৌধুরি কবে এবং কীভাবে মারা যান?'

'সুবীর চৌধুরি মারা গেছেন বছর সাতেক আগে। এটা তো ২০১৮-র জানুয়ারি, উনি ২০১১-র ফেব্রুয়ারিতে মারা যান। ম্যাসিভ হার্ট অ্যাট্যাক হয়েছিল।'

'এটা কি হঠাৎ হল?'

'ঠিক হঠাৎ নয়। কাকুর হার্টের অসুখ অনেক দিনের। হাই ব্লাড প্রেসারও ছিল। খুব পরিশ্রম করতেন তো, তার ওপর ব্যাবসার নানা চিন্তা। ডাক্তার অনেকদিন ধরেই ওঁকে কয়েক সপ্তাহ বিশ্রাম নিতে বলছিল। উনি শোনেননি।'

'আমার পরের প্রশ্ন, আপনার মা কি মনে করেন তাঁকে কেউ খুন করার চেষ্টা করছে?'

'আশ্চর্য ব্যাপার, মা এখনও পুরোপুরি কনভিনসড নয় যে কেউ মাকে খুন করার চেষ্টা করছে। এটা মার একধরনের জেদ বলতে পারেন। আমি যে আপনার সাহায্য নিচ্ছি এটা অবশ্য মা জানে। প্রথমে খুব আপত্তি করছিল। আসলে মার মধ্যে একটা ওভারকনফিডেন্স আছে যেটা কিছু কিছু সময়ে মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।'

'রাজি হলেন কী করে?'

'মা নিজেই একদিন ফোন করে আপনার কথা বলল। বলল আপনাকে অ্যাপয়েন্ট করা যেতে পারে। দেখতে বলা যেতে পারে সত্যি সত্যি কেউ কোনও বদ মতলব আঁটছে কিনা।'

'আপনার মা আমার কথা জানেন?' আদিত্য একেবারে অবাক।

'আপনাকে পারসোনালি চেনেন না, কিন্তু আপনার পরিবারকে চেনেন। আপনার বাবা অসিতবর্ণ মজুমদারের সঙ্গে কাকুর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, এটা কি আপনি জানতেন?'

'জানতাম। ক্লাবে ব্রিজের পার্টনার। একসঙ্গে গলফ-ও খেলতেন। কিন্তু কথাটা সংকোচবশত বলিনি। আপনি হয়তো জানেন, বাবা মারা যাবার পর আমাদের অবস্থাটা একেবারে পড়ে গেছে। নাহলে আমাকে এই উঞ্ছবৃত্তি করতে হয়?

পরিবারের প্রসঙ্গ উঠলে খুব লজ্জায় থাকি। মজুমদার বাড়ির ছেলে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য টিকটিকির কাজ করছে, এটা খুব গৌরবের নয়।'

আদিত্য কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। মাথা নিচু করে গালে হাত বোলাতে গিয়ে টের পেল, দাড়ি না কামিয়েই সকালে বেরিয়ে পড়েছে। সোহিনী নীরবতা ভেঙে বলল, 'মা বলল, অত অভিজাত বাড়ির ছেলে, তার মধ্যে

নিশ্চয় একটা ডিসক্রিশন কাজ করবে। এর ওপর মনে হয় নির্ভর করা যায়।'

আদিত্য অস্বস্তিটা খানিকটা কাটিয়ে উঠেছে। সে বলল, 'ধরে নিলাম আপনার মাকে কেউ খুন করার চেষ্টা করছে। এ-ব্যাপারে আপনার কি কাউকে সন্দেহ হয়?'

সোহিনী খানিকক্ষণ ভাবল। তারপর খুব ঠান্ডা গলায় বলল,

'এই প্রশ্নটা উঠবে, জানতাম। দেখুন, আমি যতদূর জানি মা এখনও কোনও উইল করেনি। করার ইচ্ছে আছে বলেও মনে হয় না। সেক্ষেত্রে মার খারাপ কিছু ঘটে গেলে আমি, মালা এবং দীপ তিনজনেই লাভবান হব। অর্থাৎ মোটিভ তিনজনেরই আছে। চৌধুরি এন্টারপ্রাইসেস-এর ওয়ান-থার্ড শেয়ারও তো বিশাল একটা ফরচুন। এর জন্য অনায়াসে মানুষ খুন করা যায়। কিন্তু সকলেই তো আর খুনি নয়, তাই সন্দেহের তালিকা থেকে মালাকে এবং নিজেকে বাদ দিচ্ছি। পড়ে রইল দীপ। লাইফ স্টাইল, অপরাধ প্রবণতা, অতীত ইতিহাস, মোটিভ, মার সঙ্গে সম্পর্ক সব মিলিয়ে দীপকেই প্রাইম সাসপেক্ট মনে হয় না কি?'

আদিত্য উত্তর দিল না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'এই মুহূর্তে শঙ্খদীপ চৌধুরি কি চৌধুরি এন্টারপ্রাইজের থেকে কোনও মাসহারা পান?'

'না, পায় না। মা অনেকবার ভেবেছে মালা এবং আমি মাসে মাসে যেরকম মাসোহারা পাই সেরকম একটা মাসোহারার বন্দোবস্ত দীপের জন্যেও করবে। কিন্তু আমার মনে হয় মাকে কাকু পরিষ্কার করে বলে গিয়েছিল দীপ যতদিন না নিজেকে শুধরোতে পারে ততদিন তার জন্য এক পয়সাও বরাদ্দ করা যাবে না। মাকে সেই শেষ ইচ্ছের মর্যাদা তো দিতেই হবে। এখনও দীপ নিজেকে শুধরোতে পারেনি, আর মা-ও দীপের জন্য কিছু বরাদ্দ করতে পারেনি।'

'একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন। চাইলে না-ও উত্তর দিতে পারেন। মালা এবং আপনি মাসে মাসে যেটা মাসোহারা হিসেবে পান সেটা কতটা?'

'খুব বেশি নয়। মাসোহারা হিসেবে যে টাকাটা পাই তা দিয়ে একটা মধ্যবিত্ত পরিবার সংসার চালাতে পারবে না। মা আমাকে বাড়তি একটা মোটা টাকা প্রতি মাসে দেয় বলে আমার ভাল করেই চলে যায়।'

আদিত্য কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, 'আমার কাজটা ঠিক কী আর একবার জেনে নিতে চাই।'

'আপাতত আপনার কাজ হল, যে লোকগুলোর কথা বললাম তাদের মিট করা। তাদের সঙ্গে কথা বলা। বোঝার চেষ্টা করা সত্যি সত্যি আমার মাকে কেউ খুন করার কথা ভাবছে কিনা। আমিও তো ভুল করতে পারি। তাই আমার সন্দেহটা ঠিক না ভুল সে ব্যাপারে আপনার একটা মতামত চাইছি। এই মতামত দেওয়াটাই আপাতত আপনার কাজ। বলাই বাহুল্য, আপনি যখন আমার বাড়ির লোকেদের সঙ্গে কথা বলবেন তখন আপনার আসল পরিচয় দেবেন না। আমার মা অবশ্য আপনার পরিচয়টা জানে।'

'কোনও একটা আইডেনটিটি আমাকে নিতে হবে। ভাবছি, সাংবাদিক হলে কেমন হয়? একজন সাংবাদিক যে চৌধুরি বাড়ির একটা ইতিহাস লিখছে।'

'চমৎকার হয়। চৌধুরিবাড়ি নিয়ে একটা বই আছে। একবার দেখে নিতে পারেন। বোধহয় বছর তিরিশেক আগে বেরিয়েছিল। বহুদিন আউট অফ প্রিন্ট। লেখকের নামটাও ঠিক মনে নেই। তবে ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে পাওয়া যেতে পারে।'

'কয়েকটা ভিজিটিং কার্ড করিয়ে নিতে হবে। তাছাড়া আমার কয়েকটা ঠিকানা এবং ফোন নম্বর দরকার। আপনার নম্বরটা তো আমার মোবাইল থেকে পেয়ে যাব, আমার দরকার শঙ্খমালা সেনের, শঙ্খদীপ চৌধুরির, আর অবশ্যই আপনার মার নম্বর।'

'আমার কাছে দীপের ফোন নম্বর, ঠিকানা কিচ্ছু নেই। সে কোথায় থাকে, কী করে কিচ্ছু জানি না। বাকিগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আর একটা কথা। আপনার ফি এবং এক্সপেনসেস বাবদ এখন কত দেব বলবেন।'

'ফি-এর কথা পরে হবে। আপাতত খরচ বাবদ হাজার তিরিশ দিলে ভাল হয়। অত হয়তো লাগবে না। তবু নিয়ে রাখছি। পরে হিসেব দেব।'

'নো প্রবলেম।' সোহিনী ব্যাগ থেকে চেক বই বার করল।

'আমি ই-মেলে একটা রসিদ পাঠিয়ে দেব। আপনার মেল আইডি-টাও দেবেন।'

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(১)

আদিত্য ঝিমোচ্ছিল। ঠিক ঘুম নয়, আবার পুরোপুরি জাগরণের অবস্থাও নয়। আজ ছাব্বিশে জানুয়ারি। দুপুরে মেসে ফিস্ট ছিল। মাংস-ভাত। বলাই বাহুল্য, খাসির মাংস। আজকাল অনেকে আবার মাংস বলতে মুরগিকেও বোঝায়। যারা এইরকম বোঝায়, আদিত্য তাদের দলে নেই। আদিত্যর কাছে মুরগির মাংস শাঁকালুর সমগোত্রীয় ছাড়া আর কিছু নয়। মেসের পাচক ভানু ঠাকুর এক অলৌকিক শিল্পী। বিশেষ করে শিল্পের মাধ্যমটি যদি খাসির মাংস হয়, তাহলে এই পৃথিবীতে ভানু ঠাকুরের সমকক্ষ কেউ আছে বলে আদিত্য মনে করে না। আদিত্য ছোটবেলায় কলকাতার সমস্ত নাম করা ক্লাব-রেস্টুরান্ট-হোটেলে খেয়েছে। কিন্তু কই মাংসের এরকম আশ্চর্য স্বাদ কেউ কখনও আনতে পারেনি তো।

গুরুভোজন হয়ে গিয়েছিল। তারই জেরে ঝিমুনি। চোখের সামনে দিয়ে কয়েকটা ছবি চলে যাচ্ছে। সোহিনী মৈত্র, নিউটাউন ক্লাবের লন, সোহিনী মিত্রর সিগারেট, দার্জিলিং চা। চৌধুরিদের বাড়ি বলতে একটা হালকা ছবি ভেসে উঠছে। সোহিনীকে বলা হয়নি, অনেকদিন আগে বাবার সঙ্গে সে একবার চৌধুরি বাড়ি গিয়েছিল। খুব উঁচু সিলিংওলা একটা ঘরে তাদের পেস্ট্রি আর স্যান্ডউইচ খেতে দেওয়া হয়েছিল। মনে হয়, তখনও মন্দাকিনীর সঙ্গে সুবীর চৌধুরির বিয়ে হয়নি। সেদিন সোহিনী যা বলেছে তার মধ্যে খটকা আছে। এটা আদিত্যর ইন্টিউশন বা অবচেতন বলছে। তবে খটকাটা কোথায় এখনই বোঝা যাবে না, ভেবে বার করতে হবে।

'আসতে পারি স্যার?'

দরজা ফাঁক করে বিমল গায়েন গলা বাড়িয়েছে। আদিত্যর চটকাটা ভেঙে গেল।

'এসো, এসো। তোমার অপেক্ষাতেই বসে আছি।'

বিমল সংকুচিতভাবে বিছানার একপাশে বসল। বিছানা ছাড়া ঘরে বসার জায়গা বলতে একটা চেয়ার। তার ওপর আপতত আদিত্যর দুটো সোয়েটার, একটা আলোয়ান আর একটা আধময়লা প্যান্ট ডাঁই করা আছে। আদিত্য বলল, 'তুমি বোসো, আমি বলরামকে একটু চা আনতে বলি। চায়ের সঙ্গে কী খাবে? ফুলকপির শিঙাড়া খাবে? এই সময় গরম গরম ভাজে।'

'আপনি খেলে খাব।' বিমল নিচু গলায় বলল।

'আমার পেটে জায়গা নেই। দুপুরে ফিস্ট ছিল। মাংস-ভাত। বেশি খাওয়া হয়ে গেছে। শুধু তোমার জন্য আনতে বলছি।'

বিমল চুপ করে রইল। সেটাকেই তার সম্মতি ধরে নিয়ে আদিত্য দেয়ালের পেরেকে টাঙানো পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বার করল। তারপর বাইরে বেরিয়ে বারান্দার রেলিং ধরে একটু ঝুঁকে হাঁক পাড়ল, 'বলরাম, চা আনতে হবে, ওপরে এসে পয়সা নিয়ে যা।'

শীতের বিকেল দ্রুত পড়ে আসছে। উত্তরের হাওয়ায় দাঁত আছে। আদিত্য আলোয়ান জড়িয়ে খাটের ওপর বসল। বলল, 'তারপর? কী খবর, বিমলবাবু?'

'খবর তেমন নেই। মোটামুটি চলে যাচ্ছে স্যার। হালতুর ওদিকে একটা বাড়িতে নাইট গার্ডের কাজ করছি। রাত্তির আটটা থেকে সকাল আটটা ডিউটি।'

'সারারাত্তির জেগে থাকতে হয়?'

'না স্যার। বারোটা সাড়ে বারোটা অব্দি জাগি। বাবুরা অনেকে রাত্তির করে ফেরে কিনা। গেট খুলে দিতে হয়। তারপর গেটের কাছে বিছানা করে শুয়ে পড়ি। একটু সজাগ হয়ে ঘুমোই। ওব্যেস হয়ে গেছে। তবে এই ঠান্ডায় চোরেরাও বেরোবে না স্যার।'

'শোনো, একটা কাজ আছে। করতে পারবে?'

'আপনার জন্য সব কাজ পারব স্যার। তাছাড়া দিনের বেলায় তো বাড়িতেই বসে থাকি। দিনের বেলায় বাড়ি বসে থাকলে সারাক্ষণ বউ খিটখিট করে। এই নেই ওই নেই। ছেলে লেখাপড়া না শিখে শুধু বখামি করে বেড়াচ্ছে। মেয়ে কার সঙ্গে নাকি প্রেম করছে। আমি কিছুই দেখছি না। এইসব কথা। যাক সেসব। কাজটা কী স্যার?'

'একজনের সম্বন্ধে খবর জোগাড় করতে হবে। তার ঠিকানা আমার কাছে নেই। তোমাকেই খুঁজে বার করতে হবে।'

আদিত্য বিমলের কাছে একটা কাগজ এগিয়ে দিল। বলল, 'এতে লোকটার নামটা বাংলায় লেখা আছে। শঙ্খদীপ চৌধুরি। লোকটার সম্বন্ধে কিছু হদিশ দিচ্ছি। তুমি টেবিলের ওপর থেকে আমার ল্যাপটপটা এগিয়ে দাও তো।'

ল্যাপটপ কোলের ওপর নিয়ে আদিত্য ডালা খুলল। ফেসবুকে ঢুকে শঙ্খদীপ চৌধুরি সার্চ দিতে সাতজন শঙ্খদীপ চৌধুরিকে পাওয়া গেল। তার মধ্যে দুজন আমেরিকায় থাকে, একজন অস্ট্রেলিয়ায়। বাকি চারজনের একজন শিলিগুড়ির, একজন আসানসোলের। অর্থাৎ সাতজনের মধ্যে দুজন শঙ্খদীপ চৌধুরিকে পাওয়া গেল যারা কলকাতায় থাকে। এই দুজনের মধ্যে একজন আবার ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র, অতএব তাকেও বাদ দেওয়া যেতে পারে। যিনি পড়ে রইলেন, আদিত্যর মন বলছে, তিনিই সুবীর চৌধুরির গুণধর পুত্র।

দেখা যাচ্ছে, এই শঙ্খদীপ চৌধুরি ফেসবুকে খুব একটা অ্যাকটিভ নয়। নিজের সম্বন্ধে প্রায় কিছুই লেখেনি। বন্ধুর সংখ্যাও যৎসামান্য। শুধু টাইমলাইনে নিজের একটা ছবি পোস্ট করেছে। ছবির ওপরে লেখা 'মাই ফেভারিট হোল'। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, গলফ ক্যাপ পরা ধূমপানরত শঙ্খদীপ একটা বার কাউন্টারের সামনে উঁচু টুলে বসে আছে। সামনে পানীয়। ছবির নীচে লেখা, 'ইফ ইউ লাইক আ জয়েন্ট, কাম টু দিস জয়েন্ট'। গতকাল থেকে অনেকবার ছবিটা দেখেছে আদিত্য। ছবির নীচে লেখা কথাগুলোর মানে কী? ইংরেজি 'জয়েন্ট' কথাটা একটা স্ল্যাং, তার অনেক রকম মানে হতে পারে। একটা মানে, 'আড্ডা', রকের ভাষায় যাকে বলে 'ঠেক'। ছবির নীচে লেখা ক্যাপশনে দ্বিতীয় 'জয়েন্ট'-এর মানে এটাই। প্রথম 'জয়েন্ট'এর মানেটাও কি তাই? হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। নেশাখোর রামারিজুয়ানা বা গাঁজা পোরা সিগারেটকে 'জয়েন্ট' বলে। আদিত্যর মনে হচ্ছে এই অর্থেই প্রথম 'জয়েন্ট' ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ এমন একটা বার খুঁজতে হবে যেখানে বসে মারিজুয়ানাও সেবন করা যায়। এটাই শঙ্খদীপ চৌধুরির 'ফেবারিট হোল'। এখানে খুঁজলে তার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। আদিত্যর মনে হল, সোশাল মিডিয়ায় মারিজুয়ানা খেতে আসার আহ্বান করার মধ্যে একটা নির্লজ্জতা যেমন আছে, তেমনি আহাম্মকিও আছে। সে বিমলকে শঙ্খদীপ চৌধুরির ছবিটা দেখিয়ে বলল, 'ইনি-ই মনে হচ্ছে আমাদের শঙ্খদীপ চৌধুরি। এই বারটাই এর ঠেক। এখানে মনে হয় মদের সঙ্গে সঙ্গে গাঁজা বা মারিজুয়ানাও পাওয়া যায়। বারটা কলকাতারই কোথাও একটা হবে। খুঁজে বার করতে পারলে মনে হয় শঙ্খদীপকেও খুঁজে পাওয়া যাবে। ছবিটা ভাল করে দেখে নাও।'

'দেখে নিয়েছি স্যার। আমার মাথায় একটা ক্যামেরা বসানো আছে। তাছাড়া মোবাইলেও ছবি তুলে নিচ্ছি। আর দেখতে লাগবে না।'

বলরাম চা-শিঙাড়া এনে দিয়েছে। কেটলিতে চা, সঙ্গে ভাঁড়। শিঙাড়া প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগে।

'চারটে শিঙাড়া পারব না স্যার, আপনি একটা নিন।'

'আস্তে আস্তে খাও। ঠিক পারবে।' আদিত্য সিগারেট ধরাল।

বলরাম ভাঁড়ে চা ঢেলে দিতে দিতে বলল, 'কেটলিতে খানিকটা রয়ে গেল। কেটলিটা রেখে যাচ্ছি। পরে নিয়ে যাব।'

প্রায় এক ঢোঁকে চা-টা খেয়ে নিয়ে বিমল উঠে দাঁড়াল। 'শিঙাড়াটা বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি স্যার। বউ আর আমি দুজনে মিলে খাব।'

'আগে বলবে তো। বাড়ির জন্য আর কয়েকটা দিয়ে দিতাম। ও আচ্ছা, একটু দাঁড়াও।' আদিত্য উঠে গিয়ে ড্রয়ার থেকে কিছু টাকা বার করল।

'এই নাও পাঁচ হাজার। এটা অ্যাডভান্স। এর থেকে এখন খরচ কোরো। পরে হিসেব নেব। আর একটু চা খেয়ে গেলে পারতে।'

'আর একদিন খাব স্যার। এখন বাড়ি ফিরে কাজে বেরোতে হবে। চললাম স্যার।'

বিমল দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

## (২)

বইটা অবশেষে পাওয়া গেল বরানগরে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইন্সটিটিউটের লাইব্রেরিতে। তার আগে ন্যাশানাল লাইব্রেরি, এশিয়াটিক সোসায়টি, কমার্শিয়াল লাইব্রেরি, এমনকী উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরি পর্যন্ত খোঁজা হয়ে গেছে। ন্যাশানাল লাইব্রেরির ক্যাটালগে অবশ্য বইটা রয়েছে। জনৈক অরুণকুমার উপাধ্যায়-এর লেখা 'দ্য এন্টারপ্রাইসিং চৌধুরিস অফ বেঙ্গল : ক্রনিকল অফ অ্যান আনইউসুয়াল জার্নি'। কিন্তু ক্যাটালগে থাকলে কী হবে, শেলফে বইটা কিছুতেই পাওয়া গেল না। বইপাড়া থেকে এই বই বহুদিন আগেই উধাও হয়ে গেছে। পাবলিশারও লালবাতি জ্বেলেছে। বিভিন্ন লাইব্রেরিতে, দোকানে খুঁজে খুঁজে যখন আদিত্য প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে তখন তার মনে পড়ল, ছাত্রজীবনে সে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইন্সটিটিউটের মেম্বার হয়েছিল, তারপর বছর বছর মেম্বারশিপটা রিনিউও করে গেছে। খুব বেশি যে সেখানে যাওয়া হয় তা নয়, তবে মাঝেমাঝে সে সেখানকার লাইব্রেরিটা ব্যবহার করে। আদিত্য ভাবল, একবার এখানেও খোঁজ করে দেখতে ক্ষতি কি, যদিও বইটা এখানে পাবার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। আর কী আশ্চর্য, দেখা গেল, বইটা স্ট্যাটিস্টিকাল ইন্সটিটিউটের লাইব্রেরিতে রয়েছে।

আদিত্যর দুর্ভোগ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মিটল না। খুঁজে পেতে দেখা গেল, বইটির অবস্থা অতিশয় সঙ্গীন, প্রায় প্রত্যেকটি পাতা আলগা হয়ে খুলে এসেছে। কাউন্টারের ভদ্রমহিলা জানালেন, বইটা বাঁধাই না করে ইস্যু করা যাবে না। বাড়িতে নিয়ে যাবার তো প্রশ্নই ওঠে না, রিডিং রুমে বসেও পড়তে দেওয়া যাবে না। বাঁধাই করতে পাঠানোর হ্যাপা আছে। বাঁধাই করে আসতে আসতে অন্তত মাস দুয়েক লাগবে। আদিত্য চাইলে চিফ লাইব্রেরিয়ানকে তার প্রয়োজনের কথা জানিয়ে একটা দরখাস্ত করতে পারে, তবে তাতে কতটা কাজ হবে ভদ্রমহিলা বলতে পারবেন না।

আদিত্যর কাঁদো-কাঁদো মুখ দেখে ভদ্রমহিলার বোধহয় একটু দয়া হল। বললেন, 'দোতলায়চিফ লাইব্রেরিয়ান বসেন। তাঁর কাছ থেকে যদি অনুমতি করিয়ে আনতে পারেন, আমি বইটা ইসু করে দেব।'

আদিত্য দোতলায় উঠে দেখল চিফ লাইব্রেরিয়ান ঘরে নেই। জিজ্ঞেস করে জানল তিনি জরুরি মিটিং করতে অন্য কোথাও গেছেন। ঘণ্টাখানেকের আগে ফিরবেন না। আদিত্য ক্যাম্পাসের বাইরে বেরিয়ে ঘুগনি-পাঁউরুটি খেল, চা খেল, ফিরে এসে ক্যাম্পাসের মধ্যে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করল, তারপর লাইব্রেরির দোতলায় গিয়ে দেখল লাইব্রেরিয়ান সাহেব তখনও ঘরে ফেরেননি। আদিত্য ঠিক করেছে আজ শেষ দেখে ছাড়বে। যদি হাতের এতটা কাছে এসেও বইটা ফসকে যায় তাহলে সে নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না। সে লাইব্রেরিয়ানের ঘরের সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

মিনিট পঁচিশ পরে লাইব্রেরিয়ানঘরে এলেন। এসেই ফোন তুলে কথা বলতে শুরু করলেন। এইভাবে আরও পাঁচ মিনিট কাটল। ফোন নামাবার পর তিনি খেয়াল করলেন আদিত্য বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

'কিছু বলবেন?'

অভয় পেয়ে আদিত্য গুটিগুটি লাইব্রেরিয়ানের ঘরের ভেতর ঢুকল।

'একটা বই খুব দরকার ছিল। কিন্তু বইটার অবস্থা ভাল নয়। তাই কাউন্টার থেকে ইস্যু করতে চাইছে না। আপনি যদি একটা স্পেশাল পারমিশন দেন। কয়েক ঘণ্টার জন্য পেলেই আমার কাজ হয়ে যাবে।'

'আপনি কি বাইরের মেম্বার না আমাদের নতুন ফ্যাকাল্টি?'

'আমি বাইরের মেম্বার।'

'একটু বসুন। আমি কাউন্টারে ফোন করে ব্যাপারটা জেনে নিই। বইটার কী নাম বললেন?'

'দ্য এন্টারপ্রাইসিং চৌধুরিস অফ বেঙ্গল : ক্রনিকল অফ অ্যান আনইউসুয়াল জার্নি। লেখকের নাম অরুণকুমার উপাধ্যায়।'

কিছুক্ষণ ফোনে কথাবার্তা চলল। একটু পরে কাউন্টারের ভদ্রমহিলা বইটা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বইটা নেড়ে চেড়ে দেখে লাইব্রেরিয়ান সাহেব বললেন, 'একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ করছি। এই বইটা একানব্বই সালে বেরিয়েছিল। লেখক নিজেই একটা কপি লাইব্রেরিকে সেই সময় উপহার দিয়েছিলেন। তারপর গত ছাব্বিশ বছর বইটা একবেলার জন্যেও কেউ পড়তে নেয়নি। পড়ে থেকে থেকে বইটা জরাজীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তারপর মাস দুয়েক আগে হঠাৎ একজন নতুন মেম্বার বইটা নিতে চাইলেন। একে বাইরের মেম্বার তায় নতুন, আর বইটার তো এই অবস্থা। সব দিক ভেবেচিন্তে ভদ্রলোককে বইটা আমরা দেব না ঠিক করলাম। তার কিছুদিন পরে ইকনমিক্স-এর প্রফেসর সামন্ত এসে বললেন ওই বইটাই তিনি বাড়ি নিয়ে যেতে চান। সিনিয়র ফ্যাকাল্টি, তাই বইটা তিন দিনের জন্য দিতেই হল। আপনার কি এখানে কোনও ফ্যাকাল্টি চেনা আছে?'

'আমার তো এখানে তেমন কেউ চেনা নেই। তবে বইটা আমার সত্যিই খুব দরকার।' আদিত্য মুখটাকে যথাসম্ভব করুণ করে বলল।

লাইব্রেরিয়ান সাহেব কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, 'আপনার মেম্বারশিপ তো দেখছি অনেক দিনের। ঠিক আছে, আমি বইটা ইস্যু করে দিচ্ছি। তবে ঠিক একদিনের জন্য। কালই বইটা ফেরত দিতে হবে।'

'অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যর। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে বইটা ফেরত দিয়ে যাচ্ছি।' আদিত্যর গলায় অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ল।

রুটি-ঘুগনি খেতে গিয়ে আদিত্য দেখেছিল পাশেই একটা জেরক্স-এর দোকান আছে। বইটা সেখানে জেরক্স করতে দিয়ে আদিত্য সিগারেট ধরাল। বইটা যে অবশেষে পাওয়া গেছে এই কথা ভেবে খুব তৃপ্তি হচ্ছে। কিন্তু এই অজানা অনামা বইটার চাহিদা হঠাৎ বেড়ে গেল কেন? সে ছাড়াও কি আর কেউ চৌধুরি বাড়ির ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে?

## (৩)

অরুণকুমার উপাধ্যায়ের বই পড়ে চৌধুরিদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা গেল। আদিত্য তার নোট খাতায় বইটার একটা সারসংক্ষেপ লিখে রেখেছে। সতেরো শতকের শেষ দিকে চৌধুরিদের কোনও পূর্বপুরুষ গুজরাত-রাজস্থান সীমান্তবর্তী একটা ছোট্ট হিন্দু রাজ্য থেকে জীবিকার খোঁজে বঙ্গভূমিতে আসেন। তিনি ছিলেন জাতে রাজপুত ও পেশায় যোদ্ধা, সম্ভবত ওই হিন্দু রাজ্যটির অন্যতম সেনাপতি। তাঁর পদবি ছিল সিংহ। সম্রাট ঔরঙজেবের সৈন্যদের কাছে ওই হিন্দু রাজ্যের পরাজয় ঘটার পর চৌধুরিদের ওই পূর্বপুরুষ স্ত্রী এবং শিশুপুত্রকে নিয়ে চুপিচুপি রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যান এবং ভাগ্যান্বেষণে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে হুগলি জেলার এক বড় জমিদারের কাছে স্থায়ী আশ্রয় পান।

পরের একশো বছর চৌধুরিদের পূর্বপুরুষরা হুগলিতেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রথম কিছুদিন তাঁরা ছিলেন বংশ-পরম্পরায় জমিদারের বেতনভুক রক্ষক। আঠেরো শতকের মাঝামাঝি, তাঁদের কোনও একজন নিজের

প্রাণ তুচ্ছ করে বর্গীদের হাত থেকে জমিদার ও তাঁর প্রজাদের রক্ষা করেন। এতে খুশি হয়ে জমিদার যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড চৌধুরিদের দান করেন তার ওপরে গড়ে ওঠে চৌধুরিদের নিজস্ব জমিদারি। অনুমান করা হয়, এই সময়েই এই পরিবার চৌধুরি খেতাব পায়।

চৌধুরিদের জমিদারি ছিল হুগলি নদীর পাশে। হুগলি নদী দিয়ে ইংরেজ, ফরাসি, দিনেমার ও পোর্তুগিজদের প্রচুর বাণিজ্য তরণী যাতায়াত করত। তাই দেখে চৌধুরিদের এক পূর্বপুরুষ কৃষ্ণনারায়ণ চৌধুরির মনে ব্যবসার সম্ভাবনা উদয় হয়। তাঁর দূরদৃষ্টি ছিল। তাই 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, তদর্ধং কৃষিকর্মনি' এই প্রচলিত আপ্তবাক্যে তিনি বিশ্বাস করতেন। অর্থাৎ তিনি বিশ্বাস করতেন ব্যাবসা করে যতটা টাকাপয়সা রোজগার করা যায়, কৃষিকাজ বা জমিদারি করে তার অর্ধেকও করা যায় না। নিজের বিশ্বাস নিয়ে শুধু বাড়িতে বসে বসে উচ্চ চিন্তা করার লোক তিনি ছিলেন না। তিনি ছিলেন যাকে বলে হাড়ে-মজ্জায় কাজের লোক। বিদেশিদের সঙ্গে তিনি ভাব জমালেন। বিদেশি মাল হুগলি- চুঁচুড়া-চন্দননগর-বর্ধমানের বাজারে বিক্রির জন্য ব্যাপক নেটওয়ার্ক গড়ে তুললেন এবং মশলাপত্র, রেশমি কাপড় ইত্যাদি দিশি সামগ্রী বিদেশিদের মাধ্যমে ইউরোপের বাজারে রপ্তানির পাকাপাকি বন্দোবস্ত করলেন। চৌধুরি বাড়ির প্রকৃত লক্ষ্মীলাভের শুরু সেই সময় থেকে।

এর পরের একশো-দেড়শো বছরে চৌধুরিরা তাদের ব্যবসাকে অনেক গুণ বাড়িয়ে তুলতে পেরেছিল। বিদেশি জিনিসপত্র কেনাবেচা থেকে একটু একটু করে চা-বাগান, জুটমিল, ছোটখাটো যন্ত্রপাতি উৎপাদন, গাড়ির একচেটিয়া ডিলারশিপ সব কিছুর মধ্যেঢুকে পড়েছিল চৌধুরিরা। ক্রমে চৌধুরি এন্টারপ্রাইজের দখলে পূর্ব ভারতীয় অর্থনীতির অনেকটাই চলে এসেছিল। এই উত্থান যে নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘটে গেছে তা নয়। ব্যবসার নিয়ম মেনে মাঝে মাঝে ছোটবড় নানারকম সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চৌধুরিদের যেতে হয়েছে। বিশেষ করে উত্তরাধিকারের নিয়ম মানলে চৌধুরিদের সম্পত্তি বারবার ভাগ হবার কথা ছিল এবং যাঁরা ব্যবসার ভাগ পেতেন তাঁদের প্রত্যেকে সমান ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন এমন বলা যাবে না। কিন্তু চৌধুরি বংশে একটা প্রথা ছিল। প্রত্যেক প্রজন্মের প্রধান পুরুষ তাঁর প্রায় পুরো ব্যাবসাটাই তাঁর সব থেকে উজ্জ্বল, বুদ্ধিমান, কর্মঠ এবং ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেটিকে দিয়ে গেছেন, যাতে চৌধুরি সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ বৃদ্ধিতে কোনও ভাটা না পড়ে। বাকিরা যা পেয়েছে তাতে তাঁরা বিলাসব্যসনেই দিন কাটাতে পেরেছেন কিন্তু ব্যবসা পরিচালনায় তাদের কোনও ভূমিকা থাকেনি। তাছাড়া ভাগ্যের দেবীও সহায় ছিলেন, তাই চৌধুরিদের উত্তরাধিকার নির্বাচন মোটের ওপর ভুল হয়নি। বিভিন্ন সময়ে যাদের হাতে ব্যবসা এসেছে তাঁরা তাঁদের বুদ্ধি, দূরদৃষ্টি, সাহস এবং সঠিক ঝুঁকি নেবার ক্ষমতা দিয়ে এখন পর্যন্ত পূর্ব ভারতের ব্যবসা জগতে চৌধুরি পরিবারের আধিপত্য এবং গৌরব বজায় রাখতে পেরেছেন।

তিরিশ দশকের পৃথিবীব্যাপী মন্দা চৌধুরিদের ব্যবসাকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে, বিশেষ করে এই কারণে যে, চৌধুরিদের বাজার অনেকটাই রপ্তানি নির্ভর ছিল। সেই ক্ষতি অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর পূরণ হয়ে যায়। চৌধুরিরা দ্রুত যুদ্ধকালীন উৎপাদনের মধ্যে ঢুকে পড়েন এবং প্রচুর লাভ করেন। স্বাধীনতার পরেও চৌধুরিদের শ্রীবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে, যেহেতু চৌধুরিরা সর্বদা দিল্লিতে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতাদের আশীর্বাদ পেয়ে এসেছেন। আশির দশক থেকে তাদের সাম্রাজ্য আফ্রিকার কোনও কোনও দেশেও বিস্তৃত হয়েছে। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে, পূর্ব ভারতের ব্যবসা জগতে চৌধুরিদের আধিপত্যকে এখনও পর্যন্ত কেউ তেমন ভাবে চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি।

শুধুমাত্র উদ্যোগপতি হিসেবে নয়, সমাজসেবী হিসেবেও চৌধুরিদের বিলক্ষণ নামডাক। কৃষ্ণনারায়ণ চৌধুরির নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করেন তাঁরই এক উত্তরপুরুষ কালীনারায়ণ চৌধুরি। এই ট্রাস্ট এখনও বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যাপৃত আছে। বর্তমানে এই ট্রাস্ট বেশ কয়েকটা অনাথ আশ্রম চালায়, হাসপাতাল চালায়, গরিব ছাত্রদের বৃত্তির ব্যবস্থা করে, পশ্চিমবঙ্গের প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গবেষণার জন্য অনুদান দেয়, এমনকী সাহিত্যেও কয়েকটা পুরস্কার দেয় বাজারে যার মর্যাদা আছে। কিন্তু

আমজনতার সব থেকে প্রিয় চৌধুরিদের কালী মন্দির। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে হুগলি নদীর ধারে তাঁদের আদি বাসস্থানের কাছে চৌধুরিরা তাঁদের কালী মন্দির তৈরি করেন। নামে কালী মন্দির হলেও আসলে দশ-বারো একর জায়গা জুড়ে এটি একটি মন্দিরের কমপ্লেক্স যার মধ্যে তেত্রিশ কোটি হিন্দু দেবতার অনেকেই অধিষ্ঠিত। তাছাড়া এর মধ্যে কয়েকটা চমৎকার পুষ্করিণী আছে, অতিথিশালা আছে, একটা বড় হল আছে যেখানে রোজ সন্ধেবেলা শ্যামাসঙ্গীত হয়, কাঙালি ভোজনের জন্য পেল্লায় দালান আছে যেখানে রোজ দুপুরবেলা পাঁচশো কাঙালি পাত পেড়ে খায়। শনি-মঙ্গলবার কিংবা ছুটির দিনে কাতারে কাতারে লোক পায়ে হেঁটে মন্দির দর্শনে আসে। অত বড় চত্বরটাতে তিল ধারণের জায়গা থাকে না।

এই মন্দির তৈরির পেছনে একটা গল্প চালু আছে। জনশ্রুতি যে, হরিনারায়ণ নামে বর্তমান চৌধুরিদের কোনও এক পূর্বপুরুষ বিশেষভাবে পানাসক্ত ও লম্পট ছিলেন। সে যুগে জমিদারদের একটু-আধটু লাম্পট্য লোকে মেনেই নিত কিন্তু হরিনারায়ণের লাম্পট্য সব সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। শোনা যায়, কোনও এক অভিশপ্ত রাতে নেশার বশবর্তী হয়ে তিনি তাঁদের কুলপুরোহিতের সুন্দরী বিধবা মেয়েটিকে গায়ের জোরে তুলে নিয়ে গিয়ে ভোগ করেন এবং সেই ভোরেই ধর্ষিতা মেয়েটি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। এই ঘটনার সময় কুলপুরোহিত বাড়ি ছিলেন না। ফিরে এসে তিনি প্রথমে শোকে পাথর হয়ে যান এবং পরে খানিকটা ধাতস্থ হলে হরিনারায়ণকে এই বলে অভিশাপ দেন যে এক সপ্তাহের মধ্যে তার মৃত্যু হবে এবং তার পুত্রেরা প্রত্যেকে পৌরুষহীন হয়ে যাবে, ফলে নির্বংশ হয়ে যাবে চৌধুরি পরিবার।

কাকতালীয় হতে পারে, এই অভিশাপের তিন দিনের মধ্যে নৌকাডুবি হয়ে হরিনারায়ণের মৃত্যু হয়। শোনা যায়, এর পরে হরিনারায়ণের সদ্য বিধবা স্ত্রী কুলপুরোহিতের রাগ প্রশমিত করার জন্য তাঁর বাড়ির সামনে আমরণ অনশনে বসেন। সপ্তাহ দুয়েক অনশন চলার পর কুলপুরোহিতের রাগ খানিকটা প্রশমিত হয় এবং তিনি জানান তাঁর অভিশাপের হাত থেকে চৌধুরি পরিবারকে এক মাত্র মা কালী রক্ষা করতে পারেন। যদি চৌধুরি পরিবার নদীর ধারে তাঁর পছন্দ মতো একটা বিরাট কালী মন্দির তৈরি করতে পারে তাহলে হয়তো তারা নির্বংশ হবার হাত থেকে রক্ষা পাবে। কালী মন্দির নির্মাণের সেই শুরু। পরে অবশ্য একটু একটু করে মন্দির চত্বরের বিস্তার ঘটেছে। ইতিহাস সাক্ষী, চৌধুরি পরিবার আদৌ নির্বংশ হয়নি। তবে সেটা কুলপুরোহিতের নির্দেশ মেনে মন্দির তৈরি করার জন্য কিনা বলা শক্ত।

## (৪)

বেলা চারটে নাগাদ একটা ফোন এল। আদিত্য তখন তার আপিস ঘরে বসে বসে কড়িকাঠ গুনছে। টেলিফোনের ওপারে অমিতাভর গলা। 'রোববার এলি নাকেন? তোর জন্য তিনটে অব্দি বসে রইলাম। একটা ফোন পর্যন্ত করলি না।'

'হঠাৎ কাজে আটকে পড়েছিলাম। তোদের বাড়ি যে যেতে হবে সেটাই মাথা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। যখন মনে পড়ল তখন খুব দেরি হয়ে গেছে। তোরা একটা ফোন করলে মনে পড়ত, কিন্তু যেতে পারতাম বলে মনে হয় না। মক্কেলের সঙ্গে তারই গাড়িতে রাজারহাট গিয়েছিলাম। সেখান থেকে মক্কেল না পৌঁছে দিলে ফিরতেই পারতাম না। তাকে তো আর বলা যায় না তাড়াতাড়ি বালিগঞ্জ পৌঁছে দিন। বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্ন আছে।'

'আমি ফোন করতে যাচ্ছিলাম, রত্না করতে দিল না। বলল, নিজে থেকে এলে আসবে, খোসামোদ করে আনতে হবে না। তোর ওপর প্রচণ্ড রেগে আছে।'

'ও আমি ম্যানেজ করে নেব।'

'শোন, আজ সন্ধের মধ্যে চলে আয়। রাত্তিরে খেয়ে ফিরবি। খুব রাত্তির হয়ে গেলে থেকে যাবি। আজ বাজারে ভাল কই পেয়েছি। রত্না জমিয়ে তেল কই রাঁধছে। তাছাড়া আমার এক ছাত্র তার দেশের বাড়ি

থেকে চমৎকার পয়রা গুড় দিয়ে গেছে। পায়েস হচ্ছে। রত্না তোকে ফোন করতে বলল। রেগে আছে বলে নিজে ফোন করছে না।'

'আজ কোনও কাজ নেই। একটু পরেই পৌঁছে যাচ্ছি। তেল কই, নতুন গুড়ের পায়েস মিস করার প্রশ্নই ওঠে না।'

পাঁচটার একটু পরে আদিত্য আপিসে তালা বন্ধ করে বেরিয়ে পড়ল। শীতের বেলা পড়ে এসেছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আদিত্য লক্ষ করল কয়েকটা ঘরে এর মধ্যেই আলো জ্বলে উঠেছে। একতলায় নেমে শ্যামলের সঙ্গে মুখোমুখি। শ্যামল এই পুরোনো আপিস বাড়িটার ম্যানেজার কাম দারোয়ান। দরকার মতো চা-টাও এনে দেয়। শ্যামল বলল, 'আদিত্যবাবু আজ সকালে একজন আপনার খোঁজে এসেছিলেন। বোধহয় মক্কেল। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার এখানে ভিড় কেমন হয়? মনে হল বলতে চাইলেন, আপনার মক্কেল-টক্কেল হয়, নাকি বসে বসে মাছি তাড়ান?'

'মক্কেল? কী রকম দেখতে বলত?'

'মাথায় ঢেউ খেলানো চুল, কাঁধ অব্দি নেমে গেছে। চোখে কালো চশমা। মানে রোদ্দুর ঢাকার জন্যে লোকে যেরকম পরে।'

'তারপর?'

'আপনার পাশের আপিসের আগরওয়াল সাহেব তখন ঢুকছিলেন। আমি উত্তর দেবার আগেই বলে উঠলেন, আরে দাদা এর মক্কেল-টক্কেল কিচ্ছু হয় না। একদম বেকার কা আদমি। আপনার সাহায্য দরকার হলে অন্য জায়গায় যান। শুনে ভদ্রলোক ঘাবড়ে গিয়ে চলে গেলেন।'

আদিত্যর মনে পড়ে গেল আগরওয়ালের সঙ্গে কদিন আগেই দেয়ালে পানের পিক ফেলা নিয়ে খুব কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। লোকটা শুধু নোংরা নয়, এক নম্বরের বদমাস। কিছু একটা গন্ডগোলের ব্যবসা করে। তার আপিসে বেশ কয়েক বার পুলিশ রেড হয়ে গেছে। আর একটু ভদ্র জায়গায় একটা আপিস জোগাড় করতে না পারলে আদিত্যকে বোধহয় ডিটেকটিভগিরিটাই ছাড়তে হবে। সে কিছু না বলে রাস্তায় নামল।

আদিত্যর মিনিবাসটা যখন তাকে বালিগঞ্জ ফাঁড়িতে নামিয়ে দিল তখন ঘড়িতে সোয়া ছটা বেজে গেছে। রাস্তায় খুব জ্যাম ছিল। প্রত্যেক দিন শহরের রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা বাড়ছে। এবছর শীতটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। মিনিবাসের ভিড়ে ঠান্ডাটা টের পাচ্ছিল না, বড় রাস্তা থেকে গলির ভেতর ঢুকতেই এক ঝলক উত্তরের হাওয়া আদিত্যর মুখে এসে ঝাপটা মারল। মাফলারটা ভালো করে গলায় পেঁচিয়ে নিতে নিতে আদিত্যর মনে পড়ে গেল প্রত্যেক শীতে সে বাবার সঙ্গে রাত জেগে গান শুনতে যেত। কত কনফারেন্স, কত বিনিদ্র রজনী। একবার, এই রকমই এক শীতের সন্ধেবেলা, একটা ঘরোয়া অনুষ্ঠানে পণ্ডিত রবিশঙ্কর হংসকিঙ্কিণী বলে একটা ভারি মিষ্টি রাগ বাজিয়ে ছিলেন। তার আগে এই রাগটা আদিত্য কখনও শোনেনি। সে ভেবেছিল ওটা বুঝি পণ্ডিতজির নিজের তৈরি করা রাগ। পরে বাবা বলেছিল, হংসকিঙ্কিণী খুব পুরোনো রাগ। জয়পুর বা গোয়ালিয়র ঘরানায় রাগটার রীতিমতো চল আছে। বাড়ি ফিরে বাবা স্পুল থেকে গোয়ালিয়রের পুরোনো ওস্তাদ কৃষ্ণরাও শঙ্কর পণ্ডিতের একটা হংসকিঙ্কিণীর বন্দিশ শুনিয়েছিল। কোথায় যে গেল সেই স্পুলগুলো।

রাত্তিরে বেশি খাওয়া হয়ে গেল। রত্নার রাগ বেশিক্ষণ টেকেনি। আসলে অমিতাভ-রত্না ওর সহপাঠী বা পুরোনো বন্ধু তো শুধু নয়। আদিত্যর পরিবার বলতে ওরাই। আর আদিত্যও ওদের পরিবারেরই একজন। খাবার পর আটতলার বারান্দায় সিগারেট ধরিয়ে আদিত্য ঠিক করতে পারছিল না আজ এখানে থেকে যাবে নাকি মেসে ফিরে যাবে। মেসে ফিরে যাবার একমাত্র কারণ হল, কাল থেকে চৌধুরি বাড়ির কেসটা নিয়ে পুরোদমে লেগে পড়তে হবে। অ্যাডভান্স নিয়ে ফেলেছে, এখনও তেমনভাবে কাজ শুরু করতে পারেনি। তাছাড়া কাল সকালে বিমলেরও আসার কথা আছে। হঠাৎ টের পেল, অমিতাভ পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

'গান-টান শুনিস আজকাল নাকি শুধুই জেমস বণ্ডগিরি চলছে?' অমিতাভ কথা বলতে বলতে একটা পান এগিয়ে দিল।

তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আদিত্য পালটা প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, হংসকিঙ্কিণী রাগটা তোর মনে আছে?'

'নিশ্চয় মনে আছে। কেন বলত?'

'আজ বিকেল থেকে রাগটার কথা খুব মনে পড়ছে। ভারি মিষ্টি রাগ। দুটো গান্ধার লাগে। ওঠার সময় শুদ্ধ, নামার সময় কোমল। নামার সময় শুদ্ধ রেখাবও লাগে। বাবার খুব পছন্দের রাগ ছিল। আজকাল বোধহয় কেউ গায়-টায় না।'

'কে বলল গায় না? এই তো সেদিন নন্দন চক্রবর্তী গাইল। নন্দনের গান শুনেছিস তো? আউটস্ট্যান্ডিং।'

'আমাকে যদি হংসকিঙ্কিণী শোনাতে পারিস, আজ রাত্তিরটা তোদের বাড়ি থেকে যাব।'

'অবশ্যই শোনাব। নন্দন চক্রবর্তীর হংসকিঙ্কিণীটাই শোন। কিন্তু তার আগে দাঁড়া রত্নাকে সুখবরটা দিয়ে আসি। গেস্ট রুমে তোর বিছানাটা করে রাখুক।' অমিতাভর গলায় খুশি ঝরে পড়ছে।

নন্দন চক্রবর্তীর হংসকিঙ্কিণী শেষ হতে হতে রাত বারোটা বেজে গেল। অমিতাভ এক ফোঁটাও বাড়িয়ে বলেনি। সত্যিই আউটস্ট্যান্ডিং। ভাগ্যিস প্রোগ্রামটা অমিতাভ রেকর্ড করে রাখতে পেরেছিল। আদিত্য যখন শোবার তোড়জোড় করছে, মানে শোবার আগে দিনের শেষ সিগারেটটার সদ্ব্যবহার করতে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় দরজায় অমিতাভর টোকা পড়ল।

'কেমন লাগল বল।'

'সত্যিই অসাধারণ। আমি তো এর গান এই প্রথম শুনলাম। বয়েস কীরকম?'

'চল্লিশের নীচে। সম্ভবত বছর পঁয়ত্রিশ। ভীষণ ট্যালেন্টেড, কিন্তু জীবনে ডিসিপ্লিন জিনিসটার একান্তই অভাব। তাই ভয় করে পুরো ফোটার আগেই না ঝরে যায়। এরকম আগেও দেখেছি।'

'তুই একে চিনিস?'

'চিনি তো বটেই। নিছক চেনার থেকে অনেক বেশি। বলতে পারিস, এই মুহূর্তে আমিই ওর মেন্টার ও প্রোমোটার।'

'কলকাতার ছেলে?'

'না, দিল্লির। ওখানেই তালিম পেয়েছে। তবে এখন কলকাতায় থাকে। ওর এক বান্ধবী আছে, সেতার বাজায়। তার সঙ্গেই থাকে। যাকে বলে লিভিং টুগেদার। বান্ধবীটি, বলাই বাহুল্য, ওর মতো ট্যালেন্টেড নয়। কিন্তু নন্দনকে অপার মমতায় আগলেরাখে। সোহিনী বিশ্বাস করে, একদিন নন্দন ফৈয়জ খাঁ আমীর খাঁর মতো মস্ত নাম করবে।'

'বান্ধবীর কী নাম বললি?'

'সোহিনী। সোহিনী মৈত্র।'

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(১)

আদিত্য বেহালার এদিকটায় আগে কখনও আসেনি। শঙ্খমালা সেন ফোনে মোটামুটি একটা ডিরেকশন দিয়ে দিয়েছিলেন। ডায়মন্ডহারবার রোডের ওপর ম্যান্টন বাস স্টপে নেমে বাঁদিকে অর্থাৎ পুবদিকে হাঁটা লাগাতে হবে। একটু পরে জেমস লঙ পড়বে। সেটা পেরিয়ে আরও মিনিট তিন-চার হাঁটলে দেখা যাবে রাস্তাটা বাঁদিকে বেঁকে গেছে। সেই বাঁকের মুখে একটা পুকুর। পুকুরের উল্টোদিকে তিনতলা গোলাপি বাড়ি, একতলায় ছাত্রদের কোচিং সেন্টার, বাড়ির গায়ে সুব্রত সেন, শঙ্খমালা সেনের নাম লেখা আছে।

আপিসযাত্রীদের উল্টোমুখো বাস, তেমন ভিড় নেই। বাসে উঠে আদিত্য বসার জায়গা পেয়েছিল। কিন্তু বসে আছে তো বসেই আছে, বাস আর নড়ে না। মেট্রো রেল তৈরি হবার কারণে ডায়মন্ড হারবার রোডটা একেবারে বেহাল হয়ে গেছে। বাসটা টিকিয়ে টিকিয়ে ম্যান্টন পৌঁছল এগারোটা নাগাদ। ভাগ্যিস আদিত্য হাতে সময় নিয়ে বেরিয়েছিল। শঙ্খমালা সেন কিন্তু ডিরেকশনটা ভালোই দিয়েছিলেন। ডিরেকশন অনুযায়ী মিনিট সাত-আট হাঁটার পরেই পুকুরটা চোখে পড়ল। পুকুর নয়, বেশ বড় একটা দিঘি। হাঁস চরছে। বটগাছের ডাল নেমেছে জলের ওপর। পাঁজরা বার করা রোগা ডিগডিগে কয়েকটা ছেলে ডালের ওপর উঠে দিঘিতে ঝাঁপ দিচ্ছে, সাঁতরে পাড়ে এসে উঠছে আবার, ফের গাছে চড়ে জলে ঝাঁপাচ্ছে, এটাই তাদের খেলা। শঙ্খমালার সঙ্গে দেখা করার কথা সাড়ে এগারোটায়, এখনও খানিকটা সময় বাকি আছে। আদিত্য দিঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ছেলেদের জলকেলি দেখল, একটা সিগারেট খেল, দিঘির চারদিকটা একবার পাক দিল, তারপর সাড়ে এগারোটা বাজার মিনিট পাঁচেক আগে গোলাপি বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একতলায় অঙ্কের কোচিং ক্লাস চলছে। রাস্তা থেকেই একটা ঢাউস ব্ল্যাক বোর্ড চোখে পড়ে। আদিত্যর দিকে পিছন ফিরে লম্বা ছিপছিপে এক ব্যক্তি চিতা বাঘের ক্ষিপ্রতায় বোর্ডের এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো অঙ্ক কষে যাচ্ছেন আর ঘরের জনা কুড়ি ছেলেমেয়ে রুদ্ধশ্বাসে সেসব খাতাবন্দি করে রাখছে। ছেলেমেয়েগুলোর কাহিল অবস্থা দেখে আদিত্যর কষ্ট হল। বিশেষ করে একটু দূরে যে ছেলেগুলো মহা আনন্দে জলে ঝাঁপ দিচ্ছে তাদের তুলনায় তো এদের রীতিমতো বন্দি দশা।

আদিত্য জানলার সামনে দাঁড়িয়ে কী করবে ভাবছে এমন সময় মাস্টারমশাই পেছন ফিরলেন। ফিরেই দেখতে পেলেন আদিত্য জানলার কাছে কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

'কাউকে খুঁজছেন?'

'হ্যাঁ, শঙ্খমালা সেন কি এখানে থাকেন?'

'পাশ দিয়ে চলে যান। দেখবেন দোতলায় ওঠার দরজা আছে। ওখানে বেল বাজান।'

সোহিনীর কথা শুনে শঙ্খমালা সম্বন্ধে আদিত্যর মনে একটা ছবি তৈরি হয়েছিল, দেখা গেল তার থেকে বাস্তবের শঙ্খমালা অনেকটাই আলাদা। আদিত্য ধরে নিয়েছিল, কেন ধরে নিয়েছিল সেটা অবশ্য তার নিজের কাছেই পরিষ্কার নয়, শঙ্খমালা হবে খর্বকায়, বলিষ্ঠ, ফরসা। বাস্তবে কিন্তু দেখা গেল যিনি দরজা খুললেন তাঁর উচ্চতা পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চির কম হবে না, ছিপছিপে গড়ন, রঙ শ্যামলা। বড় বড় চোখে একটা সারল্য আছে, এক ঝলক দেখে মনে হয় মানুষটা সোজা-সাপটা।

'নমস্কার। আমার নাম আদিত্য মজুমদার। আমিই আপনাকে ফোন করেছিলাম।' আদিত্য দুই করতল বুকের ওপর জড়ো করে বলল।

'বুঝতে পেরেছি। ওপরে আসুন।'

সিঁড়িটা পরিষ্কার, দেখে মনে হয় যত্ন পেয়েছে। কয়েক ধাপ উঠে বড় সিঁড়ি, তার সামনের দেয়ালে তাক, তাকে সৌখিন প্যাঁচা, গণেশ, সাময়িক পত্রপত্রিকা, দুয়েকটা ইংরেজি বেস্ট সেলার।

'সোহিনী আমাকে আপনার কথা বলেছে। আপনি নাকি চৌধুরি বাড়ি নিয়ে বই লিখছেন।' শঙ্খমালা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সেইজন্যই তো আপনার কাছে আসা।'

দোতলায় উঠেই বসার ঘর। সোফা-কৌচ-সেন্টার টেবিল, এক কোনে একটা টিভি। টিভির ওপর একটা সাত-আট বছরের ছেলের ফ্রেমে বাঁধানো ফটোগ্রাফ। সব মিলিয়ে স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত বাড়ির মডেল চিত্র। আদিত্য একটা কৌচে বসল।

'চা খাবেন তো।' উল্টোদিকের সোফাটায় বসতে গিয়েও শঙ্খমালা উঠে দাঁড়াল, সম্ভবত আদিত্যর জন্য চায়ের জোগাড় করতে যাবে বলে।

'একটু চা খেতে পারি, দুধ চিনি ছাড়া। কিন্তু আপনাকে অযথা ব্যস্ত করতে চাই না।' আদিত্য কুণ্ঠিতভাবে বলল।

'একটু চা খাবেন তাতে ব্যস্ত হবার কী আছে?'

কিছুক্ষণ পরে চায়ে প্রথম চুমুকটা দিয়ে আদিত্য বলল, 'আমি যে বইটা লেখার কথা ভাবছি সেটা আসলে শিল্পপতি সুবীর চৌধুরির একটা বায়োগ্রাফি। বাংলায় লিখব। বাংলায় ভালো বায়োগ্রাফির বেশ অভাব। সেই ফাঁকটাতে ঢুকে কিছু কাজ করার সুযোগ আছে। আপনি তো জানেন, একটা ইন্টারেস্টিং বায়ো-র মধ্যে কিছু কিছু উপন্যাসের এলিমেন্ট থাকে। বিশেষ করে যাঁর জীবনী লিখছি তাঁর চরিত্রটা খুব সাবধানে ডেভেলপ করতে হয়। এখানে কিছুটা কল্পনার আশ্রয় তো নিতেই হবে, কিন্তু যতটা বাস্তবের কাছাকাছি থাকা যায় তত ভাল। সেই জন্যই আপনার কাছে আসা। আপনি নিশ্চয় আপনার বাবাকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। আপনার ইম্প্রেশনটা তাই খুব মূল্যবান। শুধু সুবীর চৌধুরি নন, বাড়ির অন্যান্যদের সম্বন্ধেও আপনার ধারণাগুলো আমার খুব কাজে লাগবে। তাছাড়া আপনি নিজেও তো আমার বই-এর একটা চরিত্র।

'বইটা কি আপনি নিজের থেকেই লিখছেন, নাকি চৌধুরি এন্টারপ্রাইজ থেকে কমিশন করেছে?'

আদিত্য প্রশ্নটার জন্য প্রস্তুত ছিল, তবে ভাবেনি সেটা শঙ্খমালার কাছ থেকে আসবে। সোহিনী শঙ্খমালার যেরকম বর্ণনা দিয়েছিল তাতে একটা ফুর্তিবাজ, হালকা চরিত্রের মহিলার ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে শঙ্খমালা সেন বেশ সজাগ মানুষ। আদিত্য মুখে বলল, 'বইটা লেখার জন্য স্বয়ং মন্দাকিনী চৌধুরি আমাকে অনুরোধ করেছেন।'

'তাই নাকি?'

আদিত্য লক্ষ করল এক মুহূর্তের জন্য একটা অকৃত্রিম বিস্ময় শঙ্খমালার মুখে খেলে গেল। আদিত্য নিজেকে আর একটু বিশ্বাসযোগ্য করবার জন্য বলল, 'আমি বেশ কিছুদিন একটা বাংলা দৈনিকের বিজনেস ডেস্কে কাজ করেছি। হালে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ফ্রিলান্স করছি। এটা আমার কার্ড।'

আদিত্য পকেট থেকে ভিজিটিং কার্ডের বান্ডিলটা বার করে শঙ্খমালার দিকে একটা এগিয়ে দিল। তারপর বলল, 'আপনার আপত্তি না থাকলে আপনার ইন্টারভিউটা টেপ করব। লেখার সময় আমার খুব কাজে লাগবে।'

'করুন। আপত্তি নেই।'

আদিত্য পকেট থেকে মোবাইল বার করল। মোবাইলে অডিও রেকর্ডারটা চালু করে টেবিলে রাখল। তারপর শঙ্খমালাকে তার প্রথম প্রশ্নটা করল, 'আপনার বাবাকে আপনি কীভাবে ডেস্ক্রাইব করবেন? মানে, ঠিক মূল্যায়ন নয়, তাঁর চরিত্রের খুঁটিনাটি দিকগুলোর কথা জানতে চাইছি। বিশেষ করে যদি কোনও ইডিওসিনক্রেসিস থাকে সেগুলো জানতে চাই।'

শঙ্খমালা খানিক ভাবল। চায়ের কাপে শেষ চুমুকটা দিয়ে বলল,

'জানি না কীভাবে শুরু করব। আমার বাবা সুবীর চৌধুরি খুবই ব্যস্ত মানুষ ছিলেন। আমার কাছে খানিকটা দূরের মানুষও ছিলেন। ব্যবসার কাজে বাবাকে মাসে অন্তত পনেরো দিন কলকাতার বাইরে থাকতে হত।

যখন কলকাতায় থাকতেন তখনও বাড়িতে আর কতটুকু থাকতেন? আমার মা যখন মারা যান তখন আমার দু'বছর চার মাস বয়েস। কাজেই মাকে আমার মনে নেই বললেই চলে। চৌধুরি বাড়ির পুরোনো কর্মচারীরা বলে, মা বেঁচে থাকতে বাবা অনেক হাসিখুশি মানুষ ছিলেন। মার অকালমৃত্যু বাবার চরিত্রটাকেই পালটে দেয়।'

'সুবীর চৌধুরি কি খুব গম্ভীর মানুষ ছিলেন?'

'ঠিক গম্ভীর নয়, বাবা সর্বদা একটা বিষণ্ণতায় ভুগতেন। দেখুন, অ্যাজ এ বিজনেস পারসোন্যালিটি হি ওয়াজ এ গ্রেট সাকসেস। কিন্তু কেন জানি না, সব সময়েই তাঁকে অতৃপ্ত মনে হত। মনে হতো, হি ওয়াজ নেভার স্যাটিসফায়েড উইথ হিমসেলফ।'

'এই বিষণ্ণতাটা কি তাঁর দ্বিতীয় বিবাহের পর কমেছিল?'

'কমেনি, মোটেই কমেনি, বরং বেড়েছিল।'

'সুবীর চৌধুরির কি একটু ভাবপ্রবণ ছিলেন? তাঁর কি মাঝে মাঝে ইমোশানাল আউটবার্স হত?'

'ঠিক উল্টো। হি ওয়াজ পোকার-ফেসড। তাঁর মুখে সব সময় একটা বিষণ্ণতা লেগে থাকত বটে, কিন্তু তাঁর মুখ দেখে বোঝা যেত না তিনি রেগে আছেন না তুষ্ট আছেন, চিন্তায় আছেন না নিশ্চিন্ত আছেন, ক্লান্ত আছেন না চনমনে আছেন। তাছাড়া তিনি কথাও খুব বেশি বলতেন না।'

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল, কেউ উঠে আসছে। একটু পরেই যিনি ঘরে এসে ঢুকলেন তিনিই এতক্ষণ নীচে ছাত্র পড়াচ্ছিলেন। আদিত্য আন্দাজে বুঝে নিল ইনিই গৃহকর্তা।

'আমার স্বামী সুব্রত, ' শঙ্খমালা আলাপ করিয়ে দিল, 'সুব্রত ঠাকুরপুকুরের কাছে রামকৃষ্ণ কলেজে অঙ্ক পড়ায়। আর সুব্রত, ইনি আদিত্য মজুমদার, জার্নালিস্ট, বাবার ওপর একটা বই লিখছেন।'

সুব্রত স্ত্রীর পাশে, সোফায় বসল। বলল, 'মালা বলছিল আপনি আসবেন। বোধহয় সোহিনী ফোন করেছিল। চা খেয়েছেন?'

'খেয়েছি। আপনিও থাকুন না। আপনার কাছ থেকেও অনেক কথা জানার আছে।'

'থাকছি তো। আর একটু চা খান। আমি এই সময় একটু খাই। ছাত্র ঠেঙিয়ে গলাটা একেবারে ধরে যায়। নিশ্চয় ভাবছেন, কলেজে না গিয়ে বাড়িতে টিউশানি করছে, এ কেমন লোক। তাই বলি, আমার হল ইভিনিং কলেজ। ছটা থেকে শুরু।'

একটু পরে আবার চা এল। সুব্রত সেন অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। তার কলেজের কথা, এই পাড়াটার কথা, রাজনীতি, ক্রিকেট, বাড়ি-জমির দাম। আদিত্য ক্রমশই অস্বস্তি বোধ করছিল। একসময় অডিও রেকর্ডারটাও বন্ধ করে দিল। আদিত্য খেয়াল করল, সুব্রত সেন লোকটা কিন্তু বেশ সুপুরুষ। চৌকো মুখ, তীকষ্ন নাক, লম্বা, ছিপছিপে, রগের চুলে পাক ধরেছে। শুধু বড্ড বেশি কথা বলে। তার মনে পড়ে গেল, সোহিনী সুব্রত সেন সম্বন্ধে বলেছিল 'নিরীহ কিন্তু নির্লোভ নয়।' কেন বলেছিল কে জানে। আদিত্য মরিয়া হয়ে পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরতে চাইল, 'আমি আপনাদের খুব বেশি সময় নেব না। আমার কয়েকটা মাত্র প্রশ্ন আছে। দুটো প্রশ্ন, দুটো বড় ঘটনা ঘিরে। প্রথম ঘটনা, সুবীর চৌধুরির দ্বিতীয় বিবাহ। প্রশ্ন, আপনার বাবার দ্বিতীয় বিয়েটা আপনারা, মানে আপনি এবং আপনার দাদা কীভাবে নিয়েছিলেন? প্রশ্নটা কি খুব ব্যক্তিগত হয়ে গেল?'

শঙ্খমালা কিছু বলার আগেই সুব্রত বলে উঠল, 'না, না, ব্যক্তিগত কীসের। সুবীর চৌধুরিকে নিয়ে বই লিখতে গেলে এই প্রসঙ্গটা তো বাদ দিলে চলবে না। আমি মালার হয়ে উত্তরটা দিচ্ছি। মালার দাদার কথা জানি না, তার সঙ্গে আমার কোনও দিনই তেমন একটা পটেনি, কিন্তু বাবা দ্বিতীয়বার বিয়ে করার পর মালাকে একেবারে ভেঙে পড়তে দেখেছি।'

'একটু খুলে বলবেন?' অডিও রেকর্ডারটা ফের চালিয়ে দিয়ে আদিত্য বলল।

'দেখুন, সুবীর চৌধুরি যখন দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন তখন বছর পাঁচেক হয়ে গেছে আমি মালাকে পড়াচ্ছি। মূলত অঙ্ক পড়াই, পাশাপাশি অন্য সায়েন্স সাবজেক্ট, মানে ফিজিক্স-কেমিস্ট্রিগুলোও একটু দেখিয়ে দিই। মালার পড়াশোনায় মন নেই, আমার কাছে নানারকম গল্প করে, সারাদিন বাড়িতে কী হল, ফিজিকাল ইন্সট্রাক্টার কী কী নতুন এক্সারসাইজ দিয়েছে, নতুন কী সিনেমা আসছে, এইসব। জানেন তো স্কুলে পড়ার সময় মালা খুব ভাল অ্যাথলিট ছিল। ব্যাডমিন্টন খেলত। বেশ কয়েকবার স্টেট খেলেছে।'

'হ্যাঁ, শুনেছি।'

আদিত্য লক্ষ করল স্বামী কথা বলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে মালা একদম চুপ করে গেছে।

'আমারও তখন বুঝলেন অল্প বয়েস, সদ্য এম এসসি পাশ করে একটা স্কুলে পড়াচ্ছি। একটু একটু করে মালার সঙ্গে ইমোশানালি জড়িয়ে পড়লাম। কী গো, ঠিক বলছি তো?'

শেষের প্রশ্নটা, বলাই বাহুল্য স্ত্রীর উদ্দেশে। শঙ্খমালা ক্রমশ রক্তিম হচ্ছে, অস্বস্তি কাটানোর জন্য প্রসঙ্গ পালটাতে চাইল,

'বাবা দ্বিতীয়বার বিয়ে করবে আগে থেকেই টের পাচ্ছিলাম। দু'একবার মামকে নিয়ে বাড়িতে এল। আমার আর দাদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। মন্দাকিনী চৌধুরিকে, তখনও অবশ্য চৌধুরি হয়নি, ম্যাম বলতাম। ম্যাম থেকে মাম। কিছুদিন পর গসিপ কলমগুলো সুবীর চৌধুরির সম্ভাব্য অ্যাফেয়ারের কেচ্ছায় ভরে গেল। বাবার সঙ্গে মামের প্রচুর ছবি ছাপা হতে লাগল। স্কুলে মুখ দেখাতে পারি না। কী অপমান!'

শঙ্খমালার ঠোঁটদুটো থরথর করে কাঁপছে। ঘরের আবহাওয়া রীতিমতো ভারি হয়ে উঠেছে। এমনকি বাচাল সুব্রতও চুপ করে আছে। আদিত্য জিজ্ঞেস করল, 'সুবীর চৌধুরির দ্বিতীয় বিয়েটা তো কলকাতাতেই হয়েছিল। আমি পুরোনো খবর কাগজের ক্লিপগুলো সংগ্রহ করেছি। দু'একটা ফটোগ্রাফও।'

'হ্যাঁ। ব্যারাকপুরের কাছে গঙ্গার ধারে চৌধুরিদের একটা পুরোনো বাগানবাড়ি আছে। সেটা সারানো হল। সেখানেই এলাহি ব্যবস্থা। দেশ-বিদেশ থেকে অতিথি এসেছিল। তবে আমি আর দাদা যাইনি।'

'সেদিন সারা সন্ধেটা মালা আমার সঙ্গে পড়ার ঘরে বসেছিল। সারা সন্ধেটা ধরে মালা শুধু কেঁদেই গেল। বলতে গেলে সেই সন্ধেবেলাতেই ঠিক করলাম মালাকে নিয়ে এই চৌধুরি বাড়ি থেকে পালাতে হবে।' সুব্রত প্রায় ফিসফিস করে বলল।

দ্বিতীয় ঘটনা, বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে আপনাদের বিয়ে। আপনাদের বিয়েটা সুবীর চৌধুরি কীভাবে নিয়েছিলেন?'

'ভালভাবে নেননি, মোটেই ভালভাবে নেননি।' সুব্রত কিছু বলার আগেই শঙ্খমালা প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ ভেরি ভেরি আনফেয়ার। ওঁর টাকাপয়সা ছিল বলে উনি যাকে খুশি যখন খুশি বিয়ে করতে পারবেন, কিন্তু ছেলেমেয়েরা ওঁর ওপর ডিপেন্ডেন্ট তাই তাদের নিজস্ব পছন্দের কোনও দাম নেই। এটা তো আটারলি অটোক্র্যাটিক।'

সুব্রত শান্তস্বরে বলল, 'আমাদের বিয়ে নিয়ে কোনও আইনি ঝামেলা ছিল না। বিয়ের সময় আমরা দুজনেই অ্যাডাল্ট হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু বিয়েটা সুবীর চৌধুরির ইগোতে আঘাত করেছিল। ফলে বিয়ের পর বেশ কিছুদিন আমাদের চৌধুরি বাড়িতে ঢোকা নিষেধ হয়ে গেল। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা ঢুকতেও চাইনি। প্রথমে কিছুদিন বেহালাতেই একটা ভাড়া বাড়িতে রইলাম। আপনাকে বলতে বাধা নেই, প্রথম কয়েক বছর একটু টানাটানিতেই কেটেছিল, কিন্তু মনে সুখের অভাব ছিল না। তারপর কলেজের চাকরিটা পেলাম। মাইনে-পত্তর বাড়ল। একটু একটু করে এই বাড়িটা করলাম। আরও অনেক পরে মাম-এর মধ্যস্থতায় এবং কিছুটা পীড়াপীড়িতে সুবীর চৌধুরির সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের খানিকটা উন্নতি হয়। আমরা আবার চৌধুরি বাড়িতে যেতে শুরু করি। এখনও যাই, তবে কালেভদ্রে।'

শঙ্খমালা নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়েছে। বলল, 'আমি বাবার ভীষণ ক্লোজ ছিলাম। কোনও দিন ভাবিনি বাবা আবার বিয়ে করতে পারে। বাবার দ্বিতীয় বিয়েটা আমার কাছে একটা বিরাট ডিসাপয়েন্টমেন্ট।

ওই সময় সুব্রত না থাকলে আমি বোধহয় পাগল হয়ে যেতাম। এসব কথা আপনি আপনার বইতে পরিষ্কার করে লিখে দিতে পারেন।'

'মন্দাকিনী চৌধুরির সঙ্গে আপনাদের সম্পর্কটা কেমন?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'ভাল সম্পর্ক। সোহিনীকেও আমাদের ভাল লাগে।' সুব্রত সহজ স্বরে বলল। হয়তো সে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে শঙ্খমালা বলে উঠল,

'আমি কিন্তু মামকে পুরোপুরি বিশ্বাস করি না। শি ইজ টূকুল অ্যান্ড ক্যালকুলেটিং টু ট্রাস্ট। এনজয়েস পাওয়ার অ্যান্ড মানি। এটা অবশ্য অফ দ্য রেকর্ড বললাম। লিখবেন না।'

'আমার শেষ প্রশ্ন। আপনার দাদার ব্যাপারে আপনার কী ধারণা?'

সুব্রত কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তাকে ইশারায় চুপ করতে বলে শঙ্খমালা কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর থেমে থেমে বলল, 'দাদা ওয়াজ মামিজ পেট। মা মারা যাবার পর দাদা একেবারে শ্যাটারড হয়ে যায়। তখন ওর খুব সংবেদনশীল বয়েস। বাবা যদি ওকে আর একটু সময় দিত তাহলে হয়তো ও এতটা বিপথে যেত না।'

আদিত্য ঘড়ি দেখল। একটা বেজে গেছে। আর এখানে থাকাটা ঠিক নয়। এদের খাওয়া-দাওয়া আছে। তার নিজেরও খিদে পেয়েছে। আর দেরি করলে মেসে ফিরে খাবার পাবে না। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনাদের দুজনকেই অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমার আর কিছু জানার হলে ফোন করব। আজ চলি।'

ফেরার পথে বাসে বসে আদিত্য ভাবছিল, শঙ্খমালা মন্দাকিনী চৌধুরিকে কুল অ্যান্ড ক্যালকুলেটিং বলল কেন? সোহিনীই বা সুব্রত সেনকে নির্লোভ নয় মনে করে কেন? সাধারণত এই ধরনের ইম্প্রেশনের পেছনে কোনও ঘটনা থাকে। ঘটনাগুলো জানা দরকার।

## (২)

সাতসকালে বিমল এসে হাজির। আদিত্যর চোখে তখনও রাজ্যের ঘুম লেগে আছে।

'শেয়ালদায় ট্রেন ধরতে যাচ্ছিলাম স্যার, ভাবলাম দেখা করে যাই। বনগা লাইনের গোবরডাঙায় বউ-এর বাপের বাড়ি। এক হপ্তা হল বউ রাগ করে বাপের বাড়ি গিয়ে বসে আছে। এখন রাগ পড়েছে, তাই আনতে যাচ্ছি।'

'সে নয় হল। কিন্তু এই ক'দিনে কাজ কিছু এগিয়েছে? যার হদিশ করতে বলেছিলাম তার হদিশ করতে পেরেছ?'

'পেরেছি বলেই তো দেখা করতে এলাম স্যার। ভাবলাম টেলিফোনে খবরটা না দিয়ে মুখোমুখি গিয়ে বলে আসি। এদিক দিয়ে তো যেতেই হচ্ছে।'

'তুমি একটু বোসো, আমি মুখটা ধুয়ে আসি। আচ্ছা এক কাজ করো। দোতলায় খাবার ঘরে বলরাম আছে। ওকে এই টাকাটা দিয়ে চা আর গোটা চারেক বিস্কুট আনতে বলো।'

আদিত্য দেয়ালে ঝোলানো শার্টের পকেট থেকে একটা কুড়ি টাকার নোট বিমলের হাতে দিয়ে বাথরুমে ঢুকল। মিনিট পনেরো পরে চায়ে সশব্দে একটা চুমুক দিয়ে বিমল বলতে শুরু করল, 'যার খোঁজে পাঠিয়েছিলেন স্যার সেই শঙ্খদীপ চৌধুরি একেবারে থার্ডক্লাশ একটা লোক। আপনি যে ছবিটা দেখিয়েছিলেন সেটা ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের একটা বারের ছবি। যেমন থার্ডক্লাশ লোক, তেমনি থার্ডক্লাশ জায়গা। হেন কুকাজ নেই সেখানে হয় না। রাত্তিরে খারাপ মেয়েদের নাচ হয়, দু'চার পয়সা খরচা করলেই সেইসব বস্তাপচা মেয়েদের সারা রাত্তিরের জন্য পাওয়া যায়। তাছাড়া গাঁজা, হেরোইন, ব্রাউন সুগার না কীসব যেন বলে, সমস্ত নেশার জিনিস পয়সা ফেললেই সেখানে সঙ্গে সঙ্গে হাজির হয়ে যাবে। এরকম নরক আগে

কখনও দেখিনি স্যার। আমার ভয় করছিল, ওখান থেকে বেরুচ্ছি চেনাশোনা কেউ দেখে ফেললে আর ভদ্র সমাজে মুখ দেখানো যাবে না। শঙ্খদীপবাবুর খোঁজে তিন-চার বার ওখানে যেতে হয়েছিল।

'মোবাইলে শঙ্খদীপবাবুর ছবিটা দেখাতে অনেকেই চিনতে পারল। বলল, এ তো শঙ্কুবাবু। জানতে পারলাম শঙ্কুবাবু এখানে রেগুলার আসতেন। কিন্তু মাসখানেক হল তিনি আর ওখানে আসছেন না। এক পুরোনো নেশাখোরের সঙ্গে ভাব জমালাম। নাম বলল পিটার, বাঙালি খ্রিস্টান। আপনি তো জানেন স্যার আমি নেশাভাঙ করি না। সারা দিনে শুধু ওই দশ-বারো কাপ চা। বউ বলাতে বিড়ির নেশাটাও ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু কথা বার করার জন্য ওই নেশুড়েটাকে কয়েক পাত্তর খাওয়াতেই হল। সে ব্যাটাচ্ছেলে কয়েক পাত্তর খাবার পর কীসব পাতা-টাতা গরম করে শুঁকলো। তারপর নেশা একটু চড়তে আমাকে বলল, শঙ্কুবাবুকে খুঁজছ কেন? বললাম, শঙ্কুবাবু আমার কাছে টাকা ধার করেছে, সেই টাকার তাগাদায় এসেছি। সে বলল, কত টাকা? আমি বললাম, সব মিলিয়ে তা প্রায় হাজার দশেক হবে। সে বলল, তোমার মতো আতা-ক্যালানে বাপের জন্মে দেখিনি। শঙ্কুবাবুকে অত টাকা দিয়েছ কেন? ও টাকা জীবনে ফেরত পাবে না। আমি বললাম,শঙ্কুবাবু আমার বাপ-মা মরা ভাইজিটাকে বিয়ে করবে বলেছিল। আর বলেছিল, ব্যবসার জন্য কিছু টাকা ধার চাই। আমার কথা শুনে নেশুড়েটার হাসতে হাসতে বিষম লাগার জোগাড়।'

বিমল একটু থামল। কেটলিতে কিছুটা চা অবশিষ্ট ছিল, উঠে গিয়ে দুটো ভাঁড়ে ঢালল। বলল, 'একটু ঠান্ডা হয়ে গেছে স্যার।'

'ও কিছু হবে না। তারপর কী হল বল।' আদিত্য ঠান্ডা চা-টা এক ঢোঁকে গিলে নিয়ে সিগারেট ধরাল।

'নেশুড়েটা জাতে মাতাল, তালে ঠিক। কিছুতেই বলবে না কোথায় গেলে শঙ্কুবাবুকে পাওয়া যাবে। আরও কয়েক পাত্তর খাওয়াতে হল। অনেক ধানাই-পানাই করে শেষে বলল, মাস খানেক আগে মাইকেলের সঙ্গে শঙ্কুবাবুর ঝামেলা হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করলাম, মাইকেল কে? সে বলল, মাইকেল কে জানো না? মাইকেল এই অঞ্চলের দাদা, এই বারটাকে সে-ই তো আগলে রাখে। কিছুদিন ধরেই বারে শঙ্কুবাবুর টাকা বাকি পড়ছিল। সেদিন মালিকের হয়ে মাইকেল এসে টাকা চাইল। শঙ্কুবাবু তখন নেশায় টং। মাইকেলকে বলল, এই কটা টাকার জন্য আমাকে সবার সামনে অপমান করছিস? জানিস আমি কত বড় বাড়ির ছেলে? মাইকেল বলল, বাতেলা অনেক হয়েছে, এবার টাকা ছাড়। শুনে শঙ্কুবাবুর কী দুর্মতি হল, মাইকেলের নাকে একটা ঘুষি বসিয়ে দিল। তারপর পুরো ঢিসুম ঢিসুম বলিউড। মাইকেল শঙ্কুবাবুকে ভাল করে পেটাই করল। পেটাই করতে গিয়ে কয়েকটা চেয়ার ভাঙল। কয়েকটা গেলাস আর বোতলও ভাঙল। ঠিক যেমন হিন্দি সিনেমায় হয় আর কি। আমরা তো একপাশে সরে গিয়ে সিনেমা দেখছি। হঠাৎ কোথা থেকে মার্থা ছুটে এসে শঙ্কুবাবুকে আড়াল করে দাঁড়াল। সেদিন মার্থা না থাকলে মাইকেল বোধহয় শঙ্কুবাবুকে মেরেই ফেলত। মার্থা মাইকেলকে অনেক কাকুতিমিনতি করল। বলল, শঙ্কুবাবুর সব টাকা সে নিজে মিটিয়ে দেবে। তারপর প্রায় অচৈতন্য শঙ্কুবাবুকে রিক্সায় তুলে নিয়ে বাড়ি চলে গেল। শুনেছি শঙ্কুবাবু সেই থেকে মার্থার বাড়িতেই আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মার্থাটা আবার কে? নেশুড়েটা বলল, মার্থা আগে এই বারে নাচত। এখন বুড়ি হয়ে গেছে বলে ওকে আর নাচতে ডাকে না। খদ্দেরের আশায় এখানে রোজ সন্ধেবেলা আসে। কিন্তু খদ্দেরও খুব একটা হয় না। শঙ্কুবাবুর সঙ্গে মার্থার জোরদার ইস্ক চলছে।'

'মার্থার ঠিকানাটা জোগাড় করেছ?'

'করেছি স্যার। এলিয়ট রোডের একটা ঠিকানা। বলল, বাড়ির নিচে বিরিয়ানির দোকান আছে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে ডানদিকের দ্বিতীয় দরজা।' বিমল ঠিকানা লেখা একটা চিরকুট আদিত্যর হাতে দিল। তারপর কুণ্ঠিতভাবে বলল, 'একটা কথা বলব স্যার?'

'বল। কী কথা?'

'নেশুড়ে পিটারকে মাল খাওয়াতে আমার ষোলোশো পঁচাত্তর টাকা খরচ হয়ে গেছে স্যার। টাকাটা কি পার্টির কাছ থেকে পাওয়া যাবে? আমি বিল করে এনেছি।'

'কেন পাওয়া যাবে না? অবশ্যই পাওয়া যাবে। দাঁড়াও আজই টাকাটা নিয়ে যাও। আর বিলটা দিয়ে যাও।'

'একটা সমস্যা আছে স্যার। বিল হয়েছিল সাড়ে ষোলোশো, সেটাই বিলে লেখা আছে। তার ওপর পঁচিশ টাকা বকশিস দিতে হল স্যার। ওটা কোথাও লেখা নেই।'

'ওসব নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি পুরো ষোলোশো পঁচাত্তরই নাও। আমি হিসেব দেবার সময় মক্কেলকে বুঝিয়ে বলে দেব।'

'আপনি স্যার দেবতা। আমার ওপর আর কী হুকুম আছে স্যার?'

'আপাতত কিছু নেই। তবে শিগগিরই তোমার দরকার পড়বে। তোমাকে তখন ফোন করব। এখন তুমি ট্রেন ধরার জন্য দৌড়োও।'

টাকাগুলো ভেতরের পকেটে পুরে নিয়ে বিমল উঠে দাঁড়াল।

(৩)

আদিত্যর একটু নার্ভাস লাগছিল। বিমল চলে যাবার পর সে ঠিক করল আজই শঙ্খদীপ চৌধুরির সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলবে। এইটুকু কাজ করার জন্য নার্ভাস লাগার কথা নয়, কিন্তু এলিয়ট রোডে মার্থা নামক রমণীর ডেরায় যেতে হবে ভেবে তার সব উৎসাহ নিবে যাচ্ছিল। সে ভেবে দেখল, এই সব মহিলার কাছে দুপুর-দুপুর যাওয়াটাই ভালো। সন্ধের আগেই যাতে ওই সব পাড়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।

কলেজ স্ট্রিট থেকে ট্রামে এসপ্ল্যানেড। এসপ্ল্যানেডের গুমটিতে নেমে আদিত্য দেখল ট্রাম কম্পানির ঘড়িতে একটা বেজে গেছে। কয়েকদিন আগেও বেশ ঠান্ডা ছিল। এখন একটু একটু করে গরম পড়তে শুরু করেছে। আদিত্য কিছুক্ষণ এলিয়ট রোড-গামী ট্রামের খোঁজে এদিক-ওদিক করল, তারপর হতাশ হয়ে ঠিক করল এটুকু পথ হেঁটেই মেরে দেবে।

রাস্তার ওপারে জনস্রোত। গ্র্যান্ড হোটেলের নীচে ফুটপাথের দোকানগুলোতে এখনও গরম জামার পসরা সাজানো রয়েছে। সোয়েটার, কোট, আলোয়ান, মেয়েদের গরম চাদর, এমনকি কয়েক জোড়া দস্তানাও চোখে পড়ল। লোকে তাই ভিড় করে কিনছে। এখন কেন কিনছে কে জানে? শীত তো শেষ হয়ে এল। হয়ত পরের বছর পরবে বলে কিনে রাখছে। কিংবা হয়ত এরা মফস্বল থেকে এসেছে, সেখানে শীত এখনও চলে যায়নি। এইসব আবোলতাবোল ভাবতে ভাবতে ভিড় ঠেলে লিন্ডসে স্ট্রিটের মোড় অব্দি এগিয়েছে এমন সময় পিঠে একটা স্পর্শ পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল আদিত্য। এক ঝলক তাকিয়েই চমকে উঠল, 'আরে, আরে, স্যমন্তক যে। কতদিন পরে।'

স্যমন্তক রুদ্র আদিত্যর সঙ্গে ইস্কুলে পড়ত। বেশ বন্ধু ছিল, ক্লাস এইট অব্দি দু'জন পাশাপাশি বসত। তারপর আদিত্য সায়েন্স আর স্যমন্তক কমার্স নেওয়ায় সেকশন আলাদা হয়ে গেল।

'তোকে কতক্ষণ থেকে ডাকছি। শুনতেই পাস না। আমাকে পেরিয়ে চলে গেলি।'

'যা ভিড় আর হট্টগোল, শুনব কী করে?'

তারা দুজন রাস্তার একপাশে এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু চলমান ভিড়ের ঠেলায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব।

'চল কোথাও গিয়ে বসি। এখানে দাঁড়ানো যাবে না।' স্যমন্তক বলল।

তারা দু'জন লিন্ডসে স্ট্রিট ধরে কিছু দূর হেঁটে গ্লোব সিনেমার পাশের গলিটায় বাঁক নিল। ওখানে একটা পাঞ্জাবি ধাবা আছে। ভেবেছিল বসা যাবে। গিয়ে দেখে সেখানে মধ্যাহ্ন ভোজনের ভিড়। ভেতরটা ভর্তি। কিছু লোক বাইরের বেঞ্চিতে বসেও দুপুরের খাওয়া সারছে। আরও খানিকটা এগিয়ে একটা চায়ের দোকান চোখে পড়ল। ফাঁকাই রয়েছে। এখানে মনে হয় কিছুক্ষণ বসতে দেবে।

'কতদিন পরে দেখা। বছর পঁচিশ হবে বোধহয়। কী করিস আজকাল?' স্যমন্তক চায়ের কাপে চুমুক লাগিয়ে বলল।

আদিত্য সরাসরি উত্তর দিল না। বলল, 'তোর কথা আগে বল। তুই তো শুনি এখন ফুল টাইম নাটকের লোক। মাঝে মাঝে সিরিয়ালেও নাকি তোকে দেখা যায়। আমার অবশ্য নাটকও দেখা হয় না টিভিও দেখা হয় না। লোকের মুখেই তোর কথা শুনি।'

স্যমন্তক সিগারেট বার করল। আদিত্যকে একটা দিয়ে নিজেরটা এবং আদিত্যরটা ধরাল। তারপর একটা সুখটান দিয়ে বলল,

'আমি তো স্কুল ছাড়ার পরে সেন্ট জেভিয়ার্সে কমার্স পড়লাম। তারপর বাবার ইচ্ছে অনুযায়ী চাটার্ড পড়তে শুরু করলাম। আর্টিকল ক্লার্ক হয়ে বিবাদী বাগের একটা আপিসে ঢুকলাম। চাটার্ডের কয়েকটা গ্রুপ পাশও করে গেলাম। পাশাপাশি অবশ্য তখন পুরোদমে নাটক চলছে। বাবার খুব ইচ্ছে তাড়াতাড়ি চাটার্ড পাশ করে সংসারের হাল ধরি। আমার ইচ্ছে সব ছেড়ে দিয়ে ফুল টাইম নাটকে চলে যাই। একটা সময় মনে হল এবার ডিসিশন একটা নিতেই হবে। কী করব? দশটা পাঁচটা আপিস, নাকি গ্রুপ থিয়েটার? ঠিক করে ফেললাম নাটকই করব। জীবন একটা বই দুটো তো নয়। নাটক ছেড়ে দিলে পরে আফশোস করতে হবে। বাবাকে বললাম। বাবা দুবছর আমার সঙ্গে কথা বলেনি।'

'তুই যেটা করেছিস সেটা করতে কলজের জোর লাগে। ক'জন পারে এরকম ডিসিশন নিতে?'

'হ্যাঁ, মানছি ফুল টাইম নাটক করতে সাহস লাগে। তবে কী জানিস, ইকনমিক স্টেবিলিটি বলতে যেটা বোঝায় সেটা এখনও এল না। অথচ আজকাল আমাদের নাটক মোটের ওপর মন্দ চলে না। কিন্তু এটা চলছে বলেই যে পরেরটা চলবে তার তো কোনও স্থিরতা নেই। তাই মাঝে মাঝে সিরিয়ালও করতে হয়। সেটা একেবারে উঞ্ছবৃত্তি। কী করব? গত বছর বিয়ে করেছি। একটা দায়িত্ব তো আছে। আমার বউ অবশ্য আমাদের দলেরই মেয়ে। খুব সাপোর্টিভ। একদিন বাড়িতে আয় না।'

'আবশ্যই যাব। তোর মোবাইল নম্বরটা দে।'

'তোর নম্বরটা বল। আমি একটা মিসড কল দিচ্ছি। তুই সেভ করে নিস। কিন্তু আমি তো কেবল একতরফা আমার কথাই বলে গেলাম। এবার তোর কথা বল।'

দুজনে দুজনের নম্বর সেভ করার পর আদিত্য একটু বিষণ্ণ গলায় বলল,

'তোর মতো আমার জীবনেও এখনও ইকনমিক স্টেবিলিটি আসেনি। তবে একটা বড় তফাত আছে। তুই একটা ক্রিয়েটিভ কিছু করবি বলে নিজের ইচ্ছায় ইকনমিক স্টেবিলিটি স্যাক্রিফাইস করেছিস। আর আমি এখন পর্যন্ত তেমন কিছুই করে উঠতে পারলাম না। কলেজ থেকে বেরোবার আগেই বাবা মারা গেল। মা তো আমার ছোটবেলাতেই চলে গিয়েছিল। বাবা মারা যাবার পর দেখলাম চারদিকে আমাদের প্রচুর ধার। সেই ধার শোধ করতেই যেটুকু বিষয় সম্পত্তি ছিল, বিক্রি হয়ে গেল। তারপর নানা কিছু চেষ্টা করেছি। যাদুকরের সাকরেদি থেকে প্রাইমারি ইস্কুলের মাস্টারি। কোনওটাতেই মন টিকল না। তবে গত কয়েক বছর ধরে যে কাজটা করছি তার প্রতি এখন পর্যন্ত বিতৃষ্ণা জন্মায়নি। বলতে কি, মাঝেমধ্যে এই কাজটাকে বেশ ভালই লাগে। অবশ্য কাজটা কী শুনলে তুই আঁতকে উঠবি।'

'কী কাজ? পলিটিকাল নেতাগিরি?'

'আরে না, না। নেতা হবার মতো এলেম আমার নেই। আমি গত কয়েক বছর ধরে প্রাইভেট ডিটেকটিভ-এর কাজ করছি।'

'প্রাইভেট ডিটেকটিভ! বলিস কি! বেসরকারি গোয়েন্দা! তুই আমার সঙ্গে ইয়ার্কি মারছিস? ওরকম তো গল্পে হয়। বাস্তবে হয় নাকি?' বিস্ময়ে স্যমন্তকের চোয়াল ঝুলে পড়েছে।

'হয়, হয়। তোর বিশ্বাস না হলে বউবাজারে আমার আপিসে চলে আয় একদিন।'

স্যমন্তক খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। বোধহয় খবরটা হজম করতে সময় লাগছে। তারপর গলা নামিয়ে বলল,

'তোর কাজটা কী রে? কালো ওভারকোট পরে, চোখে কালো চশমা এঁটে, কালো পিস্তল হাতে আততায়ীর পেছন পেছন ছোটা?'

'না, না সেরকম কিছু নয়। বেশিরভাগই রুটিন কাজ। খবর জোগাড় করে দেওয়া, তথ্য জোগাড় করে দেওয়া। কিন্তু মাঝেমধ্যে দু'একটা কাজ এসেছে যেগুলো করতে বেশ বুদ্ধি লাগে, ইম্যাজিনেশন লাগে। এই তো গত বছর একটা স্মাগলারদের দলকে ধরে একই সঙ্গে আত্মতৃপ্তি এবং পুলিশের কাছ থেকে পাঁচ লাখ টাকার একটা অ্যাওয়ার্ড দুটোই পেলাম। সেই কেসটা সলভ করে পুলিশ মহলে আমার বেশ খাতির বেড়েছে। তবে পিস্তল-টিস্তল রাখি না, এখন অব্দি তার দরকারও পড়েনি।'

'তুই আমার বড়িতে কবে আসবি বল? সামনের রোববার আয়। সকালে চলে আয়, দুপুরের খাওয়া, বিকেলের চা-টা খেয়ে একেবারে সন্ধেবেলা বাড়ি যাবি। বউকে বলব, দ্যাখো, একজন জ্বলজ্যান্ত গোয়েন্দা আমার বন্ধু। আসছিস তো রোববার?'

'ঠিক আছে যাব। তবে যেতে যেতে সাড়ে বারোটা-একটা হয়ে যাবে। সকালে একটা কাজ সেরে যেতে হবে।'

'তাই আয়, তাই আয়।' স্যমন্তক উঠতে যাচ্ছিল। তাকে বসতে বলে আদিত্য আরও দু'কাপ চায়ের অর্ডার দিল। চা আসার পর চায়ে চুমুক দিয়ে আদিত্য বলল, 'শোন, আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে। নীলাঞ্জন মৈত্র বলে তুই কাউকে চিনিস? গ্রুপ থিয়েটারেরই লোক।'

'চিনি বইকি। অনেক দিন ধরেই চিনি। তবে ইদানীং আর দেখা হয় না। ওদের প্রান্তিক বলে একটা পুরোনো দল ছিল। এক সময় ওরা নিয়মিত নাটক নামাত। বছরে একটা নতুন প্রোডাকশান তো বটেই, কখনো কখনো দু'টো। সেসব পনেরো-কুড়ি বছর আগেকার কথা। এখন কালেভদ্রে প্রান্তিক-এর শো হয়। আসলে নীলাঞ্জনদার দলে মূল আকর্ষণ ছিল মন্দাকিনী মৈত্র, নীলাঞ্জনদার স্ত্রী। মন্দাকিনী নীলাঞ্জনদাকে ছেড়ে দিয়ে এক বড়লোক ব্যবসাদারকে বিয়ে করার পর প্রান্তিক দলটা একটা বিরাট ধাক্কা খেল। আর বিয়ে ভেঙে যাবার পরে নীলাঞ্জনদাও একেবারে শেষ হয়ে গেল। কারও সঙ্গে মেশে না, ভাল করে কথা পর্যন্ত বলে না। ওদের দলের পুরোনো দু'একটা ছেলেমেয়ে কোনও রকমে জোড়াতালি দিয়ে দলটাকে এখনও টিকিয়ে রেখেছে। তা তুই হঠাৎ এত লোক থাকতে নীলাঞ্জন মৈত্রর ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড হয়ে পড়লি কেন?'

'কেন হলাম বলছি। তার আগে তুই বল নীলাঞ্জন মৈত্রের থিয়েটার প্রতিভা কেমন ছিল?'

'দ্যাখ, নীলাঞ্জন মৈত্র মোটেই জনপ্রিয় হতে পারেনি। অনেকেই বলে নীলাঞ্জনদা ওয়াজ বর্ন অ্যাহেড অফ হিস টাইম। অর্থাৎ যে এক্সপেরিমেন্টগুলো নীলাঞ্জনদা করত তার জন্য দর্শকদের মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। আমি অতটা বলব না। আনসাকসেসফুলদের অকারণে গ্লোরিফাই করার একটা স্বভাব বাঙালির আছে। আরে বাবা, অসফল হলেই তো কেউ মহৎ শিল্পী হয়ে যায় না। সকলেই তো আর ভ্যান গগ নয়। তবে নীলাঞ্জনদার যে কিছু ট্যালেন্ট ছিল সেটা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু কিছুতেই দর্শকদের সঙ্গে কমিউনিকেট করতে পারত না। পারহ্যাপস হি ওয়াজ আ বিট টু থিওরেটিকাল। এবং ভয়ঙ্কর পলিটিসাইজড। উগ্র বাম রাজনৈতিক বিশ্বাসই ওকে শেষ করে দিল। তার থেকে আর বেরোতে পারল না।'

'নীলাঞ্জন মৈত্র এখন কী করে জানিস?'

'খুব ভাল জানি না। শুনেছি গ্রামের দিকে একটা ইস্কুল চালায় আর মাঝেসাঝে একটা-দুটো শো করে। তবে নতুন নাটক অনেকদিন নামায়নি।'

'তুই আমাকে নীলাঞ্জন মৈত্রর সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিতে পারিস?'

'হয়তো খুব চেষ্টা করলে পারি। কিন্তু তার আগে তোকে বলতে হবে কেন নীলাঞ্জন মৈত্রর সঙ্গে দেখা করতে চাস।'

'ঠিক আছে বলছি, তবে কথাটা কাউকে বলা চলবে না। তোর স্ত্রীকেও নয়। শোন, নীলাঞ্জন মৈত্রর প্রাক্তন স্ত্রী মন্দাকিনীকে সম্ভবত কেউ খুন করার চেষ্টা করছে।'

'খুন?' স্যমন্তকের মুখ শুকিয়ে গেছে।

'হ্যাঁ, খুন। কয়েকবার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু কপাল জোরে মন্দাকিনী বেঁচে গেছেন। আবার চেষ্টা হতে পারে। সমস্ত সম্ভবনাগুলো খতিয়ে দেখার জন্য আমাকে ওরা নিয়োগ করেছে।'

'তুই কি নীলাঞ্জন মৈত্রকে সন্দেহ করছিস নাকি?'

'না না। এখন পর্যন্ত কাউকেই সন্দেহ করছি না, আবার কাউকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদও দিচ্ছি না। আগে সবার সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

'আমি তোকে যথাসম্ভব সাহায্য করব, কথা দিচ্ছি।'

'আর দেখিস এই ব্যাপারটা যেন পাঁচকান না হয়।'

'হবে না। তুই নিশ্চিন্ত থাক।'

(৪)

এলিয়ট রোডের বাড়িটা খুঁজে পেতে পেতে প্রায় তিনটে বেজে গেল। বাড়িটা প্রাচীন ও নড়বড়ে। যেন ভেঙে পড়তে গিয়ে নেহাতই অভ্যাসবশত কোনওক্রমে দাঁড়িয়ে আছে। একতলায় একটা বিরিয়ানির দোকান, তার পাশে বাড়িতে ঢোকার সদর দরজা। একেবারে বোতাম খোলা বাড়ি, সদর দরজাটা দেখে মনে হয় আজ অব্দি কোনও দিন বন্ধ করা হয়নি। দরজা দিয়ে ঢুকে একটা উঠোন, উঠোনে চৌবাচ্চা, বারোয়ারি কলঘর। জায়গাটা শেওলা জমে পিচ্ছিল হয়ে আছে। আদিত্য দেখল এক পাশ দিয়ে একটা নোংরা সিঁড়ি উঠে গেছে সটান চারতলা অব্দি। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে লম্বা বারান্দা, বারান্দা সংলগ্ন সার সার দরজা। একটা দরজার সামনে দুটো চুড়িদার পরা কৃষ্ণাঙ্গ মেয়ে মুখে রং মেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। তাদের রূপ নিয়ে যত কম বলা যায় ততই ভাল। আদিত্য সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই তারা কথা থামিয়ে আদিত্যর দিকে ব্যগ্রভাবে তাকাল। মার্থার ঘর কোনটা জিজ্ঞেস করতে দৃশ্যতই হতাশ দেখাল তাদের। তারপর নেহাতই দায়সারাভাবে একটা দরজা দেখিয়ে দিয়ে তারা আবার নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগল। দেখিয়ে দেওয়া দরজাটায় গিয়ে টোকা মারল আদিত্য।

কয়েকবার টোকা দেবার পর দরজা খুলে গেল। স্বল্প রাত্রিবাস পরিহিতা ফ্যাকাশে বর্ণের যে ফিরিঙ্গি মেয়েটি দরজা খুলল তাকে অনায়াসে বিগত যৌবনা বলা চলে। মনে হয় সে এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিল, হলদে রঙ করা চুল আলুথালু, প্রসাধনহীন মুখে মেছেতা পড়েছে। আদিত্যকে দেখে সে কান এঁটো করে হাসল। আদিত্য লক্ষ করল ফিরিঙ্গিনির দাঁতগুলো ঝকঝকে, দাঁতের গঠনটাও মন্দ নয়। হয়ত চেহারাও তার একসময় ভালই ছিল, এখন ব্যবহারে ব্যবহারে দীর্ণ হয়ে গেছে। আদিত্য আন্দাজ করে নিল এই মার্থা।

'আইয়ে, অন্দর আইয়ে। প্লিজ কাম ইন।' মেয়েটি বলল।

আদিত্য ভেতরে ঢুকে দেখল একটা হতশ্রী ঘর, তার মাঝখান জুড়ে একটা বৃহৎ তক্তাপোষ, ইট দিয়ে উঁচু করা। নীচ থেকে বাক্স-প্যাঁটরা উঁকি মারছে। দেয়ালে ক্রুশবিদ্ধ যিশু। ঘরের এক ধারে স্টোভ, তাতে কিছুক্ষণ আগে রান্না করা একটা ভাতের হাঁড়ি বসানো। অন্য দিকে দড়িতে কাপড়-জামা টাঙানো রয়েছে, পেন্টুলুন, টি-শার্ট, মেয়েদের স্কার্ট-টপ, পুরুষ ও নারীর ময়লা অন্তর্বাস, ভিজে গামছা। ঘরের ভেতরে একটা পার্টিশান আছে, পার্টিশানের ওদিকটা দেখা যায় না। বিছানার পাশে একটা ফাঁকা চেয়ার ছিল, আদিত্য তার ওপর বসল।

'ফাইভ হানড্রেড পার ট্রিপ।' ফিরিঙ্গিনি সহজ গলায় বলল।

'আই উইল গিভ ইউ ফাইভ হানড্রেড অ্যান্ড আ বিট মোর, বাট আই অ্যাম নট ইন্টারেস্টেড ইন এনি ট্রিপ।' আদিত্য দৃঢ় গলায় বলল। 'তোমার ঘরে শঙ্কুবাবু থাকে। আমি তার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

'কে শঙ্কুবাবু? এখানে ওরকম কেউ থাকে না।' মার্থার গলায় সন্দেহ। তার বাংলায় বেশ টান আছে।

আদিত্য এবার কড়া গলায় বলল, 'দ্যাখো, নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই। ইউ ডিসাইড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু আর্ন সাম কুইক ডোউইদাউট মাচ সোয়েট।'

আদিত্য একটা পাঁচশো টাকার নোট বার করে মার্থার হাতে দিল। বলল, 'এটা নাও। শঙ্কুবাবুর সঙ্গে কথা বলিয়ে দিতে পারলে আরও পনেরোশো পাবে।' আদিত্য বুক পকেট থেকে আরও তিনটে পাঁচশো-র নোট বার করে মার্থাকে দেখাল। তারপর নোটগুলো পকেটেই ঢুকিয়ে রাখল আবার।

ফিরিঙ্গিনির মুখ দেখে মনে হল এত টাকা দেখে সে লোভে পড়ে গেছে। মনে হয় তার টাকার টানাটানি চলছে। সে বলল,

'তুমি কোথা থেকে আসছ? মাইকেল পাঠিয়েছে?'

'না। মাইকেল-টাইকেল কেউ আমাকে পাঠায়নি। আমি নিজের কাজে এসেছি। শঙ্কুবাবুর বাবা সুবীর চৌধুরিকে নিয়ে আমি একটা বই লিখছি। তাই শঙ্কুবাবুর সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

আদিত্য টের পায়নি একজন কোল-কুঁজো লম্বা লোক কখন পার্টিশনের ওদিক থেকে এসে আদিত্যর পাশে দাঁড়িয়েছে। তার ফরসা রং বহু অত্যাচারে তামাটে হয়ে গেছে। তীক্ষ্ন নাক, পাতলা ঠোঁট, চওড়া কপাল দেখে মনে হয় এক সময় সে রীতিমতো সুপুরুষ ছিল। এখন অবশ্য তার চোখের নীচে গভীর কালি। ভুরুর ওপরে একটা বিশ্রী ক্ষত এখনও পুরো শুকোয়নি। ডান হাতটাও বোধহয় জখম, কারণ সেটা স্লিং দিয়ে গলার সঙ্গে ঝোলানো। লোকটা মার্থার দিকে তাকিয়ে রুক্ষ গলায় বলল, 'হু ইজ দিস বাগার? এ এখানে কী করছে?'

'হি ইস রাইটিং আ বুক অন ইয়োর ফাদার। ওয়ান্টস টু টক টুইউ। হি ইজ উইলিং টু পে গুড মানি ফর ইয়োর টাইম।' মার্থা খুব শান্তভাবে বলল।

'আমি ওর সঙ্গে কথা বলব কে বলেছে? আই ওয়ান্ট হিম আউট অফ দিস রুম ইমিডিয়েটলি।' লোকটা ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে উঠছে। গলাটা আরও একটু তুলে সে বলল, 'আউট।' তারপর আদিত্যর একেবারে গায়ের ওপর এসে বাঁ হাতে আদিত্যর কলারটা চেপে ধরে আওয়াজটা একেবারে সপ্তম পর্দায় চড়িয়ে আবার বলল, 'গেট আউট।'

আদিত্য একইভাবে স্থির হয়ে বসে আছে।

'বিহেভ ইয়োরসেলফ শ্যাঙ্কি।' মার্থা এবার চাপা গলায় শাসানোর ভঙ্গীতে বলল।

উত্তরে শ্যাঙ্কি অর্থাৎ শঙ্খদীপের একটা বিস্ফোরণ হল। সে চিৎকার করে উঠল,

'ইউ ব্লাডি হোর, ইউ ওয়ান্ট টু সেল মি অফ ফর টু থাউজেন্ট বাকস। আমি জানি তোদের মতো মেয়েদের কী করে শায়েস্তা করতে হয়।'

এবার যা ঘটল তার জন্য আদিত্য তৈরি ছিল না। ক্ষিপ্র গতিতে শঙ্খদীপের সামনে এসে দাঁড়াল মার্থা। তারপর তার জখম হাতটাকে নিজের দু'হাতে সর্ব শক্তি দিয়ে মোচড়াতে লাগল। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল শঙ্খদীপ। ধপ করে তক্তপোশে বসে পড়ল। এবার মার্থা এগিয়ে এসে তার দুটো গালে দুটো বিরাশি সিক্কার চড় কষিয়ে দিল।

শঙ্খদীপ চৌধুরি বাঁ-হাতে চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মার্থা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে। মিনিট তিন-চার এইভাবে চলল। তারপরের নাটক মিলনান্ত। মার্থা শঙ্খদীপের ক্রন্দনরত মুখটা দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে বলছে, 'ডোন্ট ক্রাই বেবি, ডোন্ট ক্রাই মাই ডার্লিং। এভরিথিং উইল বি ওকে।'

কতক্ষণ এভাবে চলবে কে জানে, এ-নাটক আদিত্যর আর সহ্য হচ্ছে না। সে অসহায়ভাবে চুপ করে বসে আছে। সৌভাগ্যবশত এক সময় শঙ্খদীপের কান্না থামল। তার জখম হওয়া হাতে কী একটা তীব্রগন্ধী

মলম লাগাতে লাগাতে মার্থা আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলল, 'টক টু হিম নাউ। হি ইজ অল ইয়োরস।'

শঙ্খদীপ তক্তপোশের ওপর বসে চোখ পিটপিট করছে। আদিত্য তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি আপনাকে সামান্য দুএকটা প্রশ্ন করব। তার আগে একটু বলে নিই, আমি একজন সাংবাদিক। ফ্রিলান্স করি। এটা আমার কার্ড।'

আদিত্য শঙ্খদীপের দিকে একটা ভিজিটিং কার্ড এগিয়ে দিল। কার্ডটাতে একবার চোখ বুলিয়ে নিজের পকেটে রেখে দিল শঙ্খদীপ। আদিত্য আবার বলতে শুরু করল, 'চৌধুরি এন্টারপ্রাইজেস-এর মন্দাকিনী চৌধুরি আমাকে তাঁর স্বামী সুবীর চৌধুরির ওপর একটা বই লিখতে বলেছেন। আমি বিভিন্ন পারসপেক্টিভ থেকে সুবীর চৌধুরিকে বোঝবার চেষ্টা করছি। আপনার পারসপেক্টিভটাও আমার বই লেখার জন্য খুব জরুরি। আমি জানি আপনার সঙ্গে আপনার বাবার সম্পর্ক ভাল ছিল না। তবু ব্যাপারটা আপনার নিজের মুখ থেকে শুনতে চাই। আপনার কথাগুলো টেপ করলে আপত্তি নেই তো?'

শঙ্খদীপ চৌধুরি উত্তর দিচ্ছে না। শুধু চুপ করে বসে আছে আর মাঝে মাঝে চোখ পিটপিট করছে। হয়তো চোখ পিটপিট করাটা তার মুদ্রাদোষ, কিংবা কোনও নার্ভের অসুখ। তার মৌনতাকে সম্মতির লক্ষ্মণ ধরে নিয়ে আদিত্য মোবাইলের অডিও রেকর্ডারটা চালিয়ে দিল। শঙ্খদীপ এখনও কথা বলছে না। মার্থা একটু দূরে বসে সিগারেট ধরিয়েছে। এমনি করে কয়েক মিনিট কাটল। আদিত্য রেকর্ডারটা বন্ধ করে দেবে কিনা ভাবছে এমন সময় শঙ্খদীপ খুব নিচু গলায় বলতে শুরু করল, 'দেখতেই তো পারছ আমি একেবারে শেষ হয়ে গেছি। একটা মানুষের পক্ষে যতটা নীচে নামা সম্ভব আমি ততটাই নেমেছি। আমার পক্ষে আর ভদ্র সমাজে ফিরে যাওয়ার কোনও রাস্তা নেই। আমার এই অবস্থার জন্য দায়ী কে জানো? আমার বাবা। দ্য গ্রেট এন্টারপ্রেনিয়র সুবীর চৌধুরি। আমার মা যখন মারা যান আমার বছর পনেরো-ষোলো বয়েস। মাকে আমি পাগলের মতো ভালবাসতাম। মার মৃত্যুটাই আমার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। পনেরো বছর বয়েস অব্দি আমি যে-কোনও সাধারণ ছেলের মতো বড় হচ্ছিলাম। খেলাধুলো করতাম, লেখাপড়াতেও খুব খারাপ ছিলাম না। মা হয়তো আমাকে একটু বেশিই আদর দিত। সামনে আইসিএসসি পরীক্ষা, তখন মা চলে গেল। আমার পক্ষে সে-বছর পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব ছিল না। পরীক্ষা দিলাম না। সে বছর না, পরের বছরেও না। স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। কুসংসর্গে পড়লাম। কোনও দিনই আর আইসিএসসি পরীক্ষাটা দেওয়া হল না। নানারকমের নেশা ধরলাম, জুয়া ধরলাম। যাই হোক, আমার নরকে নেমে যাবার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে লাভ নেই। এক কথায় যেটা বলা যায় সেটা হল, মা চলে যাবার পরে আমার বাবা যদি আমাকে একটু সময় দিত তাহলে আমার জীবনটা বেঁচে যেত। বাবা তখন দেশ-বিদেশে ব্যবসা বাড়ানোর কাজে ব্যস্ত। দিনের পর দিন বাড়িতে থাকে না। যখন থাকে তখনও বাবার দেখা পাই না। পনেরো বছর বয়েসটা খুব সংবেদনশীল একটা বয়েস, এটা মানবে তো?'

শঙ্খদীপ কিছুক্ষণের জন্য থামল। তাকে সিগারেট দিয়ে নিজে একটা ধরাল আদিত্য। সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়ে শঙ্খদীপ আবার বলতে শুরু করল, 'আমার নরকে নেমে যাওয়াটা আসলে বাবার প্রতি আমার প্রতিহিংসা। বাবা যত আমাকে উপেক্ষা করেছে আমি তত ইচ্ছে করে খারাপ হয়ে গেছি। যাতে সুবীর চৌধুরির গায়ে কলঙ্ক লাগে। যাতে পাঁচটা লোক চেঁচিয়ে বলে, ছি ছি সুবীর চৌধুরি, তোমার একমাত্র ছেলে এইভাবে গোল্লায় যাচ্ছে আর তুমি শুধু টাকা করে বেড়াচ্ছ। এখন বুঝতে পারি ভুল করেছি। আমি ক্রমশ অধঃপাতে গেলেও সুবীর চৌধুরির কোনও দিন কিছু এসে যায়নি, শুধু মাঝখান থেকে আমি নিজেই নিজের ক্ষতি করে গেছি।'

'আর আপনার বাবার দ্বিতীয় বিয়ে? সেটার বিষয়ে আপনি কী বলবেন?'

'দ্যাট ওয়াজ দ্য ফাইনাল নেল ইন মাই কফিন। ওই বয়সে বাবা আবার বিয়ে করতে পারে আমরা কল্পনাই করতে পারিনি। আমরা মানে আমি আর আমার বোন মালা। মালা বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে বেঁচে গেল। আমি আর বাঁচতে পারলাম না।'

'মন্দাকিনী চৌধুরির সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল?'

'খুব খারাপ। যতটা খারাপ হতে পারে। মন্দাকিনী ওয়াজ আ বিচ। শি ওয়াজ ওনলি আফটার মাই ফাদারস মানি। আর আমার বাপটাও তো ঢ্যামনা, তাই শালা দ্বিতীয় বউ-এর কথায় উঠত বসত।'

আরও কিছু বলতে গিয়ে শঙ্খদীপ নিজেকে সামলে নিল। হয়তো আরও খারাপ কথা তার মুখে এসে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে থেমে থেমে বলল, 'এত সুন্দর শরীরের আড়ালে এত কুৎসিত মন আমি মন্দাকিনীর মতো আর দুটো দেখিনি। অথচ দ্যাখো, ওই যে মার্থা বসে আছে, সমাজে ওর জায়গা খুব উঁচুতে নয়, কিন্তু ওর হৃদয়টা সোনা দিয়ে মোড়া। তথাকথিত ভদ্র সমাজে এরকম বড় মন দেখতে পাবে না।'

আলোচনাটা শরৎচন্দ্রের লাইনে চলে যাচ্ছে দেখে আদিত্য তাড়াতাড়ি বলল, 'আমি যতদূর জানি চৌধুরি এন্টারপ্রাইজ থেকে আপনি এক পয়সাও পান না। এ-ব্যাপারে আপনি কখনও আইনি সাহায্য নেবার কথা ভেবেছেন? চৌধুরি এন্টারপ্রাইজ তো একা সুবীর চৌধুরির চেষ্টায় তৈরি হয়নি, এর পেছনে চৌধুরিদের অনেক পুরুষের পরিশ্রম আছে। আপনার পূর্বপুরুষদের অর্জিত টাকায় আপনার কিছু অধিকার থাকাটাই তো স্বাভাবিক।'

কথাটা শুনে শঙ্খদীপ চৌধুরি একটু চমকে উঠল। খানিকক্ষণ ভেবে বলল, 'তোমাকে ধন্যবাদ। এভাবে আমাকে কেউ ভাবতে বলেনি। কিন্তু মামলা করার মতো দম আমার আর নেই। টাকাপয়সার জোরও নেই।'

শঙ্খদীপ চৌধুরি আবার খানিকক্ষণ থামল। তারপর বিড়বিড় করে বলল,

'আমি জীবনের যুদ্ধে একেবারে হেরে গেছি। শিরদাঁড়াটাও ভেঙে গেছে। আর উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। আসলে চৌধুরি পরিবারের সেই পুরোনো অভিশাপটা এখন আমার ওপর এসে পড়েছে। যেমন দ্বিতীয়বার বিয়ে করার পর সুবীর চৌধুরির ওপর পড়েছিল। দ্যাট বিচ হারসেলফ কেম অ্যাজ আ কার্স।'

'পুরোনো অভিশাপ? আপনি কোন অভিশাপের কথা বলছেন?' আদিত্য উদগ্রীব হয়ে বলল।

'কিছু না। কিছু বলিনি। নিজের মনে বিড়বিড় করছিলাম।' শঙ্খদীপ আবার নিজের খোলসের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। 'শোনো, আমার নেশার সময় হয়ে গেছে। আর আমার কথা বলতে ভাল লাগছে না। তুমি এখন যেতে পার। আই থিঙ্ক আই হ্যাভ টকড এনাফ টু আর্ন মাই মানি। নমস্কার।'

আদিত্য ভেবে দেখল এক দিনের আন্দাজে অনেক কাজ হয়েছে। মানসিক ধকলও কিছু কম হয়নি। সে রেকর্ডার বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। তারপর মার্থার হাতে বাকি তিনটে পাঁচশো টাকার নোট তুলে দিয়ে দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে দেখল, নানা রঙের ও আকারের অপেক্ষমাণ বারবধূরা ইতিমধ্যে বারান্দাটা ভরিয়ে ফেলেছে।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(১)

পরের দিন একটু সকালের দিকে আদিত্য সোহিনী মৈত্রকে ফোন করল।

'বলুন আদিত্যবাবু' সোহিনীর গলায় হালকা উৎকণ্ঠা, 'ক'দিন ধরেই মনে হচ্ছিল আপনার কাছ থেকে এবার একটা ফোন আসবে। কোনও খবর আছে?'

'তেমন খবর এখনও কিছু নেই। শুধু জানিয়ে রাখি, শঙ্খমালা এবং শঙ্খদীপ দুজনের সঙ্গেই কথা হয়েছে। এবার মন্দাকিনী চৌধুরির সঙ্গে কথা বলা দরকার। সেইজন্য আপনাকে ফোন করলাম। একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দিতে হবে।'

'এখখুনি তো হবে না। মা দুদিন আগে বিদেশ গেছে। ব্যবসার কাজে অনেকগুলো দেশ ঘুরবে। ঠিক কবে ফিরবে আমিও জানি না। একবার যেন বলেছিল কুড়ি-পঁচিশ দিন বাদে ফিরবে। তবে আমি নিশ্চিত নই। ফিরলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেব।'

'ঠিক আছে। উনি ফিরলেই না হয় ওঁর সঙ্গে দেখা করব। কিন্তু চৌধুরি প্যালেসের পুরোনো কর্মচারী, মন্দাকিনী চৌধুরির ড্রাইভার, সুবীর চৌধুরি যে ল ফার্মকে দিয়ে উইল করিয়েছিলেন, এদের সবার সঙ্গেই কথা বলা দরকার। আপনি কি তার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?'

'ড্রাইভার এবং কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলিয়ে দিতে পারি। কিন্তু তাদের আপনি কী বলবেন? সুবীর চৌধুরির ওপর বই লিখছেন?'

'তাই বলব। খুব বেশি লোকের সঙ্গে কথা বলার দরকার নেই। মন্দাকিনীর ড্রাইভার শৈলেনবাবু, দীননাথ যোশি আর ধরুন এই পুরোনো ম্যানেজার গোছের যদি কেউ থাকেন, যিনি অনেক দিন ধরে সুবীর চৌধুরিকে কাছ থেকে দেখেছেন।'

'দীননাথ যোশি তো এখানে থাকে না। যতদূর জানি চা-বাগানের কোয়ার্টারে থাকে। আমিই তাকে কখনও দেখিনি। তার সঙ্গে দেখা করানো শক্ত। আর মা বিদেশ গেছেবলে শৈলেনবাবু খুব সম্ভবত ছুটি নিয়েছেন। তবু আমি চেষ্টা করছি। আর পুরোনো ম্যানেজার বলতে আছেন শিশির চ্যাটার্জি। তিনি বৃদ্ধ মানুষ, চৌধুরি এন্টারপ্রাইজ থেকে রিটায়ার করে এখন চৌধুরি প্যালেসের দায়িত্বে আছেন। তার সঙ্গে কথা বললে আপনার অনেকটা কাজ হয়ে যাবে।'

'আর সুবীর চৌধুরির ল ফার্ম?'

'ওই ব্যাপারটা আমি ঠিক জানি না। ওটার জন্য মা ফিরে আসা অব্দি আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। অন্য দুজনের সঙ্গে যাতে আজই কথা বলা যায় আমি তার জন্য চেষ্টা করছি।'

বেলা বারোটা নাগাদ বেহালাগামী মিনিবাসটা বাঁক নেবার আগে আদিত্যকে একটা তেমাথায় নামিয়ে দিল যার একটা মুখ আলিপুর পার্ক রোড। সোহিনী বলে দিয়েছিল ওই রাস্তাটা ধরে খানিকটা হাঁটলেই বাঁ-হাতে চৌধুরি প্যালেস পড়বে। গেটের দরোয়ানের কাছে আদিত্যর নাম দেওয়া আছে। আদিত্য গিয়ে নিজের নাম বললে দরোয়ানই দেখিয়ে দেবে কোথায় যেতে হবে। অঞ্চলটা আদিত্যর পুরোনো পাড়া। অবস্থা পড়ে যাবার আগে তারা তেমাথার অন্য মুখ, বর্ধমান রোডে থাকত। এখন অবশ্য তাদের সেই পুরোনো বাড়িটা ভেঙে হাইরাইজ উঠেছে। এদিকটা আদিত্যর অনেকদিন আসা হয়নি। সে খেয়াল করল অঞ্চলটা অনেকটাই বদলে গেছে। নতুন নতুন হাইরাইজ হয়েছে, কিছু নতুন দোকানপাটও হয়েছে, জনবসতি নিঃসন্দেহে অনেক বেড়েছে। তেমাথায় নেমে আদিত্য রাস্তার একটা দোকানে দাঁড়িয়ে চা খেল। সিগারেট খেল। চারদিকটা তারিয়ে তারিয়ে দেখল। অনেক পুরোনো কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ওই সামনের রাস্তাটা দিয়ে সে ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরত। তখনও তেমাথার কোনায় ওই ছোট্ট মনিহারি দোকানটা ছিল। ক্রিকেট তারকাদের ছবিওলা

স্টিকার পাওয়া যেত সেখানে। এক একটা চুয়িং গামের প্যাকেটের ভেতরে থাকত এক একটা স্টিকার। কিন্তু সেসব কেনা আদিত্যর বারণ ছিল। তার জন্য নিউ মার্কেটের বড় দোকান থেকে ফলের গন্ধ মেশানো অ্যামেরিকান বাবল গাম আসত। কিন্তু তার ভেতরে তো আসল জিনিস অর্থাৎ স্টিকারটাই থাকত না। সে যে কী গভীর দুঃখ আদিত্য কাউকে বোঝাতেই পারেনি। বাবাকেও না। মাঝে মাঝে দরোয়ানের সাহায্যে সে একটা-দুটো স্টিকারওলা চুয়িং গাম কিনতে পারত। অবশ্যই বাবাকে লুকিয়ে। বাবার ধারণা ছিল ওইসব জিনিস খেলে শরীর খারাপ হবে।

চৌধুরিদের গেটে পৌঁছে আদিত্য নিজের নাম বলতেই দরোয়ান দরজা খুলে দিল। ইন্টারকমে কারও সঙ্গে কী একটা কথা হল তার, সে আদিত্যকে বলল, লনের চারপাশ দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে সেটা ধরে খানিকটা এগোলেই চৌধুরিদের একতলা বারবাড়ি। সেখানে কেউ একজন আদিত্যকে রিসিভ করবে। লনটা সত্যিই মনোরম। একদিকে শীতশেষের বর্ণময় মরশুমি ফুল, ডালিয়া, জিনিয়া, বোহিনিয়া। পাশে অর্কিডদের ঘর। আর একটু হাঁটতেই আদিত্য বারবাড়িটা দেখতে পেল। এক সময় এখানে বোধহয় বাইজি-টাইজি নাচত, এখন কী হয় ভগবান জানেন। বারবাড়ির সামনে এক পক্ককেশ দীর্ঘকায় পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। আদিত্যকে দেখতে পেয়ে বৃদ্ধ এগিয়ে এলেন, নমস্কার করে বললেন, 'আমি শিশির চ্যাটার্জি, চৌধুরিদের এই প্রপার্টিটা দেখাশোনা করি। সোহিনী ম্যাডাম আপনার কথা বলেছেন। বলেছেন, আপনি চৌধুরিদের নিয়ে একটা বই লিখছেন। আমাকে কিছু প্রশ্ন করবেন। চলুন আমরা বারবাড়িতে গিয়ে বসি।'

'আচ্ছা এই বারবাড়ি ব্যাপারটা কী? কী হয় এখানে?' আদিত্য শিশির চ্যাটার্জির পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল।

'শুনেছি বহুদিন আগে এখানে নাচগান হত। সুবীর চৌধুরি নাচগানের খুব একটা ভক্ত ছিলেন না। উনি এই জায়গাটাকে নিজের আপিস হিসেবে ব্যবহার করতেন। বিবাদী বাগে অবশ্য ওঁর আসল আপিসটা ছিল। এখনও আছে। কিন্তু ব্যবসার কিছু গোপনীয় কথাবার্তা উনি এখানে বসেই সারতেন। ওঁর মৃত্যুর পর মন্দাকিনী ম্যাডামও সেইভাবেই জায়গাটা ব্যবহার করেন।'

কথা বলতে বলতে তারা বারবাড়ির ভেতর ঢুকে পড়েছিল। ঢুকেই একটা মস্ত হলঘর। গোল টেবিল। টেবিল ঘিরে অন্তত গোটা কুড়ি চেয়ার। আদিত্য লক্ষ্য করল মাথার ওপরে একটা ওভারহেড প্রোজেক্টর, তার সামনের দেয়াল জুড়ে পেল্লায় স্ক্রিন। বিজনেস প্রেসেন্টেশনের উপযুক্ত সরঞ্জাম বটে।

শিশিরবাবু আদিত্যকে নিয়ে হলঘরের লাগোয়া একটা ছোট ঘরে বসাল। বলল, 'আপনি বসুন স্যার। আমি প্রথমে ড্রাইভার শৈলেনবাবুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। চা খাবেন তো?'

শৈলেনবাবু এলেন মিনিট পাঁচেক পর। কাঁচাপাকা চুল, ছোটখাটো চেহারা। বয়েস মনে হয় ষাট পেরিয়েছে। তিনি বসতে না বসতে টি-কোজি ঢাকা টি-পটে চা এল, সঙ্গে কিছু সৌখিন বিস্কুট। উর্দিপরা বেয়ারা পট থেকে চা ঢেলে দিয়েছে। আদিত্য চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়েমোবাইলের অডিওটা অন করে বলল,

শৈলেনবাবু, আপনি এই বাড়িতে কতদিন কাজ করছেন?'

'এখানেই বড় হয়েছি সাহেব। আমার বাবা চৌধুরিদের গাড়ি চালাত। আমার লাইসেন্স হবার পর বাবাই এখানে কাজে ঢুকিয়ে দেয়।'

'আপনি তো সুবীর চৌধুরির গাড়ি চালাতেন?'

'প্রথমে কিছুদিন বড় সাহেবের বাবার গাড়িও চালিয়েছি। তাকে আমরা কত্তাবাবা বলতাম। তারপর তিনি আর বাড়ি থেকে তেমন বেরোতে পারতেন না। সেই সময় এক্রামুল বড় সাহেবের গাড়ি চালাত আর মেমসাহেবের গাড়ি চালাত আমার বাবা। এই মেমসাহেব নয়, আগের মেমসাহেব।'

'বুঝেছি, তারপর?'

'এক্রামুল গাড়ির ব্যবসা করবে বলে কাজ ছেড়ে দিল। তখন থেকে আমি বড় সাহেবের গাড়ি চালাচ্ছি।'

'সেটা কত বছর হবে?'

'ঠিক হিসেব নেই সাহেব। পঁচিশ-তিরিশ বছর তো হবেই।'

'বড় সাহেব মারা যাবার পর আপনি কার গাড়ি চালাতেন?'

'বড় সাহেব মারা যাবার পর থেকে নতুন মেমসাহেবের গাড়ি চালাচ্ছি।'

আদিত্য প্রসঙ্গ পালটাল। শৈলেন ড্রাইভারের চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার বড় সাহেব মানুষ কেমন ছিলেন?'

'খুব গম্ভীর মানুষ ছিলেন। কম কথা বলতেন। তবে খুব দয়ালুও ছিলেন।'

'দয়ালু?'

'হ্যাঁ সাহেব। আমার বিপদে-আপদে তিনি অনেক সাহায্য করেছেন। শুধু আমাকে নয়, কর্মচারীদের অনেককে। চৌধুরি বাড়ির কর্মচারীরা তাই তাঁকে দেবতার মতো ভক্তি করত। পুরোনো মেমসাহেবও খুব ভাল ছিলেন। তাঁর কাছে একবার গিয়ে কেঁদে পড়লে আর চিন্তা নেই। খুব বড় মন ছিল। হবে না? কত বড় বংশের মেয়ে।'

'আর নতুন মেমসাহেব? তিনি কেমন মানুষ?'

শৈলেন কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। মাথা নিচু করে নিরুত্তর রইল। আদিত্য বুঝতে পারল সে এ নিয়ে আর কোনও কথা বলতে চায় না। তাকে চাপাচাপি করাটা ঠিক হবে না ধরে নিয়ে আদিত্য জিজ্ঞেস করল, 'আপনার বড় সাহেবের মৃত্যুটা নিশ্চয় আপনার মনে আছে। কী ভাবে আপনার বড় সাহেব মারা যান?'

'বেশ কিছুদিন ধরে বড় সাহেব হার্টের অসুখে ভুগছিলেন। নিয়মিত ডাক্তার দেখাতেন,তবু হার্টের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছিল। শেষে মস্ত হার্ট অ্যাটাক হল। তাতেই চলে গেলেন।'

'উনি কি বাড়িতেই মারা গিয়েছিলেন নাকি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?'

'বাড়িতে একটা অ্যাটাক হয়েছিল। তখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমি নতুন মেমসাহেবকে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে পেছন পেছন গেলাম। শুনেছি, সেই রাত্তিরে আরও দু'বার বড় বড় অ্যাটাক হয়েছিল। সেগুলো আর সামলান গেল না।'

'কোন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?'

'আলিপুর চিড়িয়াখানার কাছে একটা নতুন হার্টের হাসপাতাল হয়েছে, সেখানে। নামটা ঠিক বলতে পারব না। কী যেন একটা ইংরিজি নাম। বড় সাহেব ভর্তি হবার বছর খানেক আগে হাসপাতালটা খুলেছে।'

'বুঝেছি। ক্যালকাটা ইন্সটিটিউট অফ কার্ডিওলজি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওইরকম একটা নাম। ওটাই হবে।'

'আপনার বড় সাহেবকে কোন ডাক্তার দেখেছিলেন?'

'হাসপাতালে কে দেখেছিলেন বলতে পারব না। তবে এমনিতে সাহেবকে নিয়মিত দেখতেন ডাক্তার সেনগুপ্ত, পার্ক স্ট্রিটে যাঁর চেম্বার। আমি প্রত্যেক মাসে বড় সাহেবকে সেখানে নিয়ে যেতাম।'

'ডাক্তার রণবীর সেনগুপ্ত? উনি তো খুব বড় হার্টের ডাক্তার। অনেকে বলে কলকাতার এক নম্বর।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। উনিই। নামটা ভুলে গিয়েছিলাম।'

আদিত্য কিছুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর বলল, 'আপনাকে একটা অন্য প্রশ্ন করব। একটু ভেবে উত্তর দেবেন। আপনার কি মনে হয় আপনার বড় সাহেবের কোনও শত্রু ছিল?'

প্রশ্নটা শুনে শৈলেন বেশ থতমত খেয়ে গেল। তার মুখ দেখে মনে হল সে মোটেই এই প্রশ্নটার জন্য তৈরি ছিল না। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে আদিত্য বলল, 'আপনাকে এই প্রশ্নটা করছি কারণ ড্রাইভাররা মালিকদের অনেক গোপন কথা জানতে পারে যেটা অন্য কারও পক্ষে জানা সম্ভব হয় না। ধরুন গাড়ির মধ্যে একটা ফোন এসে গেল কিংবা বিশেষ কাউকে সঙ্গে নিয়ে মালিক গাড়িতে উঠলেন এবং তাঁর সঙ্গে

গাড়িতে যেতে যেতেই অনেক দরকারি কথা সেরে ফেললেন। সেইসব ফোন থেকে বা কথাবার্তা থেকে ড্রাইভারের পক্ষে অনেক গোপন কথা জেনে ফেলা সম্ভব।'

এবার শৈলেনের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। সে দাঁতে দাঁত চেপে বলল,

'যদি আমি আমার মালিকের কোনও গোপন কথা জেনেও থাকি সেটা নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করব কেন? আমি মালিকের নুন খেয়েছি। তার সঙ্গে গদ্দারি করলে আমার নরকেও জায়গা হবে না।'

তাকে শান্ত করার জন্য আদিত্য এক গাল হেসে বলল,

'আরে আমি সেরকম কিছু জানতে চাইনি। আমি শুধু বলছিলাম যে আপনার বড় সাহেব তো খুব তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। এত তাড়াতাড়ি তাঁর যাবার কথা ছিল না। হয়তো তাঁর ভেতরে কোনও একটা অশান্তি ছিল, যে অশান্তি তাঁর হার্টের অসুখের কারণ। জানেন তো, মনের ভেতরে অশান্তি থাকলে হার্টের অসুখ হতে পারে। তাই জানতে চাইছিলাম আপনার বড় সাহেবের মনের মধ্যে তেমন কোনও অশান্তি ছিল কিনা।'

শৈলেন কিছুটা ঠান্ডা হল। শান্ত গলায় বলল, 'দেখুন, অশান্তি বলতে যদি আপনি দুশ্চিন্তা বলেন তাহলে সেটা বড় সাহেবের প্রচুর পরিমাণে ছিল। এত বড় ব্যবসা চালাচ্ছেন, দুশ্চিন্তা থাকবে না? গাড়িতে উঠেই নানা জায়গায় ফোন করতেন, ব্যবসার খবর নিতেন। কখনো কখনো গলার স্বর বেশ খুশি-খুশি শোনাত, কখনো কখনো বেশ গম্ভীর। এমনও হয়েছে, একটা ফোন এল, অমনি সাহেব এমন গম্ভীর হয়ে ভাবনায় ডুবে গেলেন যে কখন আপিস এসে গেছে টেরও পেলেন না। আর একটা কথা। মারা যাওয়ার কয়েক মাস আগে থেকে সাহেবের শরীরটা মনে হয় ভাল যাচ্ছিল না, কারণ উনি মাঝে মাঝেই গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়তেন। আপিস পৌঁছে গেছি তখনও ঘুমিয়ে যাচ্ছেন। ডেকে তুলতে হত। এর বেশি আমি আর কিছু বলতে পারব না।'

শৈলেন ওঠার জন্য উসখুস করছিল। আদিত্য সেটা লক্ষ করে বলল, 'আপনাকে আর একটাই প্রশ্ন করব। কিছুদিন আগে আপনি যখন নতুন মেমসাহেবকে নিয়ে পৈলানের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন উল্টোদিক থেকে একটা ট্রাক এসে আপনাদের গাড়িতে ধাক্কা মারে। শুনেছি, আপনার একটু চোটও লেগেছিল। ঘটনাটার কথা একটু বলবেন?'

প'ওটা একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা। আমি এতদিন গাড়ি চালাচ্ছি কখনও এমন হয়নি। আপনাকে আমি গর্ব করে বলতে পারি সাহেব, এতদিন গাড়ি চালাচ্ছি একবারের জন্যেও কেস খাইনি। ছোটখাটো সিগনাল ভাঙার কেসও না। যেদিন এবাড়িতে প্রথম গাড়ি চালাতে আসি কত্তাবাবা বলে দিয়েছিলেন, শোনো শৈলেন, গাড়ি চালানোর সময় সর্বদা মনে রাখবে তুমি আগুন নেভাতে যাচ্ছ না। তারপর যখন বড় সাহেবের গাড়ি চালাতে এলাম প্রথম দিকে উনি মাঝেমাঝেই বলতেন, শৈলেন, গাড়ি চালানোর সময় কখনও তাড়াহুড়ো করবে না। মনে রাখবে, আমি কারও চাকরি করি না, তাই দু'চার মিনিট পরে পৌঁছলে আমার চাকরি চলে যাবে না। আমি কথাগুলো মনে রেখেছিলাম।'

'তাহলে সেদিনও আপনি সাবধানেই চালাচ্ছিলেন।'

'আমি অকারণ জোরে গাড়ি চালাতে পারি না। সেদিন অবশ্য নতুন মেমসাহেব একটু তাড়া দিচ্ছিলেন। বলছিলেন, পৈলানের ফ্যাক্টরি ছাড়াও ওঁকে আরও কয়েকটা জায়গায় যেতে হবে। তাই আমি যেন একটু তাড়াতাড়ি চালাই। ওঁর কথা শুনে জোকা পেরোনোর পর আমি ষাট-এ ইস্পিড তুললাম। হঠাৎ উল্টোদিকের একটা অর্ধেক তৈরি হওয়া বাড়ি থেকে একটা লরি বেরোল। ওই যেরকম লরি ইট-বালি-সিমেন্ট নিয়ে যায়। আমি ধরে নিয়েছিলাম লরিটা আমার জন্য দাঁড়াবে। দাঁড়াল না। আমি যেদিকে যাচ্ছি তার উল্টোদিকে যাবার জন্য বাঁদিকে টার্ন নিল। এতেও কোনও অসুবিধে হত না, যদি লরিটা আমার উল্টোদিকের লেনেই থাকত। সেটা না থেকে আমার লেনে ঢুকে লরিটা সজোরে আমার গাড়িটাকে ধাক্কা মারল। কোন উজবুক চালাচ্ছিল কে জানে, বোধহয় শালার লাইসেন্সও হয়নি। আমার কপালটা ফাটল, ঠাকুরের কৃপায় প্রাণে বেঁচে গেলাম।

গাড়িটা ধানখেতে নেমে গেল। নতুন মেমসাহেব যদি আমার ঠিক পেছনে বসে থাকতেন, উনিও রেহাই পেতেন না। আমার দিকের দরজা আর আমার পেছন দিকের দরজা দুটোই ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। ভাগ্য ভাল, মেমসাহেব আমার ঠিক পেছন দিকের জানলার ধারে না বসে ওপাশের জানলার ধারে বসেছিলেন। তাই ওঁর কোনও চোট লাগেনি। আমাদের মেরেই গাড়িটা পালিয়ে গেল। নম্বরটা পর্যন্ত নিতে পারলাম না।'

'সেদিন কী গাড়ি চালাচ্ছিলেন?'

'শহরের মধ্যে মেমসাহেব একটা ফেরারি চড়েন। আমিই চালাই। কিন্তু শহরের বাইরে যেতে হলে ফেরারিটা কখনও নেন না। খুব দামি গাড়ি কিনা। শহরের বাইরে যেতে হলে কখনও নতুন মার্সিটিজটা নেন, কখনও একটা পুরোনো হন্ডা অ্যাকর্ড আছে সেটা নেন। সেদিন অ্যাকর্ডটা নিয়েছিলেন। গাড়িটা পুরোনো হলে কী হবে, চলে বাঘের বাচ্চার মতো। সরাসরি জাপান থেকে আনানো তো।'

শৈলেন ড্রাইভার থামল। আদিত্যর মনে হল শৈলেনের কাছ থেকে যেটুকু জানার ছিল মোটামুটি জানা হয়েছে। যেটা বাকি রয়ে গেল, সেটা শৈলেন এখনই বলবে না। সে মুখে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ শৈলেনবাবু। আপনি এখন আসতে পারেন। আপনি ফিরে গিয়ে দয়া করে ম্যানেজারবাবুকে একটু পাঠিয়ে দেবেন।'

আদিত্য অডিওটা বন্ধ করে দিল।

(২)

আদিত্য আগেই লক্ষ করেছিল বয়েস আন্দাজে শিশির চ্যাটার্জি বেশ শক্তপোক্ত আছেন। এবার শিশির চ্যাটার্জি তার সামনে এসে বসার পরে আদিত্যর মনে হল ভদ্রলোকের বয়েস পঁচাত্তরের কম হবে না। গাল দুটো ভেঙে গেছে বটে, চুলও একেবারে ধপধপে সাদা, কিন্তু চোখের দৃষ্টি এখনও বেশ সজাগ।

আদিত্য কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই শিশিরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি যে বইটা লিখবেন সেটার প্রকাশক পেয়েছেন?'

'না। প্রকাশক জোগাড় করার ব্যাপারে আমার কোনও দায়িত্ব নেই। আসলে মন্দাকিনী চৌধুরি আমাকে বইটা লিখতে বলেছেন। বইটা লেখা হয়ে গেলে পাণ্ডুলিপিটা তাঁর হাতে তুলে দেব। তিনি সেটা নিয়ে কী করবেন সেটা তিনিই ঠিক করবেন। আমি শুধু একটা পারিশ্রমিক পাব। তবে তাঁর সঙ্গে আমার চুক্তি হয়েছে, বইটা যদি কখনও ছাপা হয় তাহলে লেখক হিসেবে আমার নামটাই থাকবে।'

'মন্দাকিনী ম্যাডামের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ হল কীভাবে?'

'ওঁর মেয়ে সোহিনীর মাধ্যমে। আমাদের কিছু কমন ফ্রেন্ড আছে।'

'আপনি কি কোথাও সাংবাদিকতা করেন?'

'টুকটাক লিখি, তবে ফ্রি লান্স।'

'চিরদিনই ফ্রি লান্স নাকি কখনও চাকরি করেছেন?'

'কিছুদিন একটা বাংলা কাগজে কাজ করেছি।

'কোন কাগজে কাজ করেছেন?'

আদিত্য একটা বিখ্যাত বাংলা দৈনিকের নাম বলল যেখানে তার একাধিক বন্ধু কাজ করে এবং সেই বন্ধুদের সুবাদে সেই কাগজের আরও কয়েকজনকে আদিত্য চেনে।

'মহীতোষ চ্যাটার্জিকে চেনেন? আমার ভাইপো। অনেক দিন ওখানে কাজ করেছে। এখন রিটায়ার্ড। রিটায়ার করার আগে বোধহয় নিউজ এডিটরও হয়েছিল। নিশ্চয় চেনেন?'

বলাই বাহুল্য, ওই নামে আদিত্য কাউকে চেনে না। কিন্তু সে কি মিথ্যে করে চিনি বলবে? নামটা যদি খুব প্রমিনেন্ট কারও হত সে নিশ্চয় শুনত। আদিত্য জানে অকারণে মিথ্যে বলতে নেই। একটু ভেবে নিয়ে সে

বলল, 'ঠিক চিনতে পারছি না। কবে কাজ করতেন?'

'চিনতে পারার কথাও নয়। ও নামে কেউ নেই। কিছু মনে করবেন না আদিত্যবাবু আপনাকে একটু পরীক্ষা করে দেখছিলাম। চৌধুরি এন্টারপ্রাইজেস-এর তো শত্রুর অভাব নেই, তাই একটু সতর্ক থাকতেই হয়। মন্দাকিনী ম্যাডামের ততটা অভিজ্ঞতা নেই, না জেনে কোনও অবাঞ্ছিত লোককে ঢুকিয়ে দিতেই পারেন। আমরা পুরোনো লোক, অনেক দেখেছি। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে অচেনা কাউকে কোম্পানির ভেতরের কথা বলার আগে তাকে বাজিয়ে দেখে নেওয়াটা জরুরি। যাইহোক, আপনি পরীক্ষায় পাশ করে গেছেন। এবার বলুন আপনার কী জিজ্ঞাস্য।'

আদিত্যর ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। সে বলল,

'আমাদের কথাবার্তা টেপ করতে পারি?'

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, 'কথাবার্তা টেপ না করাই ভালো। আমি সেকেলে লোক, তাই হয়তো একটু বেশি সতর্ক। কিন্তু আগে থেকে তো বোঝা যায় না কোন কথা কীভাবে কম্পানির বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে। কথা টেপ না করে আপনার মাথায় ধরে রাখুন।'

'কোনও অসুবিধে নেই। আমি টেপ করছি না।' আদিত্য মোবাইলটা পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে বলল, 'আপনি তো সুবীর চৌধুরির বাবার আমল থেকে এই কোম্পানিতে আছেন। যদি সংক্ষেপে এই কোম্পানির ইতিহাসটা একটু বলেন, মানে আপনি যতটুকু দেখেছেন।'

'আমার এখন আটাত্তর চলছে। পঁচিশ বছর বয়েসে এই কোম্পানিতে ঢুকেছিলাম। সেটা ছিল নাইনটিন সিক্সটি ফাইভ। তখন সুবীর চৌধুরির বাবা সুবিমল চৌধুরির আমল। আমি এম কম-এ ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলাম। ইচ্ছে ছিল চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হব। বাড়ির অবস্থা ভাল ছিল না তাই চাটার্ড পড়া হল না। চাকরিতে ঢুকে যেতে হল। সুবিমল চৌধুরি নিজে আমার ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন। আমাকে পছন্দ করতেন।'

'তখন কোম্পানির অবস্থা কেমন ছিল?'

'দেখুন চৌধুরিদের তো অনেক পুরুষের ব্যবসা। সাধারণত এত পুরুষ ব্যবসা টেকে না। স্বাভাবিক কারণেই ভাইদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। আর সব ভাইয়ের তো আর সমান ব্যবসা করার ক্ষমতা থাকে না। সুবিমল চৌধুরি, সুবীর চৌধুরিরা চৌধুরি বংশের যে মূল ধারাটার প্রতিনিধি তারা কিন্তু সৌভাগ্যবশত প্রত্যেকেই বিচক্ষণ ছিলেন। অর্থাৎ সুবিমল চৌধুরি-সুবীর চৌধুরির পূর্বপুরুষেরা প্রত্যেকেই ছিলেন ধুরন্ধর ব্যবসাদার। তাই চৌধুরি এন্টারপ্রাইজেস-এর এত রমরমা। আমি যখন এই কোম্পানিতে আসি তখন থেকেই এই রমরমা দেখছি। তবে এখানে কয়েকটা কথা আছে। সুবিমল চৌধুরি ছিলেন সাবধানী মানুষ। নতুন রাস্তায় হাঁটা তাঁর ধাতে ছিল না। যেটুকু আছে সেটাকেই পরম যত্নে আগলে রাখতেন তিনি। আমার চরিত্রে যে সাবধানতা আছে সেটা তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া। আমি তাঁর কাছেই কাজ শিখেছি কিনা। সুবীর চৌধুরির চরিত্রটা ছিল ঠিক তাঁর বাবার উল্টো। তিনি ঝুঁকি নিতে ভালবাসতেন। তাই নতুন নতুন ব্যবসায় তিনি টাকা ঢেলেছেন। আর এটা স্বীকার করতেই হবে যে ব্যবসার ব্যাপারে তাঁর একটা আশ্চর্য সিক্সথ সেন্স কাজ করত। তিনি জীবনে কোনও দিন কোনও ব্যবসায় লোকসান দেননি। যেখানে টাকা ঢেলেছেন সেখানেই সোনা ফলেছে। অনেকেই মনে করেন, চৌধুরি বংশের শ্রেষ্ঠ বিজনেস ট্যালেন্ট হলেন সুবীর চৌধুরি।'

উর্দিপরা বেয়ারা আবার চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল। দুজনকে চা ঢেলে দিল। সেই অবসরে শিশির চ্যাটার্জি একটু থামলেন। চায়ের কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে আবার শুরু করলেন, 'ভগবান বোধহয় সব কিছু এক সঙ্গে দেন না। সুবীর চৌধুরিকে যেমন হাত উজাড় করে ভগবান ব্যবসাবুদ্ধি দিয়েছেন তেমনি তাঁর একমাত্র ছেলে শঙ্খদীপকে শুধু ব্যবসাবুদ্ধি কেন, কোনও বুদ্ধিই দেননি। উল্টে একগাদা কুবুদ্ধি দিয়েছেন। বলতে বাধ্য হচ্ছি, শঙ্খদীপের মতো এতটা উচ্ছন্নে যাওয়া মানুষ আমি অন্তত খুব একটা দেখিনি। তিনি যদি একটু স্বাভাবিক হতেন, তাহলে আজ চৌধুরি এন্টারপ্রাইজেস-এর এই হাঁড়ির হাল হত না।'

'হাঁড়ির হাল? চৌধুরি এন্টারপ্রাইজেস-এর?' আদিত্য অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ। হাঁড়ির হাল। এটা এখন বিজনেস মহলে সকলেই জানে। প্রতি বছর প্রফিট কমে যাচ্ছে। অনেকগুলো ব্যবসা বিক্রি হয়ে গেছে। গত বছর ব্যালেন্স শিটে লস দেখানো হয়েছে, কোম্পানির ইতিহাসে যা আগে কখনও হয়নি।'

'কবে থেকে এরকম হল?'

'বলতে পারেন, সুবীর চৌধুরি মারা যাবার পর থেকেই কোম্পানির পতন শুরু হয়েছে। একটা কথা খোলাখুলি মেনে নেওয়াই ভাল। মন্দাকিনী চৌধুরির কোনও বিজনেস অ্যাকুমেন নেই। উনি মূলত একজন শিল্পী মনের মানুষ। শুনেছি বিয়ের আগে অভিনয় করতেন। কিন্তু এতবড় একটা ব্যবসা চালাতে গেলে যে ধরনের মেধা লাগে সেটা তাঁর নেই। যদি শঙ্খমালা সেন কোম্পানি চালাতেন তাহলে কোম্পানির এই অবস্থা হত না। শঙ্খমালা সেনের বুদ্ধিসুদ্ধির ওপর আমার অন্তত অনেক বেশি আস্থা আছে। যাইহোক, সেসব তো আর হবার নয়, যা ভজঘট একটা উইল করে গেছেন সুবীর চৌধুরি। থাক সেসব কথা। আশা করি আমার এই কথাগুলো আপনি আপনার বইএ ডিসক্রিটলি ব্যবহার করবেন। অন্তত আমার মুখে বসাবেন না। এবার বুঝতে পারছেন তো কেন আপনাকে আমাদের কথাবার্তা টেপ করতে দিইনি।'

ঘরে একটা স্তব্ধতা বিরাজ করছে। আদিত্যই প্রথমে স্তব্ধতা ভেঙে বলল, 'গত বছর এই বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা হয়েছিল। তার ছিঁড়ে বাড়ির লিফটটা তিনতলা থেকে একতলায় পড়ে গিয়েছিল। আপনার নিশ্চয় ঘটনাটা মনে আছে?'

শিশির চ্যাটার্জির মুখে আঁধার ঘনিয়ে এল। শঙ্কিত গলায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি হঠাৎ এই প্রশ্ন করছেন কেন? এই ঘটনাটাও আপনার বইএ লিখবেন নাকি?'

'না, না। এসব বইএ লেখার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আমি শুধু চৌধুরি বাড়ির অন্দরমহলের একটা দুর্ঘটনা থেকে সেখানকার বর্তমান টেনশনগুলো বোঝবার চেষ্টা করছি। আর একটু পরিষ্কার করে বলি। আপনার কি মনে হয়, লিফট ভেঙে পড়ার পেছনে কোনও ফাউল প্লে থাকতে পারে?'

শিশির চ্যাটার্জির মুখের ওপর নিমেষে চার-পাঁচ রকম অভিব্যক্তি খেলে গেল। ভয়, উদ্বেগ, বিরক্তি, ক্রোধ, তিক্ততা। কী একটা বলতে গিয়ে তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'আপনার প্রশ্ন যদি এটা হয় যে, কেউ মন্দাকিনী চৌধুরিকে খুন করার চেষ্টা করছে কিনা, তাহলে আমি বলব, সম্ভাবনাটা মোটেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাঁকে অপছন্দ করে এমন লোকের অভাব নেই। তাঁর মৃত্যুতে লাভবান হবেন এমন মানুষও একাধিক। এর বেশি আমি আর কিছু বলতে পারব না। অনুরোধ করব, এসব কথা আপনার বইতে না লিখতে। লিখলে কিন্তু আমি অস্বীকার করব। আইনের সাহায্যও নিতে পারি। কথাটা মনে রাখবেন। আমার মনে হয় আমাদের ইন্টারভিউ এখানেই শেষ।'

শিশির চ্যাটার্জি উঠে দাঁড়ালেন। উঠে দাঁড়িয়ে আবার বললেন, 'আদিত্যবাবু আপনার সঙ্গে আমার কথা শেষ। আপনি এবার আসুন।'

## (৩)

দেখতে দেখতে প্রায় তিনটে সপ্তাহ কেটে গেল। বলা যায়, ঘটনাহীনভাবেই কেটে গেল। মেসের খাটে শুয়ে শুয়ে চিন্তা করা ছাড়া আদিত্যর হাতেও তেমন কোনও কাজ নেই। চৌধুরি বাড়ি সম্বন্ধে একটা আবছা ধারণা আদিত্যর মনে তৈরি হয়েছে বটে, কিন্তু মন্দাকিনী চৌধুরির সঙ্গে কথা না বলা পর্যন্ত ধারণাটা কিছুতেই দানা বাঁধছে না। তিন সপ্তাহের মধ্যে সোহিনী বার দুয়েক ফোন করেছিল। দু'বারই আদিত্য জানিয়েছে মন্দাকিনী চৌধুরির সঙ্গে কথা বলার আগে সে এই কেসটা সম্বন্ধে কোনও মতামত দিতে রাজি নয়।

এর মাঝে একটা রবিবার স্যমন্তক তার বাড়িতে নেমন্তন্ন করেছিল। ওদের বাড়িটা কলকাতার বাইরে, নরেন্দ্রপুর-সোনারপুর ছাড়িয়ে। ফলে আদিত্যর একটা আউটিং হল। স্যমন্তক তার বউকে মনে হয় আগে

থেকেই বলে রেখেছিল তাদের বাড়িতে একজন জ্বলজ্যান্ত গোয়েন্দা নেমন্তন্ন খেতে আসছে। ফলে স্যমন্তকের বউ অমিতা প্রথম প্রথম আদিত্যর সঙ্গে ঠিক সহজ হতে পারছিল না। একটু দূর থেকে নজর রাখছিল। একটু পরেই অবশ্য অমিতার সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। ওদের এখনও ছেলেপুলে হয়নি। তাই সংসারে বেশ একটা ছাড়া ছাড়া বোহেমিয়ান ভাব আছে। সারাদিন নির্ভেজাল আড্ডা হল। গান-টান হল। প্রচুর খাওয়াদাওয়াও হল। অমিতা দুর্ধর্ষ রান্না করে আবার মোটামুটি ভাল রবীন্দ্রসঙ্গীতও গায়। স্যমন্তকের গানের গলাও মন্দ নয়। গান গাওয়ার ব্যাপারে কাউকেই দু-বার বলতে হয় না। কলেজের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু স্যমন্তকরা কেউই খুব পরিষ্কার করে নীলাঞ্জন মৈত্রর হদিশ দিতে পারল না। অমিতা শুধু বলল, 'আমি যতদূর জানি অনেক দিন আগে আমহার্স্ট স্ট্রিটের কোনও একটা বাড়ির একতলার একটা ঘরে প্রান্তিক-এর রিহার্সাল হত। এখন আর হয় কিনা জানি না। তখন রবিবার আর শো-এর দিন বাদে রোজই রিহার্সাল হত। আমাদের দলের সুদীপ্ত এক সময় প্রান্তিক-এ ছিল। ও গল্প করেছিল।'

'সুদীপ্ত-র সঙ্গে একবার দেখা করা যেতে পারে?'

'অবশ্যই। তুই যে-কোনও উইক ডে রাত্তির নটার পর কালীঘাটে, আমরা যেখানে রিহার্সাল দিই, সেখানে চলে আয়। সুদীপ্ত-র সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।' স্যমন্তক বলল। 'তবে একটা ফোন করে আসিস। যদি কোনও কারণে সেদিন রিহার্সাল বন্ধ থাকে, বোর হয়ে যাবি।'

আদিত্য একদিন কালীঘাট গিয়ে সুদীপ্ত-র সঙ্গে দেখাও করে এল। একটু আগে আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। ফলে অনেকক্ষণ বসে বসে রিহার্সাল দেখতে হল। দেখতে অবশ্য মন্দ লাগছিল না। সাড়ে নটার সময় শেষ হল রিহার্সাল। চা খেতে খেতে সুদীপ্তর সঙ্গে কথা হল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সুদীপ্তও নীলাঞ্জন মৈত্রের কোনও হদিশ দিতে পারল না। তার কাছ থেকে শুধু জানা গেল নীলাঞ্জন মৈত্র একরোখা, একগুঁয়ে ধরনের লোক, সবার সঙ্গেই দূরত্ব রেখে চলত। বিশেষ করে স্ত্রী ছেড়ে যাবার পর থেকে। সুদীপ্ত বলল, 'নীলাঞ্জনদার সঙ্গে আপনার কতটা দরকার জানি না, তবে নেহাতই যদি দেখা করতে চান, তাহলে লক্ষ রাখুন ওদের পরবর্তী শো কবে হয়। অ্যাকাডেমিতেই সাধারণত ওরা শো করে। ওখানে গিয়ে খোজ করলেই জানতে পারবেন প্রান্তিক-এর পরের শো কবে আছে।'

অ্যাকাডেমিতে গিয়েও সুবিধে হল না। শুধু এইটুকু জানা গেল যে আগামী দুমাস অ্যাকাডেমিতে প্রান্তিক-এর কোনও শো নেই। নীলাঞ্জন মৈত্রকে খুঁজে পাবার আশা আদিত্য প্রায় ছেড়েই দিল।

এইভাবে শেষ হয়ে গেল ফেব্রুয়ারি মাস। মন্দাকিনী চৌধুরির সঙ্গেও দেখা হল না। তারপর মার্চের প্রথম দিকে একটা শনিবার অমিতাভর ফোন এল। 'আজ সন্ধেবেলা পাথুরিয়াঘাটায় নন্দন গাইছে। হাতে কাজ না থাকলে চলে আয়। না এলে মিস করবি।'

'হাতে কোনও কাজ নেই। তাছাড়া ক-দিন ধরেই ভাল গান শোনার জন্য মনটা ছটফট করছে। অবশ্যই যাব। কিন্তু পাথুরিয়াঘাটার কোথায়? আমাকে ঢুকতে দেবে তো?'

'তুই আমার সঙ্গে যাবি। আমি তোকে তোর মেসের সামনে থেকে তুলে নেব। গান শুরু সাড়ে ছটায়। আমাকে একটু আগে পৌঁছতে হবে। তুই পৌনে ছটার মধ্যে রেডি হয়ে থাকিস। আমি তোর বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে একটা ফোন করে দিলে তুই নেমে আসিস।'

'ঠিক আছে। তাহলে সন্ধেবেলা দেখা হচ্ছে।'

আদিত্য ফোনটা কেটে দিয়ে সোহিনী মৈত্রর ফোন নম্বরটা লাগাল। ওপারে সোহিনীর গলা শুনতে পেয়ে বলল,

'আমি একটা দরকারি কথা বলার জন্য ফোন করছি।'

'বলুন।'

'আজ সন্ধেবেলা আপনার বন্ধু নন্দন চক্রবর্তী পাথুরিয়াঘাটায় গান গাইবেন। আমার বন্ধু অমিতাভ মিত্রর সঙ্গে আমি শুনতে যাব। মনে হয় ওখানে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। দেখা হলে কিন্তু আমি ভান করব এই প্রথম আপনার সঙ্গে আলাপ হচ্ছে। আমার ইনভেস্টিগেশনটা যতটা গোপন রাখা যায় ততই ভাল।'

'ঠিক আছে। আপনি যেমন বলবেন। অমিতাভ মিত্র আপনার কীরকম বন্ধু?'

'আমার কলেজের বন্ধু। ঠিক বন্ধুও নয়। আমার তো নিজের কোনও পরিবার নেই। আমার পরিবার বলতে ওই অমিতাভ আর ওর স্ত্রী রত্না।'

'শুনে খুব ভাল লাগছে। অমিতাভবাবু একেবারে গান-পাগল মানুষ। নন্দনের জন্য অনেক করছেন।'

'অমিতাভ আমাকে নন্দন চক্রবর্তীর গান শুনিয়েছে। আউটস্ট্যান্ডিং। এক্সকুইজিট। অমিতাভ অকারণে কাউকে প্রোমোট করে না। নন্দন চক্রবর্তী ডিজার্ভস টু বি প্রোমোটেড।'

'আপনি গান বোঝেন, তাই বলছেন। ক'জন আজকাল গান বোঝে বলুন? গান-বাজনার জগৎটাও এত নোংরা হয়ে গেছে। একটু নাম করতে গেলে কনফারেন্স অরগানাইজারদের পেছন পেছন ছুটতে হয়। নন্দন কেন সেসব করতে যাবে? ওর তো ওটা কাজ নয়। তার থেকে ও বাড়ি বসে রেওয়াজ করবে। একমাত্র অমিতাভবাবুই আমাদের ওয়েল-উইশার। আর কেউ নয়। আমার মা-ও এ-ব্যাপারে ভীষণ অসহযোগিতা করছে।' বলতে বলতে সোহিনীর গলা কান্নায় বুজে এল।

'আপনার মা? তিনি এর মধ্যে কীভাবে আসছেন?'

সোহিনী নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়েছে। বলল, 'দেখুন, নন্দন ইজ আ জিনিয়াস, সত্যিকারের জিনিয়াস। জিনিয়াসদের কিছু কিছু লাইসেন্স দিতে হয়। নাহলে তাদের সৃষ্টি ব্যাহত হয়। নন্দনের ক্ষেত্রেও কথাটা খাটে। নন্দন মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান করে। অন্য নেশাও আছে। আমি জানি এটা ধ্বংস হয়ে যাবার রাস্তা। তাই একটু একটু করে নন্দনকে এই রাস্তা থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করছি। কিন্তু এটা একদিনে হবার নয়। জোর খাটিয়ে দেখেছি নন্দন গান একদম বন্ধ করে দিয়েছে। নন্দনের গান বন্ধ করাটা তো আমার উদ্দেশ্য নয়। তাই আস্তে আস্তে বুঝিয়ে বুঝিয়ে নন্দনকে ঠিক রাস্তায় আনতে হবে।'

'বুঝলাম। কিন্তু এর মধ্যে আপনার মা কীভাবে আসছেন এখনও বুঝতে পারলাম না।'

'সেটাই বলছি। আমার মা গান-বাজনা একদম বোঝে না। শুধু ওপর ওপর দ্যাখে একটা নেশাখোর ছেলের সঙ্গে আমি বসবাস করছি, মার মতে যার কোনও ভবিষ্যৎ নেই। তাই নন্দনকে বাড়ি থেকে বার করে দেবার জন্য মা ভয়ঙ্কর চাপ দিচ্ছে। বাড়িটা তো মার। মা বাড়ি থেকে নন্দনকে বার করে দিলে আমাকেও বেরিয়ে যেতে হবে। তখন জানি না কোথায় থাকব। চৌধুরি এন্টারপ্রাইজেস থেকে যে টাকাটা মাসোহারা হিসেবে পাই তাতে কিছুই হয় না।'

'মাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন?'

'করেছি। লাভ হয়নি। ক্রিয়েটিভিটি ব্যাপারটা মা কোনোদিনই বোঝে না। বুঝলে বাবার ট্যালেন্টটা অত সহজে নষ্ট করে দিতে পারত না। আমার বাবা ঠিক নরমাল ছিল না। বাবার নানারকম অসুবিধে ছিল। কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে বাবা ভীষণ ট্যালেন্টেড ছিল। আমার ধারণা, মা বাবাকে ছেড়ে চলে যাবার পর থেকে বাবার ক্রিয়েটিভ সত্তাটা একেবারে মরে গেল। আমি বলব, বাবার শিল্পী-সত্তার মৃত্যুর জন্য মা-ই একশ ভাগ দায়ী। মা নাট্যকার নীলাঞ্জন মৈত্রর জীবনটা শেষ করে দিয়েছে অ্যান্ড আই হেট হার ফর দ্যাট। কিন্তু মাকে আমি নন্দন চক্রবর্তীর ট্যালেন্টটা নষ্ট করতে দেব না। আমার শেষ রক্তবিন্দু অব্দি লড়াই করব।'

একটানা অনেকক্ষণ কথা বলে সোহিনী থামল। ওদিক থেকে আর সাড়া-শব্দ আসছে না দেখে আদিত্যর মনে হল সোহিনী বুঝি ফোন নামিয়ে রেখেছে। সে-ও ফোনটা কেটে দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় আবার সোহিনীর গলা শোনা গেল, 'আমি এসব কথা আপনাকে কোনও দিনই বলতাম না। কিন্তু নন্দনের প্রশংসা করে আপনি আমাকে একেবারে বেসামাল করে দিলেন। যাইহোক, আপনাকে একটা খবর দেবার আছে।

খবরটা দেবার জন্য আমি নিজেই আপনাকে ফোন করতাম। আজ সকালে মেল পেয়েছি, মা পরশু দিন ফিরে আসছে। আশা করছি চার-পাঁচ দিনের মধ্যে মার সঙ্গে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দিতে পারব।'

নন্দন চক্রবর্তী বেহাগ গাইছে। তামাটে রঙ, তোবড়ানো গাল, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। সুপুরুষ কেউ বলবে না। অন্তত সোহিনীর পাশেতো একেবারেই বেমানান। তার সঙ্গে সোহিনীর মেলবন্ধনটা যে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ সুরের মাধ্যমে হয়েছে একথা ভেবে আদিত্যর মতো জীবনযুদ্ধে পোড়-খাওয়া সৈনিকেরও চোখে জল এসে গেল। হয়তো তখন চারদিকে সুরের একটা আশ্চর্য বাতাবরণ তৈরি হয়ে গিয়েছিল বলে, কিংবা হয়তো ঠিক তখনই পঞ্চম থেকে তীব্র মধ্যমে একটা নিদারুণ মোচড় খেয়ে গান্ধার, শুদ্ধ মধ্যম হয়ে সুর আবার গান্ধারে ঘুরে এসে খানিকটা জিরিয়ে নিচ্ছিল বলে, কিংবা হয়তো নন্দন চক্রবর্তীর গলায় শ্রাবণ মাসের টলটলে দিঘির মতো সুর উপচে পড়ছিল বলে আদিত্যর মনটা এতটাই নরম হয়েছিল। আদিত্য খেয়াল করল, নন্দন চক্রবর্তীর গানে কোথাও তাড়াহুড়ো নেই, নাটক নেই। শুধু শান্তি আছে। অপার শান্তি। অতি ধীরে ধীরে সুর নিজেই নিজের রাস্তা খুঁজে নিচ্ছে। খুঁজতে খুঁজতে কত নতুন রাস্তা বেরিয়ে পড়ল, সেসব রাস্তার কথা আদিত্য জানতই না। রাস্তার ধারে কত কুটির তৈরি হল। কত অট্টালিকা তৈরি হল। সেইসব কুটীর-অট্টালিকার ওপর ভর করে নন্দন একসময় দ্রুত খেয়ালে পৌঁছল। ঝাঁপতাল। নন্দন চক্রবর্তী সত্যিই প্রতিভাবান। বেহাগের পরে নন্দ, সেই পুরোনো বন্দিশ 'ঢুঁড়ু বারি সঁইয়া'। শেষে ছোট করে নায়েকি কানাড়া। আসর ভাঙল সাড়ে দশটায়।

গান শেষ হবার পর অমিতাভ যখন নন্দন চক্রবর্তীর সঙ্গে আদিত্যর আলাপ করিয়ে দিচ্ছে, আদিত্য খেয়াল করল নন্দন নমস্কার এবং তারিফের প্রত্যুত্তরে সবিনয়ে নমস্কার জানাল বটে কিন্তু তার চোখ বলছে এই পৃথিবীর কোনও কথা তার মাথায় ঢুকছে না। সে তখনও পুরোপুরি অন্য জগতে রয়েছে। সেই অন্য জগৎটা কিছুক্ষণ আগে তার নিজের তৈরি করা সুরের জগৎ, নাকি মাদক-প্রভাবিত কোনও কৃত্রিম ভুবন, আদিত্য ঠিক ধরতে পারল না।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(১)

কলকাতায় বসন্তের আয়ু বড়জোর সপ্তাহ দুয়েক। যেমনি হঠাৎ আসে তেমনি হঠাৎ চলে যায়। আদিত্য বউবাজারে তার আপিস থেকে বেরিয়ে সবে রাস্তায় পা দিয়েছে এমন সময় বলা নেই কওয়া নেই দক্ষিণ দিক থেকে একটা ব্যস্তবাগীশ হাওয়া হন্তদন্ত হয়ে এসে জানাল বসন্ত এসে গেছে।

এখন সবে সোয়া পাঁচটা, বিকেলই বলা চলে। মন্দাকিনী চৌধুরির কোথায় যেন যাবার আছে, সন্ধে ছটায় আপিসে ফিরবে। আদিত্যকে ওই সময়েই আসতে বলেছে। মন্দাকিনীর আপিস লালদিঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, আদিত্যর আপিস থেকে হেঁটে বড়জোর দশ মিনিট। একটু আগে আগে বেরোনো হয়ে গেল। ছটা অব্দি কী করে সময় কাটানো যায়? আদিত্যর মনে পড়ল, লালদিঘির ওদিকটায় একটা চায়ের দোকান আছে, সেখানে এই সময় বেগুনি-ফুলুরি ভাজে। ফুটপাথের দোকান, কিন্তু ভিড় হয় খুব। কে যেন বলেছিল, হাইকোর্ট, ব্যাঙ্কশাল কোর্টের ভিড়। মনে হয় না। এতক্ষণ কোর্ট খোলা থাকে নাকি? আদিত্য ঠিক করল ওখানেই আধঘণ্টা কাটিয়ে দেবে। মনটা অকারণে খুশি খুশি লাগছে।বসন্ত এসে গেছে বলেই বোধহয়।

এবছর শীতটা ফেব্রুয়ারির শেষ অব্দি টেনেছিল। এখনও দখনে বাতাসে একটা ঠান্ডার আমেজ আছে। লালদিঘির ধারে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ খুব সাজগোজ করে হাওয়ায় মাথা ঝাঁকাচ্ছে। পাশে একটা রাধাচূড়াও আছে, কিন্তু তার প্রসাধন এখনও পুরো হয়নি। সবে দু'চারটে হলুদ ফুল ধরেছে তার শরীরে। লালদিঘির পুবদিকে মিনিবাসের গুমটিতে আপিস-ফেরতদের লাইন ক্রমশ লম্বা হচ্ছে। অন্যদিকে, আদিত্য যেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা-তেলেভাজা খাচ্ছে তার ঠিক সামনে, চৌধুরি এন্টারপ্রাইজেসের পাঁচতলা আপিস। বাড়িটা পুরোনো, কিন্তু দেখেই বোঝা যায় বেশ যত্নে আছে। দ্বিতীয় ভাঁড় চায়ে চুমুক দিতে দিতে আদিত্য সেদিকে মাঝে মাঝে নজর রাখছিল।

ছটা বাজতে তখনও সাত-আট মিনিট বাকি, আদিত্য হঠাৎ লক্ষ করল চৌধুরি এন্টারপ্রাইজের গেট দিয়ে একটা গাড়ি ঢুকছে। ফেরারি নাকি লম্বারগিনি? যেটাই হোক, সন্দেহ নেই দামি স্পোর্টস কার, সম্ভবত ইটালিয়ান। আদিত্য আরও খেয়াল করল, গাড়ি চালাচ্ছে সোহিনী মৈত্র আর তার পাশে যিনি বসে আছেন তাঁর ছবি আদিত্য অনেকবার খবর কাগজে, পত্র-পত্রিকায় দেখেছে। ইনি নিসন্দেহে মন্দাকিনী চৌধুরি। তাহলে মন্দাকিনী ফিরে এসেছে। আদিত্য কিছুক্ষণের মধ্যে চা-তেলেভাজার দাম মিটিয়ে চৌধুরি এন্টারপ্রাইজের বাড়িটার দিকে পা বাড়াল।

সিইও মন্দাকিনী চৌধুরির আপিস পাঁচতলায়। একতলার রিসেপশনে আদিত্যর নামটা জানানো ছিল। নিজের নাম বলতেই লিপস্টিক-রঞ্জিত-ওষ্ঠ, উদ্ভিন্ন যৌবনা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান রিসেপশনিস্ট আদিত্যকে লিফট-এ উঠে পাঁচতলায় চলে যেতে বলল। পাঁচতলায় উঠে আরেকটা ছোট রিসেপশন, মনেহয়, সিইও-র খাস অতিথিদের জন্য। এবারের রিসেপশনিস্ট মেয়েটির চেহারা ও সাজপোশাক তর্কাতীতভাবে বাঙালি, নীলশাড়ি-ব্লাউজের সঙ্গে রংমেলান্তি নীলটিপ, পিঠের ওপর এলিয়ে পড়া খোঁপা, কিন্তু কথা বলল ইংরেজিতে, মিশনারি ইস্কুলে শেখা উচ্চারণে। সামনের সোফায় আদিত্যকে বসতে বলে ইন্টারকমে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করল। তারপর আদিত্য কেবল, আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ম্যাডাম আদিত্যকে ডেকে নেবেন। ইতিমধ্যে আদিত্য কি চা বা কফি কিছু খাবে? ঠিক আট মিনিট বাদে যখন মন্দাকিনী চৌধুরির ঘরে আদিত্যর ডাক পড়ল তখন তার একদফা কফি খাওয়া হয়ে গেছে।

মস্ত বড় ঘর, এপার-ওপার প্রায় দেখা যায় না, তার ওপর আধো-অন্ধকার। আদিত্য দেখল, একদিকে একটা পেল্লায় সেক্রেটারিয়েট টেবিল, তার ওপর টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে, কিন্তু ম্যাডাম চেয়ারে নেই। আদিত্য কোনদিকে এগোবে বুঝতে না পেরে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, এমন সময় একটু ভারী মেয়েলি গলায় কেউ বলল,

'এদিকে চলে আসুন, আমি এখানে।'

আদিত্য এবার খেয়াল করল ঘরের অন্যদিকে একপ্রস্থ সোফা, কাউচ, সেন্টার টেবিল রয়েছে, সেদিকটাতেও একটা নরম আলো জ্বলছে। মন্দাকিনী একটা কাউচে বসে আছেন। আদিত্য উল্টোদিকের কাউচটাতে গিয়ে বসল। আদিত্য আন্দাজ করল মন্দাকিনীর বয়েস তার নিজের বয়েসের কাছাকাছিই হবে। সুন্দরী। গৌরী। তন্বী। যৌবন ধরে রেখেছেন। অথচ চেহারায় চটুলতা নেই বরং একটা স্বাভাবিক দৃঢ়তা আছে। এক মুহূর্ত দেখেই আদিত্য ভদ্রমহিলার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। মন্দাকিনী বললেন, 'আপনি আমার কাজটা হাতে নিয়েছেন আমি এতে কৃতজ্ঞ। আপনার বাবার কথা আমার স্বামীর কাছে অনেক শুনেছি।'

উত্তরে আদিত্য কথা বলল না, শুধু মিষ্টি করে হাসল। মন্দাকিনী বললেন, 'হয়ত আমি তিলকে তাল করছি। হয়তো নিছক কয়েকটা সমাপতনকে জোড়া লাগিয়ে একটা মিথ্যে গল্প তৈরি করার চেষ্টা করছি। আপনার কী মনে হয়?'

আদিত্য খানিকটা ভেবে নিল কী বলবে। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'আমার মতে আপনি মোটেই তিলকে তাল করছেন না। ঘটনাগুলো নিছক সমাপতন হবার সম্ভাবনা খুবই কম। আমি যেটুকু ইনভেস্টিগেট করে দেখলাম তাতে এই মুহূর্তে আপনার জীবন সম্পূর্ণ নিরাপদ এটা জোর দিয়ে বলতে পারছি না। অর্থাৎ কেউ আপনাকে খুন করার চেষ্টা করছে না এই কথাটা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না।'

আদিত্য লক্ষ করল মন্দাকিনীর মুখের অভিব্যক্তিটা ক্রমশ বদলাচ্ছে। খুব সংবেদনশীল মুখ। ভীষণ এক্সপ্রেসিভ। বোঝা যায় এক সময় ভাল অভিনয় করতেন। এখন মন্দাকিনীকে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে। কিছুক্ষণ চিন্তা করে মন্দাকিনী বললেন,

'আপনি কেন বলছেন আমি নিরাপদ নই?'

'দেখুন, আমি যাদের সঙ্গে কথা বলেছি, আপনার বিরুদ্ধে তাদের প্রায় প্রত্যেকের কোনও না কোনও অভিযোগ আছে। কিছু অভিযোগ গুরুতর। আবার একটা অভিযোগ কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা অনেক সময় নির্ভর করে অভিযোগকারী ব্যাপারটাকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন তার ওপর। অভিযোগকারীদের কেউ কেউ আবার আপনার মৃত্যুতে বিপুলভাবে লাভবান হবেন। তবে অভিযোগ থাকলেই বা আপনার মৃত্যুতে লাভবান হলেই যে সেই ব্যক্তি আপনাকে খুন করতে চাইবে, এটা মনে করার কোনও কারণ নেই। খুন করার জন্য এক ধরনের খুনি মানসিকতা লাগে। সেটা সৌভাগ্যবশত খুব বেশি মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। কিন্তু এসবের পাশাপাশি যদি আপনার সাম্প্রতিক অ্যাক্সিডেন্টের ঘটনাগুলোকে রাখি, তাহলে বলব আপনার নিরাপত্তার প্রশ্নটা উপেক্ষা করাটা হঠকারিতা হয়ে যাবে।'

'আপনি আমাকে কী করতে বলছেন?'

'আপাতত সাবধান হওয়া ছাড়া খুব বেশি কিছু করার নেই। আমার পরামর্শ, আপনি নির্ভরযোগ্য সিকিউরিটি না নিয়ে বাইরে যাবেন না। বিশেষ করে কলকাতার বাইরে। লং ড্রাইভ পারলে অ্যাভয়েড করুন।'

'সেটা তো সম্ভব নয়। ব্যাবসার কাজে আমাকে বিভিন্ন যায়গায় যেতেই হবে। বিশেষ করে দার্জিলিং-এ আমাদের কয়েকটা চা-বাগান আছে। সেখানে লেবার ট্রাবল চলছে। খুব শিগগির একবার সেখানে যাওয়া দরকার।'

'বুঝতে পারছি। নেহাত যদি যেতেই হয়, আগে-পরে এসকর্ট গাড়ি নিয়ে নেবেন। যে-কোনও ভাল সিকিউরিটি এজেন্সি তার ব্যবস্থা করে দেবে।'

মন্দাকিনী টেবিলের ওপর পড়ে থাকা একটা পেনসিল হাতে তুলে নিয়ে খেলা করছেন। মানে, কিছু একটা ভাবছেন। বললেন, 'আমার বিরুদ্ধে কীসের অভিযোগ? কার অভিযোগ?'

আদিত্য সতর্ক হল। বলল, 'দেখুন, আপনি আমাকে আপনার নিরাপত্তার জন্য নিয়োগ করেছেন। তাই যেটুকু জানতে পেরেছি সেটা আপনাকে জানানো আমার কর্তব্য। সুবীর চৌধুরির প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়েরা

মনে করে বাবার সঙ্গে তাদের দূরত্বের জন্য আপনি দায়ী। তাছাড়া তারা এটাও মনে করে যে গোড়া থেকেই শুধুমাত্র সুবীর চৌধুরির বিপুল সম্পত্তির দিকেই আপনার নজর ছিল। শঙ্খদীপ একটা পুরোনো অভিশাপের কথা বলল। বলল, আপনিই নাকি সুবীর চৌধুরির জীবনে সেই অভিশাপ। আমি ব্যাপারটা খুব ভাল বুঝতে পারিনি। এছাড়া আপনাদের পুরোনো ম্যানেজার শিশিরবাবু কম্পানির সাম্প্রতিক অধঃ□□□□□ জন্য আপনাকেই দায়ী করছেন। এমনকি, আপনার নিজের মেয়ে, যাঁর মাধ্যমে আপনি আমাকে নিয়োগ করেছেন, তাঁর সঙ্গে নন্দন চক্রবর্তীকে নিয়ে আপনার একটা মনোমালিন্য তৈরি হয়েছে। এছাড়া আপনার প্রথম স্বামীরও আপনার ওপর রাগ থাকতে পারে। তবে অনেক চেষ্টা করেও নীলাঞ্জন মৈত্রর সঙ্গে আজ অব্দি দেখা করতে পারিনি।'

আদিত্য থামল। একটু দম নিয়ে বলল, 'এদের কেউ আপনাকে খুন করতে চাইছে, এমন প্রমাণ এখন অব্দি পাইনি। তবে সাবধানের মার নেই।'

দূরে, সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর টেলিফোন বাজছে। 'এক্সকিউজ মি' বলে মন্দাকিনী উঠে গিয়ে ফোন ধরলেন। নিচু গলায় কিছুক্ষণ কথা বললেন। কী বললেন আদিত্য শুনতে পেল না। ফিরে এসে আবার কাউচে বসলেন। বললেন,

'আমাকে পনের মিনিটের মধ্যে বেরোতে হবে। একটা দরকারি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। তার মধ্যে আপনার সঙ্গে কথা সেরে ফেলব। দেখুন, আমি খুব ভালো করেই জানি আমাকে বহু লোক অপছন্দ করে। হয়তো তার কারণ আছে। যেমন শঙ্খদীপ এবং শঙ্খমালা মনে করে আমি তাদের বাবাকে ছিনিয়ে নিয়েছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি আমার মতো করে ওদের হেল্প করতে চেয়েছিলাম। মালা যে একটা মাসোহারা পায় সেটা তো আমিই সুবীরকে বলে রাজি করিয়েছিলাম। দীপের ব্যাপারটা অন্যরকম। যখন আমি এ-বাড়িতে এলাম তখন দীপ এতটাই নীচে নেমে গেছে যে আর তাকে শোধরানো সম্ভব নয়। তাই দীপের জন্য আমি সুবীরকে কখনও কোনও অনুরোধ করিনি। সুবীর উইল করে গেছে তার নিজের খেয়ালে। এ-ব্যাপারে আমার সঙ্গে সে কখনও আলোচনা করেনি। আর নীলাঞ্জন? তার মতো কষ্ট আমাকে কেউ দেয়নি। এই পৃথিবী সম্বন্ধে নীলাঞ্জনের কোনও ধারণা ছিল না। একটা বানানো ইউটোপিয়ায় নীলাঞ্জন বাস করত। সংসার চালানো, মেয়ে মানুষ করা সবটাই ছিল আমার দায়িত্ব। এইভাবে তো সারা জীবন চলতে পারে না। সুবীর আমাকে সেই ভয়ঙ্কর নরকের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। সোহিনীও এখন আমাকে ভুল বুঝছে। ও যদি কোনো স্বাভাবিক ছেলেকে ভালবেসে বিয়ে করে বা আজকালকার রীতি অনুযায়ী বিয়ে না করে তার সঙ্গে বসবাস করে আমার কিচ্ছু বলার নেই। বরং আমি তার জন্য সমস্ত রকম সাহায্য করতে রাজি আছি। কিন্তু যদি দেখি সোহিনী ভুল করছে, একটা নেশাগ্রস্ত ছেলের সঙ্গে জীবনটা জড়িয়ে নিজের ভবিষ্যৎটা নষ্ট করে ফেলছে, তাহলে আমি আপত্তি করব না? আর শিশিরবাবুর কথা বাদ দিতে পারেন। বয়েস হয়ে গেছে বলে ওকে আমরা রিটায়ার করিয়ে দিচ্ছি। তাই আমার ওপর রাগ।'

আবার দূরে, টেবিলের ওপর ফোনটা বেজে উঠল। মন্দাকিনী স্পষ্টতই বিরক্ত হলেন। ফোনটা কিছুক্ষণ বেজে বেজে থেমে গেল। মন্দাকিনী উঠে গিয়ে একটু কড়া গলায় ইন্টারকমে বললেন, 'দশ মিনিট কোনও ফোন যেন আমার কাছে না আসে।'

কাউচে ফিরে এসে মন্দাকিনী খানিক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর বিষণ্ণ গলায় বললেন, 'আপনি নিশ্চয় ভাবছেন এত কথা আপনাকে কেন বলছি। সত্যি বলতে কি, আপনাকে এত কৈফিয়ত দেবার কোনও প্রয়োজন আমার নেই। কিন্তু কি জানেন, এত অর্থ, এত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে মনে হয় আমার সত্যিই কোনও বন্ধু নেই যাকে আমি আমার দিকটাও খুলে বলতে পারি। আপনাকে দেখে হঠাৎ মনে হল কথাগুলো বলা যায়। বিশেষ করে আপনি যেহেতু অন্য দিকটা শুনে এসেছেন। আমাকে কেউ খুন করার চেষ্টা করছে এটা জেনে আমার যত না ভয় করে, দুঃখ হয় তার থেকে অনেক বেশি।'

মন্দাকিনী আবার থামলেন। আদিত্য কী বলবে ভেবে না পেয়ে চুপ করেই রইল। মন্দাকিনী এবার কেজো গলায় বললেন,

'আপনার কাজ মোটামুটি শেষ হয়েছে। আমার যেটা জানার ছিল, জানতে পেরেছি। আপনার ফাইনাল বিলটা সরাসরি আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। আর এটা যেহেতু কোম্পানি এক্সপেন্সে যাবে, আপনার ইনভেস্টিগেশনের একটা ফর্মাল রিপোর্ট আমার দরকার। আমি গত জানুয়ারির ডেটে কোম্পানির তরফ থেকে একটা নিয়োগপত্র আপনাকে পাঠিয়ে দেব।' তারপর একটু হেসে বললেন, 'আমার সত্যি যদি কিছু একটা হয়ে যায়, রিপোর্টটা পুলিশের কাজে লাগবে।'

আদিত্য এতক্ষণ পরে মুখ খুলল, 'রিপোর্ট আপনাকে কিছু দিনের মধ্যেই দিয়ে দেব। কিন্তু তার আগে একটা ছোট্ট কাজ বাকি আছে। যে সলিসিটার ফার্ম সুবীর চৌধুরির উইলটা ড্রাফট করেছে একবার তাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনি একটু ইন্ট্রোডিউস করে দেবেন?'

'ঠিক আছে। আমাদের ব্যক্তিগত এবং কোম্পানিগত সমস্ত কাজ করে সলিসিটর ফার্ম মরগ্যান অ্যান্ড ব্যানার্জি। অনেক বছর ধরে ওদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক। আমি ওদের সিনিয়ার পার্টনার শুদ্ধশীল ব্যানার্জিকে ফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দেব। আমার সেক্রেটারি আপনাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট-এর ব্যাপারে জানিয়ে দেবে।'

'মিস্টার ব্যানার্জির কাছে কি আমার নিজের পরিচয়ে যাব? ওঁকে কি বলব আপনার নিরাপত্তা নিয়ে আমার আশঙ্কার কথা?'

মন্দাকিনী কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, 'আমার মনে হয় মিস্টার ব্যানার্জিকে সব কথা খুলে বলাই ভাল। ওঁর অন্তত আসল সত্যটা জানা দরকার। আর কিছু?'

'না তেমন কিছু নয়, শুধু সামান্য একটা প্রশ্ন। শঙ্খদীপবাবু একটা অভিশাপের কথা বলছিলেন। এটা ঠিক কী হতে পারে আপনার কোনো ধারণা আছে?'

প্রশ্নটা শুনে মন্দাকিনীর মুখে কি একটা চকিত উদ্বেগ খেলে গেল? আদিত্যর মনের ভুলও হতে পারে। মন্দাকিনী শান্তভাবে বললেন,

'একটা পুরোনো অভিশাপের গল্প শুনেছিলাম। সুবীরের কোনও পূর্বপুরুষকে তার পাপকাজের শাস্তি হিসেবে কোনও ব্রাহ্মণ অভিশাপ দিয়েছিলেন। সেই অভিশাপ স্খালনের জন্যই নাকি আমাদের হুগলির বড় কালী মন্দিরটা তৈরি করা হয়। এর বেশি আর কিছু জানি না। তবে সেসব তো কয়েকশো বছর আগেকার ব্যাপার। আজকের দিনে সেসবের আদৌ কোনও গুরুত্ব আছে বলে মনে হয় না। শঙ্খদীপ আপাদমস্তক নেশায় ডুবে থাকে। তাকে অত সিরিয়াসলি নেবার কোনও দরকার আছে কি? আচ্ছা, এবার আমাকে উঠতে হবে। নমস্কার।'

আদিত্যকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে মন্দাকিনী উঠে দাঁড়ালেন।

## (২)

পরের দিন সন্ধে ছ'টা বাজার কিছু আগেই মরগ্যান ব্যানার্জির আপিসে পৌঁছল আদিত্য। তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট সোয়া ছ'টায়, কিন্তু একটু আগে পৌঁছলে ক্ষতি নেই। মরগ্যান ব্যানার্জি কলকাতার প্রাচীনতম সলিসিটর ফার্মগুলোর অন্যতম। এত বছর ধরে কাজ করছে কিন্তু এখনও তাদের সুনামের কিছুমাত্র হানি ঘটেনি। আপিসটা হাইকোর্ট পাড়ায়। একটু গলির ভেতর ঢুকে পুরোনো একটা বাড়ির দোতলা তিনতলা নিয়ে মরগ্যান ব্যানার্জির আপিস। বাড়ির বাইরেটা পুরোনো হলে কী হবে, ভেতরটা একেবারে ঝকঝকে আধুনিক।

ঢুকেই একটা রিসেপশন। সেখানে আদিত্যকে নিজের নাম বলতে হল, আর বলতে হল কার সঙ্গে দেখা করতে চায়। রিসেপশনের মহিলা আদিত্যকে অপেক্ষা করতে বললেন। ঠিক সোয়া ছটাতেই ডাক পড়ল।

মহিলা বললেন, ভেতরে ঢুকে ডানদিকে যে ছোট মিটিং রুমটা আছে সেখানেই মিস্টার ব্যানার্জি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। আদিত্য মিটিং রুমে গিয়ে দেখল সেখানে তখনও কেউ আসেনি। ঘর জুড়ে একটা মস্ত গোল টেবিল, তার চারদিকে চেয়ার। একদিকের দেয়াল জুড়ে একটা স্ক্রিনও আছে, গোল টেবিলের অন্যপ্রান্তে একটা ছোট্ট প্রজেক্টর। আদিত্য একটা চেয়ারে বসল।

মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করার পর শুদ্ধশীল ব্যানার্জি দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলেন। আদিত্য দাঁড়িয়ে উঠতে, বললেন, 'বসুন, বসুন। আমি একটু দেরি করে ফেললুম। একটা ফোন এসে গিয়েছিল। বলুন আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি।'

বিলিতি পোষাক পরা সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ। নিখুঁত টাই-এর নট। কথা বলেন থেমে থেমে। উচ্চারণে পুরোনো কলকাতার টান।

'আমার কথা আপনাকে মিসেস চৌধুরি বলেছেন কি?'

'বিশেষ দরকারে আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান, শুধু এইটুকু বলেছেন। আর বলেছেন, আপনাকে যেন সব রকম সাহায্য করি। কেন দেখা করতে চান, কী সাহায্য চান সেসব ব্যাপারে কিছু বলেননি।'

'তাহলে আমিই বলছি। আমি পেশায় একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ।' আদিত্য নিজের একটা ভিজিটিং কার্ড এগিয়ে দিল। 'সাম্প্রতিক কয়েকটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মন্দাকিনী চৌধুরির সন্দেহ হয়েছে কেউ তাঁকে খুন করার চেষ্টা করছে। এই ব্যাপারে ইনভেস্টিগেশনের জন্য মিসেস চৌধুরি আমাকে নিয়োগ করেছেন। প্রাথমিক তদন্তের পর আমারও মনে হয়েছে মিসেস চৌধুরির সন্দেহটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আপনি তো জানেন, একজন বড় মানুষকে খুন করতে চাওয়ার পেছনে অর্থের লোভটা একটা বড় মোটিভ হতে পারে। তাই সুবীর চৌধুরির উইলটার সম্পর্কে একটু জানতে চাই।'

কথাগুলো শুনে শুদ্ধশীল ব্যানার্জির অভিব্যক্তিতে কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না। এটাই বোধহয় বিলিতি ভব্যতা। বেয়ারা চা নিয়ে এসেছে। শুদ্ধশীল ব্যানার্জি বললেন, 'এটা কিন্তু গ্রীন টি। আপনার চলে তো?'

'চলে, নিশ্চয় চলে। এতো খুব স্বাস্থ্যকর জিনিস।' আদিত্য ভদ্রতা করে বলল। আসলে গ্রীন টি তার দু-চক্ষের বিষ। চা বলতে সে বোঝে দার্জিলিং চা। আসাম চা নয়, মশলা চা নয়, আদা চা নয়, লেবু চা নয়। শুধু সনাতন দার্জিলিং চা। তবে সত্যিকারের ভাল দার্জিলিং চা সে পাচ্ছে কোথায়?

শুদ্ধশীল ব্যানার্জি চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, 'সুবীর চৌধুরির শেষ উইলটা আমিই ড্রাফট করেছিলাম, তাই পুরোটাই মনে আছে। এই শেষ উইলটা মিস্টার চৌধুরি করেছিলেন মারা যাবার কয়েক মাস আগে। শেষ উইলটা একটু অদ্ভুত। উইলে আছে তিনি তাঁর যথাসর্বস্ব তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী মন্দাকিনীকে দিয়ে যাচ্ছেন। মন্দাকিনী যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন এই সম্পত্তি ভোগ করতে পারবেন। তিনি যদি কোনও উইল না করে মারা যান তাহলে সম্পত্তি তাঁর ছেলে শঙ্খদীপ, মেয়ে শঙ্খমালা এবং মন্দাকিনীর আগের পক্ষের মেয়ে সোহিনী এদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। কিন্তু মন্দাকিনী যদি ইচ্ছে করেন তাহলে জীবদ্দশায় উইল করে তিনি তাঁর সম্পত্তি যাকে খুশি তাকে দিয়ে যেতে পারেন। মন্দাকিনী যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন শঙ্খমালা এবং সোহিনীর জন্য একটা সামান্য মাসিক ভাতার ব্যবস্থা থাকবে। ছেলে শঙ্খদীপের জন্য কিছু না।'

'আমার একটা প্রশ্ন আছে।' আদিত্য বাধা দিয়ে বলল, 'সুবীর চৌধুরির যা সম্পত্তি সেটা তো তিনি একা অর্জন করেননি। অনেক প্রজন্ম ধরে এই সম্পত্তি অর্জিত হয়েছে। উত্তরধিকার সূত্রে পাওয়া এই সম্পত্তি থেকে কি সুবীর চৌধুরি তাঁর ছেলেমেয়েদের বঞ্চিত করতে পারেন? শঙ্খদীপ বা শঙ্খমালা কি তাদের পূর্বপুরুষদের দ্বারা অর্জিত সম্পত্তির কোনও অংশই দাবি করতে পারে না?'

'এটা একটা চমৎকার প্রশ্ন করেছেন। গভীর আইনের প্রশ্ন। উত্তরটা বুঝিয়ে বলছি। ধরুন তিনটে প্রজন্ম আছে। ঠাকুরদাদা, বাবা, বাবার দুই ছেলে। ঠাকুরদাদা ব্যবসা শুরু করেছিলেন, সেই ব্যবসা বাবা ঠাকুরদাদার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। পেয়ে সেটাকে তিনি আরও বাড়িয়েছেন। প্রশ্ন, বাবা কি চাইলে সমস্ত

ব্যবসা যে কোনও একজন ছেলেকে, কিংবা দুজনকেই বাদ দিয়ে তৃতীয় কোনও ব্যক্তিকে দিয়ে যেতে পারেন? ছেলেদের কি তাদের ঠাকুরদাদার সম্পত্তিতে কোনও অধিকারই নেই? এর উত্তর হল, বাবা, ঠাকুরদাদার অংশ সুদ্ধু সমস্ত ব্যবসা তাঁর যাকে ইচ্ছে তাকে দিয়ে যাতে পারেন যদি তিনি ঠাকুরদাদার কাছ থেকে ঠাকুরদাদার ব্যবসাটা গিফট হিসেবে পেয়ে থাকেন। কিন্তু যদি স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী হিসেবে তিনি সেই ব্যবসার মালিক হন তাহলে সেই সম্পত্তিতে ছেলেদেরও অধিকার থাকবে। ব্যপারটা কি পরিষ্কার হল?'

'জলের মতো পরিষ্কার। এবার বলুন, চৌধুরিদের ক্ষেত্রে কী হয়েছিল।'

'চৌধুরিদের প্রত্যেকটি প্রধান পুরুষ তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের সব থেকে উপযুক্ত ছেলেটিকে বেছে নিয়ে তাকে প্রায় পুরো ব্যবসাটাই গিফট করে এসেছেন। বাকি ছেলেরা অল্পস্বল্প টাকা পেয়েছে বা কখনো কখনো ছোটখাটো দুয়েকটা ব্যবসাও পেয়েছে। কিন্তু মূল ব্যবসা সব সময় সব থেকে উপযুক্ত চৌধুরিটির হাতে থেকে গেছে। ফলে চৌধুরিদের উত্তরোত্তর শ্রী বৃদ্ধি ঘটেছে। সুবীর চৌধুরিও তার বাবা সুবিমল চৌধুরির কাছ থেকে গিফট হিসেবে ব্যবসা পেয়েছিলেন। তাই সেই ব্যবসা যাকে ইচ্ছে তাকে দিয়ে যাবার পুরো অধিকার তাঁর ছিল।'

'তাহলে মন্দাকিনীর পর সম্পত্তি কে পাবে সেটা মন্দাকিনী ঠিক করতে পারবেন?'

'একদম তাই। আইনত সম্পত্তিটা যেহেতু মন্দাকিনীর তাই তিনি উইল করে যাকে ইচ্ছে তাকে সম্পত্তি দিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি উইল না করে মারা যান, সমস্ত সম্পত্তি শঙ্খমালা, শঙ্খদীপ এবং সোহিনীর মধ্যে সমানভাবে ভাগ হয়ে যাবে।'

'তার মানে, মন্দাকিনী ইচ্ছে না করলে শঙ্খদীপ বা শঙ্খমালা সুবীর চৌধুরির সম্পত্তির কোনও অংশই পাবে না।'

'কথাটা প্রায় ঠিক, পুরোটা নয়। যদি মন্দাকিনী আবার বিয়ে করেন বা কারও সঙ্গে কোনও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন, তাহলে তিনি সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা হারাবেন। এবং সেক্ষেত্রে সোহিনী, শঙ্খমালা আর শঙ্খদীপের মধ্যে সম্পত্তি সমান ভাগে ভাগ হয়ে যাবে।'

'উইলের শর্তগুলো সঠিকভাবেসকলে জানে কি?'

'কে কতটা সঠিকভাবে জানে বলতে পারব না। সুবীর চৌধুরি বারবার উইল বদলেছেন। সোহিনী পুরোনো উইলের শর্তগুলো জানত, নতুন উইলটা হয়তো ভাল করে জানে না। শঙ্খদীপ আমার কাছে কখনও আসেনি, তাই সে কতটা জানে বলতে পারব না। শঙ্খমালা কিছুদিন আগে এসেছিল, তাকে কিছুটা বুঝিয়ে বলেছি। আর মন্দাকিনী চৌধুরি, বলাই বাহুল্য, সবটাই জানেন।'

'মন্দাকিনী কি কোনও উইল করেছেন?'

'এখন অব্দি করেননি।'

'শেষ প্রশ্ন। মন্দাকিনী কোনও পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লেন কিনা কে ঠিক করবে?'

'এই দায়িত্বটা সুবীর চৌধুরি মরগ্যান অ্যান্ড ব্যানার্জির ওপরেই দিয়ে গেছেন।'

## (৩)

মরগ্যান ব্যানার্জির আপিস থেকে বেরিয়ে আদিত্য হাতঘড়ির দিকে তাকাল। এখনও আটটা বাজেনি। এত তাড়াতাড়ি মেসে ফিরে লাভ নেই। তাহলে কোথায় যাবে? অমিতাভদের বাড়ি যাওয়া যেত, কিন্তু তার জন্য একটু দেরি হয়ে গেছে। বরং খানিকটা হাঁটা যাক। হাঁটতে হাঁটতে চিন্তা করা যাক। আদিত্য আকাশবাণী ভবনের দিকে হাঁটতে শুরু করল। বিবাদী বাগ অঞ্চলটা বেশ ফাঁকা হয়ে গেছে। আদিত্য আকাশবাণী ভবনে পৌঁছবার আগেই ডান দিকে বাঁক নিল, ইচ্ছে, গঙ্গার ধারে কিছুক্ষণ বসবে। যত গঙ্গার দিকে হাঁটছে তত দক্ষিণের হাওয়াটা জোরদার হচ্ছে। গঙ্গার ধারে পৌঁছে দেখল সেখানে এতহাওয়া, যে দাঁড়ানো যাচ্ছে না।

মন্দাকিনী চৌধুরির কেসটা তো শেষই হয়ে গেল। আদিত্য একটা মোটা বিল পাঠিয়ে দেবে, মনে হয় মঞ্জুরও হয়ে যাবে সেটা। পেট ভরল। কিন্তু মনটা ভরল না। আসল রহস্যটাই রহস্যই থেকে গেল। কে মন্দাকিনী চৌধুরিকে খুন করতে চাইছে? আদৌ কি কেউ চাইছে? দু'একটা খটকা আছে, যার উত্তর আদিত্য এখনও পায়নি। আদিত্যর সমস্যা হল তার ইন্টুইশন তাকে সতর্ক করে দেয় কোথাও একটা খটকা আছে। কিন্তু খটকাগুলো যে ঠিক কী, সেটা বোঝার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়। মন দিয়ে ভাবতে হয়। ঘটনাগুলো মনে করতে হয়। কে কী বলেছিল সেগুলোও মনে করতে হয়। ফলে অনেকটা সময় লেগে যায়।

আদিত্যর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ থেকে সে খেয়াল করছিল দুটো ছেলে তার পেছন পেছন আসছে। প্রথমে সে ততটা পাত্তা দেয়নি। তারপর রাস্তাটা যত নির্জন হয়ে এসেছে, ততই সে নিশ্চিত হয়েছে ছেলে দুটো তারই পিছু নিচ্ছে। এখন সে টের পেল ছেলে দুটো একেবারে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, ঘাড়ের ওপর তাদের নিশ্বাস পড়ছে। রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা। শুধু অনেক দূরে নদীর ওপর মাঝিদের নৌকোর আলোগুলো ঢেউএর তালে তালে দুলছে। আদিত্য ঘুরে দাঁড়াল। ছেলেদুটোর পরনে জিনস-টিশার্ট। কাপড় দিয়ে তারা তাদের মুখগুলো ঢেকে রেখেছে। আদিত্য বিপদের গন্ধ পেল। কিন্তু এখন আর দৌড়ে পালানো যাবে না। একজন বলল,

'মন্দাকিনী চৌধুরির কেসটা ছেড়ে দে, নইলে জানে মেরে দেব।' তার উচ্চারণে অবাঙালি টান। অন্যজন বলল,

'অ্যায়সা নেহি ঘুসেগা খোপড়িমে, থোড়া সা সিখলানা পড়েগা।' দ্বিতীয় জনের হাতে হঠাৎ একটা ছুরি ঝলসে উঠল।

আদিত্য চকিতে ছেলেটার ছুরিসুদ্ধু হাতের কবজিটা এক হাতে ধরে অন্য হাত দিয়ে উল্টোদিকে মোচড় দিল। মট করে একটা শব্দ হল। ছুরিটা মাটিতে পড়ে গেল। ছেলেটার মুখের কাপড়টা খসে পড়ল। একটা অশ্রাব্য গালাগাল দিয়ে ককিয়ে উঠল সে। আদিত্য বুঝল তার কব্জির হাড়টা নিশ্চিতভাবে ভেঙেছে। অন্য ছেলেটা ইতিমধ্যে তার হাতের ছোট লাঠিটা আদিত্যর মাথা লক্ষ করে সজোরে চালিয়েছে। আদিত্য যখন সেটা খেয়াল করল তখন একটু দেরি হয়ে গেছে। সে তার মাথাটা পুরোপুরি সরিয়ে নিতে পারল না। লাঠিটা তার কপালের একদিকে আঘাত করল। যন্ত্রণাটা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল আদিত্যর সারা শরীরে। সে মাটিতে উবু হয়ে বসে পড়ল। তারপর হঠাৎ স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে উঠে ছেলেটার তলপেটে একটা লাথি কষাল। লাথি খেয়ে ছেলেটা একটু কুঁজো হয়ে যেতেই তার মুখের ওপর থেকেও কাপড়টা সরে গেল। আদিত্য তার নাকের ওপর একটা ঘুষি মারল। ঘুষির জোরে নিজের হাতটাই ঝনঝন করে উঠল আদিত্যর। সে দেখল ছেলেটার নাক দিয়ে অঝোর ধারায় রক্ত ঝরছে।

ছেলে দুটো পালাচ্ছে। আদিত্য একবার ভাবল ওদের পিছু ধাওয়া করে। তারপর মনে হল সেটা করে লাভ নেই। যুদ্ধে তো তারই জয় হয়েছে। এখন তার নিজের ক্ষতস্থানের শুশ্রুষা করা দরকার। সে টের পেল তার কপাল দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। রুমাল দিয়ে রক্তের ধারা আটকানো যাচ্ছে না। পা দুটো কাঁপছে। দাঁড়ানো যাচ্ছে না। মাথাটা দপদপ করছে। আদিত্য মাটিতে বসে পড়ে পকেট থেকে কোনও রকমে মোবাইলটা বার করল। অমিতাভর নম্বরটা ডায়াল করল। বলল, গঙ্গার ধারে তার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। এখানে ট্যাক্সি পাওয়া যাচ্ছে না। অমিতাভ যেন তাড়াতাড়ি এসে তাকে নিয়ে যায়। জায়গাটা ঠিক কোথায় সেটাও যতটা পারে বুঝিয়ে বলল। আধঘণ্টা পরে অমিতাভ আর রত্না যখন গাড়ি নিয়ে আদিত্যর কাছে পৌঁছল তখন সে রাস্তার ওপর নিথর হয়ে শুয়ে আছে। জ্ঞান নেই।

মোটামুটি সুস্থ হতে আদিত্যর কয়েকটা দিন লেগে গেল। মাথায় একটা ছোট ব্যান্ডেজ অবশ্য রয়ে গেছে। অমিতাভ-রত্না তাকে এখনও মেসে ফেরত যেতে দেয়নি। আদিত্য ওদের প্রথমে গুল মেরেছিল হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে ফুটপাথে কপালটা ঠুকে গেছে। ওরা প্রায় বিশ্বাসও করে নিয়েছিল। কিন্তু স্টিচ কাটার সময় ডাক্তারবাবু যখন বললেন, 'দেখে তো মনে হচ্ছে লাঠি বা ভোঁতা এবং ভারী কোনও জিনিস দিয়ে আপনার মাথায় আঘাত করা হয়েছিল, কী করে এসব বাঁধালেন?' তখন দুজনেই, বিশেষ করে রত্না, আদিত্যকে প্রশ্নবাণে একেবারে পেড়ে ফেলল। সত্যি কথাটা না বলে আদিত্যর আর কোনও উপায় রইল না। রত্না তাকে বারবার বলল, দরকার হলে তুই ইস্কুল মাস্টারি কর আদিত্য। না জুটলে ভিক্ষে কর। এসব গুন্ডামি তোর পরিবারে কেউ কখনও করেনি। স্রেফ শুনে যাওয়া ছাড়া আদিত্য আর কী করবে? সে অবশ্য বলতে পারত তার পরিবারে ইস্কুল মাস্টারি কিংবা ভিক্ষেও কেউ কখনও করেনি।

পরদিন সকালে সোহিনীর ফোন। 'অমিতাভদার কাছে শুনলাম আপনি অসুস্থ। ওদের বাড়িতেই আছেন। আজ একটু বেলায় গেলে দেখা পাব?'

'ক'টায় আসবেন?'

'ধরুন, এই বারোটা নাগাদ।'

'চলে আসুন। বাড়িতেই থাকব।'

অমিতাভ, রত্না দুজনেই দশটা নাগাদ কাজে বেরিয়ে যায়। তাদের ছেলে টুপলু ইস্কুলে বেরোয় আরও ঘণ্টা খানেক আগে। সোহিনী যখন এল তখন বাড়িতে আদিত্য একাই রয়েছে।

'অমিতাভদা বললেন আপনার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। কী করে হল?' সোহিনী বসতে বসতে বলল।

'আপনাকে বলতে বাধা নেই, অ্যাক্সিডেন্ট নয়, দুটি গুন্ডা আমার ওপর চড়াও হয়েছিল। মন্দাকিনী চৌধুরির কেসটা থেকে সরে না দাঁড়ালে পরিণাম আরও ভয়ঙ্কর হবে বলে শাসিয়ে গেছে। ওরা নিশ্চয় জানত না মন্দাকিনী নিজেই আমাকে কেসটা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন।'

'দ্বিতীয় খবরটা জানতাম। মা নিজেই বলল যা জানার তা জানা হয়েছে। আর গোয়েন্দার দরকার নেই। আপনি মাকে বলেছেন মার নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তার কারণ আছে। মা আপনার কাছে নাকি একটা রিপোর্টও চেয়েছে। সেসব তো হল। কিন্তু গুন্ডা চড়াও হবার ব্যাপারটা তো সাংঘাতিক। আমি এটার কিছুই জানতাম না। মাও জানত না।'

'এবার তো জানলেন। আপনি আপনার মাকেও প্লিজ একটু জানিয়ে দেবেন। এমনিতে ব্যাপারটা এমন কিছু নয়। বলতে পারেন প্রফেশানাল হ্যাজার্ড। কিন্তু গত কয়েকটা দিন একেবারে অকেজো হয়ে গিয়েছিলাম। তাই রিপোর্টটা তৈরি করে উঠতে পারিনি। এটা আপনার মাকে জানানো দরকার।'

'আমি নিশ্চয় বলব। কিন্তু আপনি আগে সেরে উঠুন।'

'বলতে পারেন নব্বই ভাগ সেরে উঠেছি। বাকিটা কাজ শুরু করলে আস্তে আস্তে হয়ে যাবে। মুস্কিল হচ্ছে, অমিতাভ-রত্না কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না। বলছে, অন্তত এক মাস ওদের এখানে থেকে যেতে হবে। ল্যাপটপটাও সঙ্গে নেই। থাকলে রিপোর্ট লেখার কাজটা শুরু করে দিতে পারতাম। কফি খাবেন?'

'আপনি করবেন?'

'হ্যাঁ, আমিই করব। করছি আজকাল মাঝেমাঝে। তবে দুধ-চিনি ছাড়া ব্ল্যাক কফি। কলম্বিয়ান কফি। অমিতাভ কোথা থেকে যেন নিয়ে এসেছে। চমৎকার। খেয়ে দেখতে পারেন।'

আদিত্য খাবার টেবিলে দুটো ফাঁকা কফির কাপ রাখল। কফির কৌটো থেকে কাপে কফি দিল। গরম জল ঢালতে ঢালতে খেয়াল করল সোহিনী পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

'আরও একটা কথা আপনার মাকে বলবেন। গুন্ডাদের আক্রমণে এটা আরও বেশি করে প্রমাণিত হচ্ছে যে আপনার মায়ের অ্যাক্সিডেন্টগুলো ঠিক অ্যাক্সিডেন্ট নয়। ওগুলো ঘটানো হয়েছে। এবং কেউ একজন চাইছে না আমি মন্দাকিনী চৌধুরির কেসটা ঘাঁটাঘাঁটি করি। আপনার মাকে সাবধানে থাকতে বলবেন।'

কথা বলতে বলতে ওরা কফির কাপ হাতে আবার বসার জায়গায় ফিরে এসেছে।

'সত্যিই চমৎকার কফি।' সোহিনী কাপে চুমুক দিয়ে বলল।

'সেদিন যখন দেখলাম আপনিই গাড়ি চালিয়ে আপনার মাকে নিয়ে অফিসে ঢুকলেন, ভেবেছিলাম আপনার মার ঘরে আপনাকেও দেখতে পাব।'

'আরে না না। মার ফেরারিটা আমি পারত পক্ষে চালাই না। এই শহরে ফেরারি চালাতে খুব ভয় করে। কখন কোথায় ধাক্কা লেগে যাবে। ওটা শৈলেনবাবুই চালান। কিন্তু সেদিন শৈলেনবাবু ছুটি নিলেন। মা তো ফেরারি আর কারও হাতে ছাড়বে না। অগত্যা আমাকেই আসতে হল। মাকে অফিসে নামিয়ে দিয়েই আমি চলে গেছি। একটা জরুরি কাজ ছিল। আবার সাতটার সময় ফিরে এসে মাকে নিয়ে ক্লাবে গেলাম। ততক্ষণে আপনি চলে গেছেন।'

'আপনি চালালে আপনার মা নিরাপদ বোধ করেন?' আদিত্য ঠাট্টার গলায় বলল।

'নিরাপদ বোধ করে কিনা জানি না, তবে নিঃসন্দেহে আরাম বোধ করে।'

'ঠিক বুঝতে পারলাম না।' আদিত্যকে খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বলল।

সোহিনী হাসল। বলল, 'বোঝার কথা নয়। এর পেছনে একটা ইতিহাস আছে। আমি তখন খুব ছোট, মা ফুলটাইম আভিনয় করে, সুবীর চৌধুরি তখনও সিনে আসেননি। একবার স্টেজ রিহার্সালের সময় মা একটা উঁচু জায়গা থেকে পড়ে যায়। বাঁ হাঁটুতে আঘাত লাগে। তার থেকে আর্থারাইটিস দাঁড়িয়ে গেছে। মা বাঁ হাঁটুটা ভাল করে ভাঁজ করতে পারে না। তাই গাড়িতে উঠে বাঁ পা-টা ছড়িয়ে বসতে হয়। সামনে বসলে সেটা সব থেকে ভাল করে করা যায়। আমি গাড়ি চালালে মার সামনে বসতে আপত্তি নেই। পা-টা ছড়িয়ে দিয়ে বেশ আরাম করে সামনে বসে। কিন্তু ড্রাইভার গাড়ি চালালে তার পাশে বসতে মা রাজি নয়। তখন পেছনেই বসতে হয়। অনেকটা জায়গা নিয়ে বাঁ পা-টা ছড়িয়ে মা পেছনে বসে।'

'বুঝলাম।' একটু থেমে আদিত্য বলল, 'নন্দনের গান কেমন চলছে? সেদিন কিন্তু যে বেহাগটা শুনলাম, গত দশ বছরে কলকাতার অডিয়ান্স ওরকম বেহাগ শুনেছে বলে মনে হয় না। আমি অন্তত শুনিনি।'

'আপনাদের আশীর্বাদে নন্দন এখন দু-একটা প্রোগ্রাম পাচ্ছে। ভোপালে আগামী মাসে একটা প্রোগ্রাম আছে। হয়তো পুনেতেও একটা পেতে পারে, কথাবার্তা চলছে। নন্দনের গুরুজি বেঁচে থাকলে আর একটু সুবিধে হত, কিন্তু তিনি তো অকালে চলে গেলেন। কী আর করা যায়।'

সোহিনী উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আজ উঠি। বেশি স্ট্রেন করবেন না। তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠুন। আমি মাকে সব বলে দেব। বাই।'

একটু পরে মন্দাকিনী চৌধুরি নিজে ফোন করলেন। গলায় উদ্বেগ। আদিত্যকে সাবধানে থাকতে বললেন। আদিত্য বলল তার আঘাত অতি সামান্য। চিন্তার কারণ নেই।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

(১)

সকালে অমিতাভর গাড়িতে গিয়ে আদিত্য ল্যাপটপটা মেস থেকে নিয়ে এসেছে। মেসের ম্যানেজার কেবলে এসেছে সে আরও সপ্তাহ খানেক বাদে ফিরবে। কীভাবে কেজানে মেসে খবর রটে গিয়েছিল যে আদিত্যর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, সে বন্ধুর বাড়িতে আছে। তাকে দেখে, বিশেষ করে তার মাথায় ব্যান্ডেজটা দেখে, ম্যানেজারের হাজার প্রশ্ন। আদিত্যর বিরক্ত লাগছিল। লোকটার এক ফোঁটা আন্তরিকতা নেই। শুধু কায়দা করে জানতে চাইছে আদিত্য মেসের টাকাটা কবে দেবে। চাইলে সেদিনই আদিত্য মেসের পাওনাটা চুকিয়ে দিতে পারত, কিন্তু লোকটার হাবভাব দেখে এত রাগ হয়ে গেল যে সে কাটা কাটা কয়েকটা উত্তর দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। বেরিয়েই দেখে দরজার সামনে মুখ চুন করে বলরাম দাঁড়িয়ে আছে। মেসের মধ্যে এই একটা লোকই যা তার জন্য একটু ভাবে।

আদিত্যকে দেখে বলরাম এগিয়ে এল, 'কী কাণ্ড বাঁধিয়েছো গো। আমি তো ভেবে মরি। সবাই বলল তোমাকে নাকি হাসপাতালে নিয়ে গেছে। লরি ধাক্কা মেরেছিল নাকি?'

'লরি-টরি নয় রে, রাস্তায় হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে মাথা ফাটিয়েছি। এখন প্রায় সেরেই গেছি বলতে পারিস। মেসে আজই ফিরে আসতাম, বন্ধু আসতে দিচ্ছে না। সামনের সপ্তাহে চলে আসব।'

'এত তাড়াতাড়ি আসার কী আছে? কদিন সেখানে থেকে শরীরটা সারিয়ে এস না হয়। এখানে খাবার-দাবারের যা ছিরি, এখানে এলে পথ্যি হবে কী করে?'

'আমার বন্ধুও তাই বলছে। দেখি কী করা যায়। তুই শোন। এই টাকা কটা রাখ। এমাসে বাড়িতে এখনও টাকা পাঠানো হয়নি তো?'

'টাকা পাঠানো পালিয়ে যাবেনি। তুমি এখন টাকা রাখ। তোমার দরকার হবে। ফিরে এসে দিও।'

বলরাম চলে যাচ্ছিল, কী মনে করে ফিরে এল। বলল, 'তোমার সঙ্গে দেখা করতে একজন বাবু এসেছিল। বলল, তোমাকে কিছুতেই মোবাইলে পাচ্ছে না। খুব দরকার। একটা চিঠি দিয়ে গেছে।'

বলরাম শার্টের বুক পকেট থেকে একটা দোমড়ানো কাগজ বার করে আদিত্যর হাতে দিল। আদিত্য দেখল স্যমন্তকদের দলের সুদীপ্ত চিঠি লিখেছে। সুদীপ্ত লিখেছে,

আদিত্যবাবু, আপনাকে কিছুতেই ফোন করে পাচ্ছি না। তাই ঠিকানা খুঁজে মেসে চলে এলাম। এসে শুনলাম এখানেও আপনি নেই। আপনার নাকি একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। বন্ধুর বাড়িতে আছেন। আমি নীলাঞ্জন মৈত্রর ডেরার সন্ধান পেয়েছি। সেটা জানাতেই এখানে আসা। সুস্থ হলে ফোন করবেন। ইতি সুদীপ্ত।

আদিত্যর মনটা হঠাৎ খুশিতে ভরে গেল। কেন, আদিত্য জানে। নীলাঞ্জন মৈত্রকে না দেখলে মন্দাকিনী চৌধুরির ছবিটা সম্পূর্ণ হবে না। বলরামের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আদিত্য গাড়িতে উঠে পড়ল।

বিকেলের দিকে সে বসে বসে ল্যাপটপে রিপোর্টটা টাইপ করছে এমন সময় মোবাইল বেজে উঠল। গৌতম ফোন করছে। গৌতম দাশগুপ্ত, আইপিএস, আদিত্যর সঙ্গে কলেজে পড়ত, এখন কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট কমিশনার, ক্রাইম। হ্যালো বলতেই ওপাশ থেকে গৌতমের গমগমে গলা,

'ব্যাপারটা কী? তোর তো পাত্তাই নেই। আছিস কেমন?'

'ভাল নেই। কিছুদিন আগে গুন্ডারা ঠেঙিয়েছে। আপাতত মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে অমিতাভদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি।' আদিত্য নিরীহ গলায় বলল।

'সে কী রে? তোকে গুন্ডারা ঠেঙিয়েছে? তুই তো আমাদের সময় বক্সিং-এ ইন্টারকলেজ চ্যাম্পিয়ান ছিলি। কুং ফু, তাই কোয়ান ডো এসবও শিখেছিলি তো। তোকে গুন্ডারা ঠেঙালো?' গৌতমের গলায় অকৃত্রিম বিস্ময়।

'বুড়ো হয়ে যাচ্ছি রে। রিফ্লেক্স চলে যাচ্ছে। মহাভারতের সেই জায়গাটা মনে নেই? যেখানে অর্জুন বুড়ো হয়ে গেছে। গাণ্ডীব তুলতে পারছে না। তার সামনে দিয়ে সাধারণ দস্যুরা সুভদ্রাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে।'

'খুব মনে আছে। এটা নিয়ে বিষ্ণু দের একটা কবিতা ছিল, সেটাও মনে আছে।' কলেজ জীবনে গৌতম খুব কবিতা পড়ত। লুকিয়ে লুকিয়ে লিখতও এক-আধটা। তখন কেউ ভাবতেই পারেনি সে ভবিষ্যতে পুলিশের বড় কর্তা হবে।

'তোকে আমিই ফোন করতাম। ওই গুন্ডাগুলোর একটা হদিশ করা দরকার। জানা দরকার কে তাদের পাঠিয়েছিল। কিন্তু এই গুন্ডাদের পেছনে একটা ইতিহাস আছে। আগে সেটা তোকে বলতে চাই। তুই অমিতাভদের বাড়িতে একদিন সন্ধের দিকে আয় না। আমি আরও সপ্তাহ খানেক এখানে আছি। কাজের কথাও হবে, আড্ডাও মারা যাবে।'

'যেতে হলে তো আজকেই যেতে হয়। মালিনী মেয়েকে নিয়ে ক'দিনের জন্য দিল্লি গেছে, কাল ফিরবে। মেয়ে-বউ ফিরে এলে সন্ধেবেলা বেরোনোটা শক্ত হয়ে যাবে। আমি বরং আজই যাব। তবে যেতে যেতে আটটা হয়ে যাবে।'

'চলে আয় তাহলে। আমি অমিতাভ আর রত্নাকে বলে রাখব।'

(২)

আজ অনেকদিন পরে আদিত্য আপিসে এসেছে। আদিত্য যখন অমিতাভ-রত্নাদের বাড়িতে একটু একটু করে সেরে উঠছে তখন আপিস ঘরটা বন্ধই পড়েছিল। গতকাল সন্ধেবেলা মেসে ফিরে এসেছে আদিত্য। ফিরে বিমলকে ফোন করেছিল। বিমলকে বলেছে সে যেন আজ আদিত্যর সঙ্গে আপিসে এসে দেখা করে। এতদিন বন্ধ পড়েছিল বলে ঘরের ভেতরে একটা দম চাপা গন্ধ হয়েছে। আদিত্য রাস্তার দিকের জানলাগুলো খুলে দিল। আর অমনি বেলা এগারোটার কর্মচঞ্চল বউবাজার স্ট্রিটটা যেন ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল।

টেবিলের ওপর বেশ ধুলো জমেছে। মেঝেতেও ধুলো। জমাদারটা ফাঁকি মেরেছে ক'দিন, বোঝাই যাচ্ছে। ওর কাছে চাবি দেওয়া আছে, চাবি খুলে ওর রোজ ঘর পরিষ্কার করার কথা। কাল তাড়াতাড়ি এসে ওকে ধরতে হবে। মন্দাকিনী চৌধুরির কেসটা তো শেষই হয়ে গেল। কিন্তু সত্যটা ঠিক জানা হল না। রিপোর্টটা অনেকখানি লেখা হয়ে গেছে। কিন্তু পুরো সত্যটা না জানলে সে রিপোর্টটা শেষ করবে কী করে? তাছাড়া সত্য জানার কিছু খরচ এখনও বাকি আছে। অর্থাৎ কিছু খরচসাপেক্ষ তদন্ত এখনও বাকি। তাই আদিত্য খরচের বিলটাও জমা দিতে পারছে না। এদিকে মন্দাকিনীর সেক্রেটারি ফোন করে রিপোর্টের জন্য তাগাদা দিয়েছে। রিপোর্টের জন্য এত তাড়া কীসের? এখনও অনেক কাজ বাকি আছে। তার মধ্যে একটা বড় কাজ নীলাঞ্জন মৈত্রর সঙ্গে দেখা করা।

গৌতমের ফোন এল বিকেলের দিকে।

'তোর গুন্ডারা মনে হয় ধরা পড়েছে। দেখছি, একজনের হাতে প্লাস্টার, আর একজনের নাকে ব্যান্ডেজ। ভালোই প্যাঁদানি খেয়েছে তোর কাছে। তুই এদের দেখলে চিনতে পারবি?

'মনে হয় পারব।'

'তাহলে লালবাজার চলে আয়। কতক্ষণে আসতে পারবি?'

'আপিসে আছি। মিনিট দশেকে পৌঁছে যাচ্ছি।'

মস্তান দুটি মানিকজোড়, নাম হীরা-মোতি। ছিঁচকে গুন্ডা, ইংরেজি করে বললে, স্মলটাইম ক্রুক। আদিত্য তাদের এক ঝলক দেখেই চিনতে পারল। গুন্ডা দুজন আদিত্যর দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল আবার।

আদিত্য গৌতমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এনারাই সেই দুই মহাত্মা। আমি একশ ভাগ নিশ্চিত ওরাই আমাকে গঙ্গার ধারে অ্যাটাক করেছিল। কে ওদের পাঠিয়েছিল কিছু বলেছে?'

'বলছে, কালো চশমা পরা মাথায় ঢেউ খেলানো বাবরি চুলওলা একটা লোক ওদের হায়ার করেছিল। লোকটাকে ওরা চেনে না। লোকটা ওদের এক পরিচিতের নাম বলে ওদের সঙ্গে দেখা করে। সেই পরিচিতকে আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে বলছে, ওরকম কোনও লোককে সে হীরা-মোতির কাছে পাঠায়নি। যাই হোক, কালো চশমা পরা বাবরি চুলের লোকটি হীরা-মোতিকে কাজটা করার জন্য কিছু অগ্রিম টাকা দিয়েছিল। বেশ ভাল টাকা। বলেছিল, কাজ শেষ হয়ে গেলে আরও দেবে। তবে সাবধান করে দিয়েছিল শুধু পেটাই করতে হবে। খুনোখুনি যেন কিছুতেই না হয়। আর বলেছিল যাকে পেটাই করতে হবে সে অতি নিরীহ একজন লোক, অতএব কাজটাতে ঝক্কি কিছু নেই। তাই ওরা যন্ত্র সঙ্গে রাখেনি। শুধু ছুরি আর ছোট লাঠি নিয়ে বেরিয়েছিল। হীরা বলছে, সে ছুরি বার করেছিল শুধু ভয় দেখাবার জন্য, মারার জন্য নয়। হীরাকে জখম দেখে মোতি লাঠি চালিয়েছে।'

আদিত্যর চকিতে মনে পড়ে গেল জনৈক কালো চশমা, ঘাড় পর্যন্ত চুলওলা লোক তার আপিসে এসে তার খোঁজ করছিল। আগরওয়াল যাকে ভাগিয়ে দিয়েছিল। এই বাবরি চুল কি সেই বাবরি চুল? সে মুখে বলল, 'কালো চশমা বাবরি চুলের কোনও হদিশ পাওয়া যাচ্ছে?'

'নাঃ। মনে হয় পাওয়াও যাবে না। বলাই বাহুল্য লোকটা ছদ্মবেশে ছিল।'

'এদের থার্ড ডিগ্রি করে আর কিছু যদি বার করতে পারিস জানাস।'

(৩)

হাওড়া থেকে কর্ড লাইনে বর্ধমান যাবার ট্রেনে উঠে তিনটে স্টেশন পেরোলেই ডানকুনি। ডানকুনির পর গোবরা আর গোবরা এলেই সতর্ক হয়ে যেতে হবে। কারণ তার পরের স্টেশন জনাই রোডে নেমে পড়া দরকার। স্টেশনে নেমে সাইকেল রিক্সা ধরে চণ্ডীতলার জমিদার বাড়ি অব্দি যেতে বেশিক্ষণ লাগার কথা নয়। সেখানে পৌঁছে জিজ্ঞেস করতে হবে লক্ষ্মী সাঁতরার বাড়িটা কোথায়। বাড়িটা নীল রঙের, তিনতলা। সেই বাড়ির একতলায় নীলাঞ্জন মৈত্র ভাড়া থাকেন। সুদীপ্ত নীলাঞ্জনের ফোন নম্বরটা জোগাড় করে দিয়েছিল। বাড়ির হদিশটাও। কিন্তু ফোন না করে তো কারও বাড়ি যাওয়া যায় না, বিশেষ করে বাড়ির অধিবাসী যদি নীলাঞ্জন মৈত্রের মতো সমাজ-সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ হন।

ফোনে আদিত্য বলেছিল সে চৌধুরি পরিবারের ওপর একটা বই লিখছে, যে বই-এ মন্দাকিনী চৌধুরি একটি মুখ্য চরিত্র। নীলাঞ্জন মৈত্র যদি মন্দাকিনীর প্রথম বিবাহিত জীবন নিয়ে দু'চার কথা বলেন তাহলে আদিত্যর খুব উপকার হয়।

'কিন্তু আমার তাতে কী উপকার হবে?' নীলাঞ্জন খেঁকিয়ে উঠেছিল।

আদিত্য অবশ্য এই ধরনের প্রতিক্রিয়ার জন্য সম্পূর্ণ তৈরি ছিল। সে বিনীতভাবে বলেছিল, 'যদি কিছু মনে না করেন তো বলি, আপনার সময়ের জন্য আমি কিছু টাকা দিতে রাজি আছি। দু'হাজার দিলে কি ঠিক হবে?'

'শুনুন। আমি আপনাকে আধঘণ্টা সময় দেব। এবং তার জন্য আপনি আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই। যে প্রশ্নগুলো উত্তর দেবার যোগ্য মনে করব, শুধু সেই প্রশ্নগুলোরই উত্তর দেব। আমার এই শর্তে রাজি থাকলে আপনি সামনের রবিবার সকাল দশটায় আমার বাড়ি চলে আসতে পারেন।'

রাজি না হয়ে আদিত্যর উপায় কী?

আদিত্য এখন নীলরঙের তিনতলা বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ঠান্ডা মফস্বলে রবিবারের সকাল। রাস্তার ধার দিয়ে দু-একটা রিক্সা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে লরি। এ-রাস্তায় মনে হয় বাস-টাস চলে না। বাড়িটার সামনে রাস্তার ওপর একটা নিমগাছ ডালপালা মেলে দিয়েছে। ডালপালার ভেতর দিয়ে ঝিরঝিরে হাওয়া

দিচ্ছে। বাড়িটার পাশে একটা সাইকেল সারাই-এর দোকান, একটা ভাতের হোটেল, একটা ছাঁট লোহার আড়ত। আদিত্য ভাবছিল, কতদিন কলকাতার বাইরে আসা হয় না, তবু এই নীলাঞ্জন মৈত্রের সঙ্গে দেখা করার অজুহাতে একটু বেড়ানো হল। বস্তুত, কর্মসূত্রে এদিকটায় না এলে এমন নিরাভিমান জায়গাটা দেখাই হত না। একটা চায়ের দোকান থাকলে দাঁড়িয়ে এক কাপ চা খাওয়া যেত, কিন্তু ধারে কাছে কোথাও চায়ের দোকান চোখে পড়ল না।

আদিত্য যখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব ভাবছে, হঠাৎ নীলবাড়ির একতলার একদিকে একটা দরজা খুলে গেল। পাজামা-পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। একটু দূর থেকে আদিত্যকে দেখে চেঁচিয়ে বললেন, 'আপনিই আদিত্য মজুমদার? কলকাতা থেকে আপনারই আসার কথা ছিল?'

কথা বলতে বলতে ভদ্রলোক আদিত্যর কাছে এগিয়ে এসেছেন। ছিপছিপে মেদহীন দেহ, একমাথা উস্কোখুস্কো চুল, মাঝারি উচ্চতা, হাড়ালো লম্বাটে মুখ, গালে চাপ দাড়ি, চোখে পুরু কাচের চশমা।

'হ্যাঁ আমিই আদিত্য মজুমদার। আপনি নিশ্চয় নীলাঞ্জনবাবু।' আদিত্য হাত তুলে নমস্কার করল। উত্তরে নীলাঞ্জন মৈত্র নমস্কার করার সৌজন্যটুকুও দেখালেন না। শুধু সংক্ষিপ্তভাবে বললেন, 'ভেতরে চলুন।'

নীলাঞ্জন মৈত্রর ঘরটা নেহাত ছোট নয়, কিন্তু ঘরের দৈর্ঘ্যের তুলনায় জিনিসপত্র অনেক বেশি। অবশ্য জিনিস বলতে মূলত বই। ছাদ পর্যন্ত বই-এর তাক, তাতে ভর্তি বই, এতেও সব বইকে জায়গা দেওয়া যায়নি। বাড়তি বইগুলো কেউ মেঝেতে, কেউ টেবিলের ওপর জায়গা পেয়েছে। এছাড়াও ঘরের একদিকে রয়েছে একটা রেকর্ড প্লেয়ার, যেরকমটা তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে পাওয়া যেত। রেকর্ড প্লেয়ারের আশেপাশে অনেকগুলো রেকর্ড ছড়ানো, প্রতিবাদী সঙ্গীত, পল রোবসন, পীট সিগার্সের পাশে আইপিটিএ-র গান। তার সঙ্গে কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত, বেশিরভাগ দেবব্রত বিশ্বাসের গাওয়া। একদিকের দেওয়াল জুড়ে একটা পুরোনো ক্যানভাস, মনে হয় সেটা এক সময় কোনও নাটকের সেট ছিল। একটা লেখার টেবিল। তার ওপরেও উপুড়-চুপুড় বই। কার্ল মার্কসের ছবি। পাশেই রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তি। এই সবের মাঝে একটা তক্তপোশ, আদিত্য কোনওরকম অনুমতির তোয়াক্কা না করে তার ওপর বসে পড়ল। টাকা দিয়ে যখন সময় কিনছে তখন অকারণ বিনয়ী হবার মানে হয় না। আদিত্যকে নিজের থেকেই বসতে দেখে, নীলাঞ্জনও তক্তপোশের ওপর বসল।

আদিত্য লক্ষ করেছিল টেবিলের ওপর অ্যাস্ট্রেটা উপচে পড়ছে। সে পকেট থেকে সিগারেট বার করে নীলাঞ্জনকে বলল, 'চলবে?' পরে সে নীলাঞ্জনকে একটা সিগারেট দিয়ে নিজে একটা ধরালো।

খানিকক্ষণ নীরবে ধূমপান করার পর আদিত্য বলল, 'আমাদের সময় যেহেতু খুব বেশি নেই, সরাসরি কাজের কথায় আসি। আপনার সঙ্গে মন্দাকিনী চৌধুরির পরিচয় কীভাবে হয়?'

নীলাঞ্জন মনে হয় তৈরি ছিল। বলল, 'আমার সঙ্গে মন্দাকিনীর যখন পরিচয় হয় তখন সে চৌধুরিও ছিল না, মৈত্রও ছিল না। তখন সে ছিল মন্দাকিনী চক্রবর্তী। রিফিউজি বাড়ির মেয়ে, একাত্তরের যুদ্ধের পর পরিবারটা বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে হিলিবর্ডার দিয়ে ভারতে ঢোকে। মন্দাকিনীর বয়েস তখন বছর দেড়েক হবে। ওদের বাড়ি ছিল বাংলাদেশের হাকিমপুরে। সেখানে মন্দাকিনীর বাবা ইস্কুলে পড়াতেন। এপারে এসে কিছুদিন ওরা হিলির কাছেই চাপাহাট বলে একটা জায়গায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে থাকত। তারপর মন্দাকিনীর বাবা বালুরঘাটে একটা ইস্কুলে চাকরি পেয়ে যান। মন্দাকিনী বালুরঘাটেই বড় হয়েছে, সেখান থেকেই ইস্কুল-কলেজ পাশ করেছিল।'

একটু থেমে নীলাঞ্জন আবার শুরু করল। 'আপনার জানা আছে কিনা জানিনা, বালুরঘাটে থিয়েটরের একটা পুরোনো ট্র্যাডিশন আছে। নাট্যকার মন্মথ রায় বালুরঘাটেই থাকতেন, বালুরঘাটের কোর্টে ওকালতি করতেন। মন্দাকিনী বালুরঘাটে ইস্কুলে পড়ার সময় থেকেই অভিনয় শুরু করে। পরে কলেজে উঠে গ্রুপ থিয়েটারে নিয়মিত অভিনয় করত। আমাদের দল একবার বালুরঘাটে শো করতে গেল। যতদূর মনে পড়ছে, কোনও নাট্যোৎসব বা ওই রকম কিছু একটা ছিল। সেখানেই মন্দাকিনীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।'

'তারপর? মন্দাকিনী বালুরঘাট থেকে কলকাতায় এলেন কবে?'

'মন্দাকিনী চক্রবর্তী ছিল অসম্ভব অ্যামবিশাস একটি ক্যারেকটার, সে বালুরঘাটে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবার মতো মেয়ে ছিল না। জীবনের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তিকে ধরে সে সিঁড়ি বেয়ে উঠেছে। আনফরচুনেটলি, তার প্রথম সোপান ছিলাম আমি। কলকাতায় ফিরে আসার কিছুদিন পরেই মন্দাকিনী আমার সঙ্গে যোগাযোগ করল। বলল, সে কলকাতার স্টেজে নাটক করতে চায়। স্বীকার করতেই হবে, মফস্বলের সেই অল্পবয়সি সুন্দরী মন্দাকিনীর প্রতি প্রথম দর্শনেই আমার একটা টান তৈরি হয়েছিল। আমার ভেতরের বোকা পুরুষটা ভাবল, এই অসহায় মেয়েটাকে প্রোটেকশন দেওয়া অতি পবিত্র একটা কর্তব্য। আমি তাকে আমাদের দলে নিয়ে নিলাম। মন্দাকিনী কলকাতায় এসে বাগবাজারের দিকে একটা মেয়েদের হস্টেলে উঠল। নিয়মিত আমাদের নাটকে অভিনয় করতে শুরু করল।'

'সেই সময় মন্দাকিনীর চলত কী করে?'

'খুব কষ্ট করে চলত। কয়েকটা টিউশনি আর ভোরবেলা একটা নার্সারি ইস্কুলে বাচ্চাদের পড়ানোর কাজ। আমি ভাবতাম, নাটকের প্রতি মেয়েটার ডেডিকেশন আছে বটে। শুধুমাত্র নাটক করবে বলে দাঁতে দাঁত চেপে কলকাতায় পড়ে আছে। আসলে, নাটকের জন্য নয়, দাঁতে দাঁত চেপে কলকাতায় পড়ে থেকে মন্দাকিনী তার পরবর্তী সুযোগটার জন্য অপেক্ষা করছিল।'

'মন্দাকিনীর সঙ্গে আপনার বিয়েটা কবে হল?'

আদিত্য দ্রুত নোট নিচ্ছিল। তার মোবাইলের রেকর্ডারটা কয়েক দিন হল গন্ডগোল করছে। সস্তার জিনিস হলে যা হয়। ভাগ্যিস আগের রেকর্ডিংগুলো ল্যাপটপে তুলে রেখেছিল।

নীলাঞ্জন পকেট থেকে বিড়ির কৌটো বার করে একটা বিড়ি ধরাল। লম্বা টান দিয়ে বলল, 'মন্দাকিনী কলকাতায় আসার কিছুদিন পর থেকেই আমি তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। বছর দেড়েকের মাথায় তাকে বিয়ে করে ফেললাম। রাজবল্লভ পাড়ায় একটা দু-কামরার ভাড়া করা ফ্ল্যাটে আমাদের দাম্পত্য শুরু হল। আমি তখন একটা ব্যাঙ্কে চাকরি করি। কিন্তু ধ্যান-জ্ঞান বেঁচে থাকার ধারণা সবই থিয়েটার ঘিরে। মন্দাকিনী সেই ধারণার মধ্যে চমৎকার ফিট করে গেল। অন্তত আমার মনে হল, ফিট করে গেল। আসলটা যাই হোক। একটা কথা মানতেই হবে। মন্দাকিনীর অভিনয় প্রতিভা ছিল অতুলনীয়। আমার নাটকগুলো বেশিরভাগ সময়েই পাবলিক নিত না। সমালোচকরাও আমার প্রতি খুব একটা সদয় ছিলেন না। কিন্তু প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই মন্দাকিনীর অভিনয় অকুণ্ঠ প্রশংসা পেত।'

'আপনাদের বিবাহিত জীবন কতদিন চলেছিল?'

'প্রায় পনেরো বছর। প্রথম পাঁচ বছর স্বপ্নের মতো কেটে গিয়েছিল। থিয়েটার, থিয়েটার আর থিয়েটার। আর কিচ্ছু মাথায় ছিল না। ঝোঁকের মাথায় চাকরিটাও ছেড়ে দিলাম। ফুল টাইম থিয়েটার করব। মন্দাকিনী তখন কয়েকটা সিরিয়ালে কাজ করতে শুরু করেছে। বেশ নাম করছে। তার টাকাতেই সংসার চলত। ইতিমধ্যে আমাদের মেয়ের জন্ম হয়েছে। একটু একটু করে সংসারে টাকার চাহিদা বাড়ছে।'

'আপনার কি কোনও রোজগারই ছিল না?'

'প্রায় ছিল না বললেই হয়। কালেভদ্রে আমিও দু'একটা সিরিয়ালে কাজ করতাম। কিন্তু খুব একটা সুবিধে করতে পারিনি। আসলে ওই প্যানপ্যানে গল্প কিংবা চড়া দাগের মেলোড্রামা আমি ভেতর থেকে ঘৃণা করতাম। তাই কখনোই মন লাগিয়ে কাজ করতে পারিনি। এদিকে মন্দাকিনী সিরিয়ালের কাজে ব্যস্ত থাকার অছিলায় নাটকে অভিনয় করা একেবারে বন্ধ করে দিল। এই সময় থেকেই মন্দাকিনীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা খারাপ হতে শুরু করে।'

'তারপর?'

'এরপর মন্দাকিনী বড় পর্দায় কয়েকটা ব্রেক পায়। আরও আরও নাম করতে থাকে। এবং আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে শুরু করে। একটু নাম হবার পর মন্দাকিনী টালিগঞ্জ অঞ্চলে নতুন ফ্ল্যাট ভাড়া করে চলে

গেল। আমি রাজবল্লভ পাড়ার বাড়িতেই রয়ে গেলাম। আমাদের মেয়ে শান্তিনিকেতনে থেকে লেখাপড়া করতে লাগল। আপ্রাণ চেষ্টা করতাম আমাদের খারাপ সম্পর্কের আঁচটা যেন তার গায়ে না লাগে।

'সুবীর চৌধুরির সঙ্গে মন্দাকিনীর কবে পরিচয় হল?'

'হয়ত আমরা যখন একসঙ্গে রাজবল্লভ পাড়ায় থাকতাম তখনই হয়েছিল। কিংবা আমরা তখন আলাদা বাড়িতে থাকছি তখনও হতে পারে। এ-ব্যাপারটা আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারব না।। মন্দাকিনী কীভাবে তার কেরিয়ার গুছিয়ে নিচ্ছে, আমার কোনও ধারণাই ছিল না। হঠাৎ একদিন খবর কাগজে দেখলাম ধনী ব্যবসায়ী সুবীর চৌধুরির সঙ্গে মন্দাকিনীর প্রবল ফষ্টিনষ্টি চলছে। আমরা তখন আলাদা বাড়িতে থাকতে শুরু করেছি।'

'কিন্তু তখনও তো আপনাদের ফরমালি ডিভোর্স হয়নি?'

'না, তখনও হয়নি। হঠাৎ একদিন মন্দাকিনীর ফোন। বলল, সে সুবীর চৌধুরিকে বিয়ে করতে চায়। তার জন্য আমার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ দরকার। আমার অবস্থা তখন একেবারে তলানিতে। আর্থিকভাবে, মানসিকভাবে। নাটক, যা নিয়ে এতদিন বেঁচে ছিলাম, পয়সার অভাবে তাও নামাতে পারছি না। দলটাও প্রায় ভেঙে যাবার মুখে। আমি মন্দাকিনীকে বললাম, ডিভোর্স দিতে পারি, কিন্তু তার জন্য এক লক্ষ টাকা লাগবে। মন্দাকিনী সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। এখন মনে হয়, এক লক্ষের বদলে দশ লক্ষ চাইলে ঠিক হত।'

'এখন আপনার কীভাবে সময় কাটে?'

'কীভাবে চলে জিজ্ঞেস করছেন? সুন্দরবনের দিকে একটা ইস্কুল চালাই। নাটকটাও পুরোপুরি ছাড়তে পারিনি। একটা পেট, কোনওরকমে চলে যায়। খুব ভাল চলে না। সব সময় টাকার দরকার। সেইজন্য আপনার সঙ্গে টাকার কথাটা সোজাসুজি বলে নিলাম।'

নীলাঞ্জন আর একটা বিড়ি ধরাল। নোটবইটা পকেটে পুরে উঠে দাঁড়াল আদিত্য। বুক-পকেট থেকে দশটা পাঁচশ টাকার নোট বার করে নীলাঞ্জনের হাতে দিয়ে বলল, 'একটা অন্য কথা জিজ্ঞেস করছি। আপনার টেবিলে দেখছি মার্ক-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সহাবস্থান করছেন। দুজনকে মেলাতে অসুবিধে হয় না?'

প্রশ্নটা শুনে নীলাঞ্জন কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। মনে হয় অবাক হয়েছে। মুখে বলল, 'আপনার আবার এসব দিকেও মন আছে নাকি? ভাল, ভাল।'

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'মন দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সামাজিক প্রবন্ধগুলো পড়বেন। পড়লে দেখবেন, পাতায় পাতায় সাম্যের কথা বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, আমাদের গ্রামীণ সমাজে সাম্য আনাটাই সব থেকে জরুরি। মার্কের সঙ্গে এর তফাত কোথায়? অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিমানুষকে প্রাধান্য দিয়েছেন, মার্ক দেননি। যাগ্গে, আপনার সঙ্গে এসব জ্ঞানের কথা বলে সময় নষ্ট করার মানে হয় না। আপনার কাজ তো হয়ে গেছে। এবার আসুন। নমস্কার।'

নীলাঞ্জনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আদিত্য ঘড়ি দেখল। দেড়টা বাজে। বেশ খিদে পেয়েছে। স্টেশন অব্দি যেতে পারলে একটা-দুটো ভাতের হোটেল নিশ্চয় পাওয়া যাবে। কিন্তু অত দূর যাবার দরকার কী? নীলাঞ্জনের বাড়ির পাশেই তো একটা হোটেল রয়েছে। মোটামুটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আদিত্য সেখানেই ঢুকে পড়ল। ব্ল্যাকবোর্ডে খড়ি দিয়ে লেখা লম্বা মেনু। দু'একটা আইটেমের পাশে ঢ্যাঁড়া পড়ে গেছে। আদিত্য ধরে নিল সেগুলো হয় ফুরিয়ে গেছে কিংবা সেদিন রান্নাই হয়নি। হোটেলে বেশ ভিড়। এটাই দুপুরে ভাত খাবার পিক আওয়ার। আদিত্য একটা টেবিলের এককোণে একটু জায়গা পেয়ে বসে পড়ল। যে লোকটার পাশে গিয়ে আদিত্য বসল তাকে তখনও খাবার দেওয়া হয়নি। সদ্য ধোয়া কলাপাতায় সবে নুন আর লেবু পড়েছে।

একটু পরে হোটেলের পরিচারক এসে আদিত্যর সামনেও নুন-লেবু-কলাপাতা সাজিয়ে দিয়ে অর্ডার নিয়ে চলে গেল। পাশের লোকটির মতো সে-ও অপেক্ষা করছে এমন সময় লোকটি বলল, 'আপনাকে তো এদিকে আগে কখনও দেখিনি। নতুন এলেন নাকি?'

'এই একটা কাজে এসেছিলাম।' আদিত্য সংক্ষিপ্তভাবে বলল।

'কী কাজ? কারও বাড়িতে এসেছিলেন?' এই মফস্বলে বোধহয় প্রাইভেসি বলে কিছু নেই।

'এখানে নীলাঞ্জন মৈত্র থাকেন, তাঁর সঙ্গে একটু দরকার ছিল।'

'নীলাঞ্জন মৈত্র? ওই চশমা পরা দাড়িওলা ভদ্রলোক? লক্ষ্মী সাঁতরার বাড়ির একতলায় যিনি ভাড়া থাকেন? উনি তো বেশিরভাগ দিনই এখানে থাকেন না। কোথায় যে থাকেন, কে জানে। করেন কী ভদ্রলোক?'

'আমি যতদূর জানি সুন্দরবনের দিকে একটা ইস্কুল চালান। আমি সেখানেই একটা চাকরির খোঁজে এসেছিলাম।'

'অ, তাই বুঝি? তা অতদূরে গিয়ে চাকরি করা পোষাবে?'

ভাগ্যক্রমে আদিত্যকে আর উত্তরটা দিতে হল না, কারণ ইতিমধ্যে ভাত-ডাল-ভাজা এসে গেছে। ফেরার ট্রেনে জানলার ধারে বসে বসে আদিত্য নীলাঞ্জন মৈত্রর কথাই ভাবছিল। লোকটাকে দেখে খারাপ লাগে। ঠিক যেন সত্তর-আশি দশকের বামপন্থী সিনেমা-উপন্যাস থেকে উঠে আসা একটা ব্যর্থ আদর্শবাদী চরিত্র।

(৪)

রিপোর্টটা শেষ করতে করতে এর পরের তিনটে দিন লেগে গেল। মন্দাকিনীর সেক্রেটারি মেয়েটি তাগাদা দিয়ে আবার ফোন করেছিল। অতএব রিপোর্ট না শেষ করে উপায় কী? রিপোর্টটা জমা দেবার পর আদিত্যর হাতে আর কোনও কাজ রইল না। রিপোর্টের সঙ্গে সঙ্গে তার খরচ এবং পারিশ্রমিকের বিলটাও জমা দিয়ে এসেছে, যদিও আদিত্যর ধারণা কিছু খরচ এখনও বাকি আছে। টাকাটা পেয়ে গেলে কি তবে চৌধুরি বাড়ির সঙ্গে আর কোনও সংস্রব থাকবে না? আদিত্যর ইন্টুইশন বলছে এরকম হতেই পারে না। শিগগির কিছু একটা ঘটতে চলেছে।

তার ইন্টুইশনের মুখে ছাই দিয়ে ঘটনাবিহীন আরও দশটা দিন কেটে গেল। গতকাল চৌধুরি এন্টারপ্রাইজের থেকে কুরিয়ারে চেক এসে গেছে। আদিত্য যা বিল করেছিল পুরোটাই দিয়ে দিয়েছে। বিমলের কিছু টাকা পাওনা আছে তাই বিমলকে ফোন করার চেষ্টা করল আদিত্য। ফোন বন্ধ। রেকর্ডেড ম্যাসেজ বলছে, নম্বরটি উপলব্ধ নেই। বিমলের জন্য আদিত্যর একটু চিন্তা হচ্ছে। ফোন বন্ধ কেন? গেল কোথায় ছেলেটা?

ইতিমধ্যে একটা-দুটো নতুন কাজ হাতে এসেছিল। আদিত্য নেয়নি। মনটা অস্থির অস্থির লাগছে। চৌধুরি বাড়ির ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত না হলে আদিত্য কোনও কাজে মন দিতে পারছে না। এমনকি গান শুনতেও ভাল লাগছে না। যে টাকাটা পাওয়া গেছে তাতে আগামী তিন-চার মাস কোনও কাজ না করলেও আরামসে চলে যাবে।

বেশ গরম পড়ে গেছে। দুপুরে রাস্তায় বেরোতে কষ্ট হয়। আদিত্যর মেসের ঘরটার থেকে আপিস ঘরটা একটু ঠান্ডা। কাজ না থাকলেও তাই আদিত্য রোজ আপিসে গিয়ে বসে। দুপুরে চেয়ারে বসে বসেই একটু ঘুমিয়ে নেয়। বিকেলে ল্যাপটপে এটা-ওটা দেখে। মন ভাল নেই। একটা চাপা অতৃপ্তি।

সেদিন একটু বেলা করে আদিত্যর আপিসে স্যমন্তক এল। ফোন করেই এল। বলল, 'তুই কেমন গোয়েন্দাগিরি করছিস সচক্ষে দেখতে এলাম।'

আসলে স্যমন্তক রাধাবাজারে একটা ঘড়ি সারাতে দিয়েছে। ঘড়িওলা বলেছে এক ঘণ্টা ঘুরে আসতে। এক ঘণ্টা কী করে কাটাবে, তাই আদিত্যর আপিস। স্যমন্তকের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক গেঁজাতে মন্দ লাগল না।

স্যমন্তক চলে যাবার পর আদিত্য চেয়ারে বসে বসে একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করল। কিন্তু ঘুমোবে কী, যা গরম। পাখার হাওয়াটাও গরম হয়ে গেছে। তার ওপর অসহ্য হিউমিডিটি, দরদর ঘাম। আসলে চারতলা বলে গরমটা বেশি। মাথার ওপরেই ছাদ। তার মেসবাড়ির ঘরটাও ছাতের ঠিক নীচে তবে তার অবস্থা আরও খারাপ। আপিস বাড়িটা সেকালের বাড়ি বলে সিলিংটা অনেকটা উঁচুতে আর তাতেই খানিকটা রক্ষে।

বিকেল থেকে একটু একটু করে আকাশে মেঘ জমতে শুরু করল। আধঘণ্টার মধ্যে আকাশ একেবারে কালো। তাপমাত্রা কয়েক ডিগ্রি কমে গেছে। আদিত্যর মনে হল এবার ঝেঁপে বৃষ্টি আসবে। এক কাপ চা পেলে মন্দ হত না। সে মোবাইলটা বার করে শ্যামলকে চা আনতে বলবেভাবছে এমন সময় চারদিক কাঁপিয়ে একটা ভয়ানক ঝড় উঠল। আর ঠিক তখনই, চারুলতা সিনেমায় ঝড়ের মধ্যে অমল যেভাবে প্রথম প্রবেশ করেছিল অনেকটা সেভাবে, আদিত্যর মোবাইলটা বাজতে শুরু করল।

ওপারে গৌতমের গলা। বেশ উত্তেজিত। 'শোন, খবর আছে। দার্জিলিং থেকে কিছু দূরে, ছংটংচা বাগানের কাছে, একটা হন্ডা অ্যাকর্ড গাড়ি পাহাড় থেকে পড়ে একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। এটা ঘটেছে দিন চারেক আগে। গাড়িটাতে আগুন লেগে গিয়েছিল। গাড়ির ভেতর থেকে একটা একেবারে ঝলসে যাওয়া বডি পাওয়া গিয়েছিল। ঘটনাস্থলে পৌঁছতে স্থানীয় পুলিশের মনে হয়ে একটু দেরি হয়ে গেছিল। বডিটা পচে যাচ্ছিল। তাই পুলিশ পৌঁছনোর আগেই গ্রামের লোক বডি সৎকার করে দিয়েছে। অ্যাক্সিডেন্ট-এর জায়গাটা বেশ দুর্গম। সাধারণ গাড়ি চলাচলের রাস্তায় পড়ে না। শর্ট-কাটের জন্য কেউ কেউ ব্যবহার করে। তবু খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে, পুলিশের যেতে অত দেরি হল কেন। এবার আসল কথাটা শোন। বডিটা একজন মহিলার। গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর ধরে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে গাড়ির মালিকের নাম মন্দাকিনী চৌধুরি। বডিটাও সম্ভবত তাঁর। ওই অঞ্চলে চৌধুরিদের একটা চা-বাগান আছে। মন্দাকিনীর সেখানে যাবার কথা ছিল, কিন্তু গিয়ে উঠতে পারেননি। কলকাতার বাড়িতেও ফিরে আসেননি। এখন অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে মৃতার জামাকাপড় আর জিনিসপত্র থেকে তাঁকে শনাক্ত করতে হবে।'

'ড্রাইভারের খোঁজ পাওয়া গেছে?'

'এটাও একটা রহস্য। ড্রাইভার বেপাত্তা। তার বডিটাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। অবশ্য গাড়িটা ওপর থেকে নীচে পড়ার সময় গাড়ির দরজা খুলে গিয়ে ড্রাইভার ছিটকে বাইরে চলে যেতে পারে। আর অনেক নীচে পড়ে গেলে বডি খুঁজে পাওয়া শক্ত। বুনো জন্তু-জানোয়ারেও খেয়ে ফেলতে পারে। ড্রাইভারের সিট বেল্টটা খোলা ছিল।'

'তোদের নেক্সট মুভ কী?'

'আগামীকাল মৃতার জিনিসপত্র কলকাতায় এসে পৌঁছবে। আমরা মন্দাকিনী চৌধুরির মেয়ে সোহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করছি। তাঁকেই জিনিসপত্র শনাক্ত করতে হবে।'

'আমি কিন্তু আশঙ্কা করছিলাম এই ধরনের একটা কিছু ঘটতে চলেছে। কেন আশঙ্কা করছিলাম তোকে দেখা হলে বলব। মোদ্দা কথা, আমি খুব একটা অবাক হচ্ছি না। যাই হোক, কাল যখন সোহিনী জিনিসপত্রগুলো দেখতে আসবে আমি কি তখন থাকতে পারি? আমি সোহিনীর সঙ্গেই আসব। তার ভাড়া করা গোয়েন্দা হয়ে। আফটার অল সোহিনীর মায়ের কাছ থেকে আমি ফী নিয়েছি। তাই সোহিনীর ভাল-মন্দ দেখার একটা দায়িত্ব আমার আছে।'

'তুই অবশ্যই থাকবি। আমাদের তরফ থেকে না হয় সোহিনীর তরফ থেকে। নো প্রবলেম। আমরা আলাদা করে সোহিনীর সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করছি।'

মোবাইল নামিয়ে রেখে আদিত্য খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। মন্দাকিনী চৌধুরিকে তাহলে বাঁচানো গেল না। মন্দাকিনী নিজেও কি বাঁচতে চেয়েছিল? চাইলে আদিত্যকে সাত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবে কেন? যেন আদিত্যর সাহায্যর চাইতে তার রিপোর্টটা মন্দাকিনীর বেশি প্রয়োজন ছিল। নাকি আদিত্যর ক্ষমতার

ওপর মন্দাকিনী খুব একটা বিশ্বাস রাখতে পারেনি? আদিত্যর রিপোর্ট পাবার পর মন্দাকিনী কি অন্য কাউকে নিয়োগ করেছিল?

কিছুক্ষণ হল ঝড় থেমে গিয়ে মুষলধারায় বৃষ্টি নেমেছে। আদিত্য জানলার কাছে গিয়ে দেখে বৃষ্টির ধারায় বউবাজার স্ট্রিট ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। রাস্তায় লোক প্রায় নেই, গাড়িবারান্দাগুলোর নীচে প্রচুর লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। এর মধ্যেই দু-একজন ছাতা মাথায় দিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে রাস্তা পার হয়ে গেল। আদিত্য একটা সিগারেট ধরাল, তারপর টেবিলের ওপর থেকে মোবাইলটা তুলে নিয়ে আবার জানলার সামনে দাঁড়াল। সোহিনীকে ফোন করতে হবে। কিন্তু নম্বরটা ডায়েল করতে গিয়ে আদিত্যর মনে হল আর একটু অপেক্ষা করা ভাল। পুলিশ আগে খবরটা দিক। খবরটা শোনার পর সোহিনী একটু সামলে নিক। বৃষ্টির মধ্যে ঘন্টি বাজিয়ে ট্রাম যাচ্ছে। আদিত্য ইউ টিউবে নিখিল ব্যানার্জির একটা পুরোনো সুরদাসী মল্লার চাপিয়ে আবার জানলার ধারে এসে দাঁড়াল।

সোহিনী নিজেই ফোন করল মিনিট পনের পরে।

'আদিত্যবাবু'

তারপর কিছুক্ষণ নীরবতা। সোহিনী বোধহয় কান্না চাপার চেষ্টা করছে। এসব অবস্থায় আদিত্য অসহায় বোধ করে, কী বলবে বুঝে উঠতে পারে না, তার সাংসারিক অভিজ্ঞতা খুবই কম।

'আদিত্যবাবু, যা ভয় পেয়েছিলাম সেটাই হল।' আবার বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা। 'পুলিশ আপনাকে তো ফোন করেছিল।' সোহিনী এবার কান্নায় ভেঙে পড়ল। আদিত্যর মনে হল তার এবার কিছু বলা উচিত। সে বলল, 'কাল আইডেন্টিফিকেশনের সময়, আপনি যদি চান, আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি।'

'আপনি অবশ্যই আমার সঙ্গে যাবেন। এটা বলতেই ফোন করেছিলাম।' সোহিনী খানিকটা সামলে নিয়েছে। 'আর একটা কথা। মার মৃত্যুর ব্যাপারটা আপনি ইনভেস্টিগেট করুন, এটা আমার একান্ত ইচ্ছে। চৌধুরি এন্টারপ্রাইজের তরফ থেকে আপনাকে নিয়োগ করছি।'

'আমি আপনার অফার গ্রহণ করলাম। আমার বন্ধু গৌতম দাশগুপ্ত, জয়েন্ট কমিশানার ক্রাইম, কি আপনাকে ফোন করেছিল?'

'হ্যাঁ, উনিই ফোন করেছিলেন। আপনাকে ঘটনাটা জানিয়েছেন বললেন। আর বললেন, বেলা দুটো নাগাদ লালবাজার পৌঁছতে হবে। আমি আপনাকে তাহলে দেড়টা নাগাদ তুলে নেব। কোথা থেকে তুলব?'

'আমাকে তুলতে হবে না। আমি নিজেই চলে যাব। আমার আপিস থেকে লালবাজার কয়েক মিনিটের হাঁটা পথ। আমি গৌতমের ঘরেই থাকব। আপনি ওখানেই চলে আসবেন। আমি গৌতমকে বলব গেটে আপনার নামটা দিয়ে রাখতে। নইলে ঢুকতে দেবে না।'

'ঠিক আছে। কাল দেখা হবে।'

## (৫)

কালবৈশাখীর বৃষ্টি বেশিক্ষণ থাকার কথা নয়। অথচ আজ বিকেলের বৃষ্টিটা এখনও ধরল না। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে গেল, এখনও বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে রত্না ফোন করেছিল। বলল, 'চলে আয়, অমিতাভ দুর্দান্ত ইলিশ এনেছে। খিচুড়ি হচ্ছে। রাত্তিরে থেকে যাবি। সুপর্ণ রায়কে মনে আছে? আমাদের সঙ্গে ইকনমিক্স পড়ত? সুপর্ণ ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইন্সটিটিউটে চাকরি নিয়ে অ্যামেরিকা থেকে ফিরে এসেছে। ওরাও আসছে। সুপর্ণ তোর তো খুব বন্ধু ছিল।'

আদিত্য বলেছে যাবে। তবে বেরোতে হলে এখনই বেরোতে হয়। একে আপিস ভেঙেছে, তায় বৃষ্টি, এখন ট্যাক্সি পাওয়া অসম্ভব। লাইনে দাঁড়িয়ে মিনিবাস ধরতে হবে। ভাগ্যিস ছাতাটা সঙ্গে আছে।

আদিত্য যখন অমিতাভদের বাড়ি পৌঁছল তখন সোয়া আটটা বেজে গেছে। মিনিবাসের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল, তার ওপর রাস্তায় জ্যাম। ছাতা থাকা সত্ত্বেও বেশ ভিজে গেছে। সুপর্ণরা পৌঁছে গিয়েছিল, বসার ঘরে ঢুকে সুপর্ণকে দেখে আদিত্য প্রথমে চিনতেই পারেনি। মাথা ভর্তি টাক, বেশ মুটিয়েছে। তবে কথাবার্তা সেই একইরকম আছে, খোলামেলা, সহজ-সরল, চাল-চালিয়াতি নেই। সুপর্ণর বউ-এর হাবভাব ঠিক এর উল্টো। কথায় কথায় জানিয়ে দিচ্ছে অ্যামেরিকায় তাদের কত বিত্ত আছে। দুটো গাড়ি আছে, একটা বিএমডাব্লু, একটা টয়োটা লেক্সাস। দ্বিতীয় গাড়িটা নাকি প্রথমটার থেকেও দামি। মস্ত বাড়ি আছে, দুটো বিরাট দামি কুকুর। ঠারেঠোরে বলল, তার নিজের একটুও ইন্ডিয়া আসার ইচ্ছে ছিল না। নেহাত সুপর্ণ আসতে চাইল, তাই আসা।

'তুই পাকাপোক্তভাবে ফিরে এলি নাকি?' আদিত্য সরলভাবে জিজ্ঞেস করল।

'আরে না, না। সেরকম কিছু নয়। ওখানকার চাকরিটা আছে। চাকরি থেকে একবছর ছুটি নিয়ে এসেছি। ওদেশে মাস্টারি করলে চার বছরে এক বছর এই রকম ছুটি পাওয়া যায়। ওরা বলে স্যাবাটিকাল। এক বছরের জন্য এসেছি। তারপর আবার ফিরে যাব। আমরা সকলেই এখন মার্কিনি সিটিজেন। তবে আমার বউ-এর ইচ্ছে ছিল স্যাবাটিকালটা ইউরোপে কাটাতে। অফারও দু-একটা ছিল। সেগুলো না নিয়ে আই এস আই-তে একটা বছর কাটাবো ঠিক করলাম।'

সুপর্ণ খানিকক্ষণ থামল। তারপর একটু থেমে থেমে বলল, 'দেখ, কাজ-টাজ তো ওখানে ভালই হয়, ঠিকসময় টেনিওরটাও পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এদিকে মার অনেক বয়েস হয়েছে। আমি একমাত্র সন্তান। আমি না দেখলে কে দেখবে? তাই কদিন এখানে থেকে একটু মার দেখাশোনা করব ঠিক করেছি। তাছাড়া আমি চেয়েছিলাম আমার ছেলেমেয়েরা অন্তত কিছুদিন এখানে থেকে ওদের শিকড়টাকে জানুক।'

'তোর মতো মাতৃভক্ত এবং দেশভক্ত আজকাল বড় একটা দেখা যায় না।' অমিতাভর গলায় ঠাট্টা।

'থাকচিস কোথায়?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'ভবানীপুরের পুরোনো বাড়িটা তো ফাঁকাই পড়ে আছে। মা একটা ঘরে থাকে। মার নার্স-আয়ারা আর একটা ঘর দখল করে রেখেছে। বাকি ঘরগুলো তো বন্ধই পড়ে থাকে।'

'তোর বাচ্চারা কোথায়? কত বড় হল?'

'আমার এক ছেলে এক মেয়ে। ছেলের দশ, মেয়ের আট। দুজনেই পাশের ঘরে, অমিতাভর ছেলের সঙ্গে।

রত্না রান্নাঘরে কিছু একটা করছে। সুপর্ণর বউ রত্নাকে সাহায্য করতে উঠে গেল। এটাই বোধহয় ভদ্রতা। অমিতাভ বলল, 'হুইস্কি খাবি? গত বছর শিকাগো থেকে ফেরার পথে একটা জ্যাক ড্যানিয়েল'স এনেছিলাম। খোলাই হয়নি।'

আদিত্য মাথা ঝুঁকিয়ে হ্যাঁ বলল। সুপর্ণ বলল, 'মহিলাদের জিজ্ঞেস কর ওরা কী খাবে।'

'আমার কাছে ওয়াইন আছে, লাল সাদা দুটোই। আমি জিজ্ঞেস করছি।' অমিতাভ উঠে দাঁড়াল।

সুপর্ণ আদিত্যকে বলল, 'অমিতাভর সঙ্গে তো মাঝে মাঝে কথা হয়। ও কনফারেন্স-টনফারেন্স-এ আমেরিকা গেলে ফোন করে। একবার আমাদের বাড়িতেও এসেছিল। কিন্তু তোর খবর কিচ্ছু জানি না। এম এ পড়তে দিল্লি চলে গেলাম তারপর থেকে আর তোর সঙ্গে যোগাযোগ নেই। তুই করিস কী আজকাল?

এই ধরনের প্রশ্ন আদিত্যকে আর বিব্রত করে না। আগে খুব করত।

সে সহজভাবে বলল, 'আমি কী করি শুনলে তুই ভিরমি খাবি। প্রথমেই বলে রাখি, তোর বা অমিতাভর মতো অধ্যাপনা করি না। কর্পোরেটেও কাজ করি না। ডাক্তার-উকিল নই। আমলা বা পুলিশও হতে পারিনি। পাটের দালালি করি না, ইন্সিয়োরেন্স-এর এজেন্সি নিইনি, শেয়ার বাজারের সঙ্গেও যোগাযোগ নেই। তাহলে আর কী বাকি রইল?'

'রিকশা টানিস নাকি?' সুপর্ণ সন্দেহের গলায় বলল, 'দেখে তো মনে হচ্ছে না।'

'বলছি কী করি। প্রাইভেট ডিটেকটিভ জানিস? বেসরকারি গোয়েন্দা? আমি একজন বেসরকারি গোয়েন্দা।'

'বেসরকারি গোয়েন্দা? ঢপ মারার জায়গা পাস না?'

'ঢপ নয় রে, একেবারে সত্যি। কিছুদিন আগে একটা গ্যাংকে ধরে দিয়ে আদিত্য একটা অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছে।' আমিতাভ ড্রিংক্স-এর ট্রে হাতে নিয়ে ফিরে এসেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আড্ডা বেশ জমে উঠল। মহিলারাও আড্ডায় যোগ দিয়েছে। সুপর্ণর বউ মৃত্তিকাকে এখন আর অতটা অবনক্সাস মনে হচ্ছে না। ট্রাম্প, মোদি, এইচ ওয়ান বি ভিসা, পশ্চিমবঙ্গ ও বহির্বিশ্ব, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া এইসব নানারকম কথার মাঝে আদিত্যর একটা কথা মনে পড়ে গেল।

সে আলাদা করে সুপর্ণকে বলল, তুই তো এখন আই এস আই যাস, আমাকে একটা তথ্য যোগাড় করে দিতে পারবি? একটা বই-এর নাম বলছি। সারা জীবনে বইটা সম্ভবত দুবার আই এস আই লাইব্রেরি থেকে ইস্যু করা হয়েছে। সেটাও আবার গত কয়েক মাসের মধ্যে। বইটা ইস্যু হয়েছে একবার আমার নামে, আর একবার ওখানকারই একজন সিনিয়র অধ্যাপক, লাইব্রেরিয়ান নাম বলল প্রফেসর সামন্ত, তাঁর নামে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ অঞ্জন সামন্ত। চিনি। বয়েস হয়েছে। শিগগির রিটায়ার করবে। বহুদিন রিসার্চ-টিসার্চ কিছু করে না। ফসিল হয়ে গেছে। বল কী করতে হবে।'

'দুটো রিকোয়েস্ট। এক, অঞ্জন সামন্তকে জিজ্ঞেস করতে হবে বইটা তিনি নিজে পড়বেন বলে তুলেছিলেন নাকি অন্য কারোর জন্যে? অন্য কারো জন্যে হলে কার জন্যে? দুই, লাইব্রেরিতে গিয়ে জানতে হবে বইটা আমি নেবার পর আর কেউ নিয়েছে কিনা। আর নিলে কে নিয়েছে।'

'এটা কি তোর গোয়েন্দাগিরির কাজে লাগবে?'

'ইয়েস, ভেরি মাচ।'

'তাহলে দাঁড়া। প্রথম প্রশ্নটার উত্তর একটা ফোন করে এখখুনি জেনে নিচ্ছি। দ্বিতীয়টা জানার জন্য অবশ্য ইন্সটিটিউট যেতে হবে। বইটার নাম লিখে দে।'

'লিখতে হবে না, বলে দিচ্ছি। বইটার নাম দ্য এন্টারপ্রাইসিং চৌধুরিস অফ বেঙ্গল : ক্রনিকল অফ অ্যান আনইউসুয়াল জার্নি। লেখকের নাম অরুণকুমার উপাধ্যায়।'

মোবাইলে একটা নম্বর ডায়াল করতে করতে সুপর্ণ বারান্দায় বেরিয়ে গেল। ও এর মধ্যেই টের পেয়ে গেছে বারান্দা থেকে রিসেপশনটা একটু ভাল পাওয়া যায়।

একটু পরে সুপর্ণ ফিরে এসে বলল, 'অতি কষ্টে জানা গেছে। অঞ্জন সামন্ত তো বুঝতেই পারে না কোন বই-এর কথা বলছি। শেষে বুঝল। বলল, বইটা তার এক নেবারের জন্য নিয়েছিল। নেবারের নাম সুব্রত সেন। বেহালার দিকে একটা কলেজে অঙ্ক পড়ায়।

আদিত্য শুনতে পেল রত্না বলছে, 'বাচ্চাদের খাওয়া প্রায় শেষ। এবার বড়দের খাবার দেব। প্লিজ ফিনিস ইয়োর ড্রিঙ্কস।'

সে অমিতাভকে বলল, 'তোর বাংলা ডিক্সনারিটা দে তো। একটা কথার মানে জানতে হবে।'

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

(১)

সহজেই হয়ে গেল আইডেন্টিফিকেশন। মৃতার হাতে একটা বেশ বড় আকারের হিরের আংটি ছিল, সেটা দেখা মাত্র তার মায়ের আংটি বলে সোহিনী চিনতে পারল। গাড়িতে একটা আধপোড়া ব্যাগ পাওয়া গিয়েছিল যার ভেতর থেকে মন্দাকিনীর আধপোড়া আধার কার্ড এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স বেরিয়েছে। দুটোতেই মন্দাকিনীর ছবি আছে। ছবিগুলো পুড়ে খানিকটা অস্পষ্ট হয়ে গেলেও বুঝতে অসুবিধে হয় না এগুলো মন্দাকিনীরই ছবি। গৌতম বলছিল, সাধারণত এত নিশ্চিতভাবে আইডেন্টিফিকেশন হয় না। তারা তিনজন, আদিত্য, গৌতম আর সোহিনী, গৌতমের আপিসে বসে চা খাচ্ছিল।

আদিত্য বলল, 'ড্রাইভারের অন্তর্ধান নিয়ে একটা রহস্য কিন্তু থেকেই গেল। এই ড্রাইভারটির সম্বন্ধে আমাদের কতটুকু জানা আছে?' শেষের প্রশ্নটা সোহিনীর প্রতি।

'আমি কোনও দিন লোকটাকে দেখিনি। তবে মার কাছে শুনেছি দীননাথ যোশি লোকটা খুব বিশ্বাসী। কাকু মারা যাবার পর থেকে মাকে দূরে দূরে, বিশেষ করে চা-বাগানগুলোতে, একা ট্র্যাভেল করতে হত। একটা বিশ্বাসী ড্রাইভারের দরকার ছিল। কারোর একটা রেফারেন্স-এ দীননাথ যোশি মার কাজে বহাল হয়। সেই থেকে দীননাথ মার গাড়ি চালাচ্ছে। তবে কলকাতায় চালাত না। মা যখন নর্থ বেঙ্গলে আসত তখন মার গাড়ি চালাত। নেপালি হিন্দু। সম্ভবত ব্রাহ্মণ। মা বলত খুব সাত্ত্বিক লোক। নেড়া মাথায় টিকি। ঘোর নিরামিশাষি। থাকত চৌধুরিদেরই কোনও একটা চা-বাগানে। লোকটার বন্দুকের লাইসেন্স ছিল। শুনেছি একটা পিস্তল ও সব সময় সঙ্গে রাখত। সেদিক থেকে দেখতে গেলে লোকটা শুধু মার ড্রাইভারই ছিল না, বডি গার্ডও ছিল।'

'লোকটার বাড়ির লোকজন কেউ আছে? পুলিশ খোঁজ নিয়েছে?' এবার আদিত্যর প্রশ্ন গৌতমকে।

'দীননাথের পরিবার নেপালে থাকত। কিরীটপুর থেকে কিছু দূরে একটা গ্রামে। পুলিশ সেখানে গিয়েছিল। গ্রামের লোক বলছে, দীননাথের সঙ্গে ওর বউ-এর বনিবনা ছিল না। বউ-এর নাকি স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়। তাই নিয়ে সম্পর্ক খারাপ। একটা ছেলে আছে ইস্কুলে পড়ে। ওর বউ বলছে, গত দশ বছর দীননাথ বাড়ি আসেনি। তবে প্রত্যেক মাসে ছেলের নামে টাকা পাঠায়। দীননাথের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে শুনে বউ-এর খুব একটা হেলদোল দেখা যায়নি।'

'মন্দাকিনী চৌধুরির মৃত্যুর খবরটা তোরা কবে অ্যানাউন্স করবি? এটা নিয়ে মিডিয়ায় তো বিশাল হইচই হবে।'

'ওটা আমার কাজ নয়। কমিশানার সাহেব ঠিক করবেন কী করতে হবে। তবে আজকালের মধ্যেই মনে হয় খবরটা অফিশিয়াল হয়ে যাবে।'

এর পরের কয়েক সপ্তাহ মন্দাকিনী চৌধুরিকে নিয়ে মিডিয়ায় যে তুমুল তোলপাড়টা চলল তার সঙ্গে বছর দশেক আগে সুন্দরবন উপকূলে আছড়ে পড়া আইলার তুলনা করা যায়। দুর্ঘটনা নাকি খুন? সাবোটাজ? যৌন ঈর্ষা? সমাজ কি রসাতলে যেতে বসেছে? বাংলা কাগজ, ইংরেজি কাগজ, ফেসবুক, ট্রাম-বাস-ট্রেন সর্বত্র একটাই কথা, একই আলোচনা। যেন পৃথিবীতে আর কোনও খবর নেই। ঘটনা নেই। টেলিভিশনে রোজ সন্ধেবেলা মনস্তত্ত্ববিশারদ, অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, প্রাক্তন পুলিশ-কর্তা, পলিটিকাল নেতা ইত্যাদি হোমরা-চোমরারা জমায়েত হয়ে নানা সম্ভব-অসম্ভব তত্ত্বের অবতারণা করেন, তাদের মধ্যে ঘোর ঝগড়া লাগে। আর বাঙালি দর্শক সান্ধ্য চা-মুড়ি-চানাচুর সহযোগে তাই গলাধঃকরণ করে। এরকম একটা রসদ বাঙালি বহুদিন পায়নি। কিছুদিন পরে, যখন হুজুগটা একটু থিতিয়ে এসেছে, আদিত্য সোহিনীর কাছ থেকে একটা টেলিফোন পেল।

'আজ সন্ধেবেলা ফ্রি আছেন? একবার মর্গ্যান ব্যানার্জির আপিসে আসতে পারবেন?'

'ফ্রি আছি। আসতে পারব। কিন্তু ব্যাপারটা কী?'

'মর্গ্যান ব্যানার্জির শুদ্ধশীল ব্যানার্জি ফোন করেছিলেন। মা নাকি অ্যাক্সিডেন্টের কয়েকদিন আগে একটা উইল করেছিল। সেই উইলে কিছু চমক আছে। শুদ্ধশীল ব্যানার্জি উইলটা পড়ে শোনাতে চান। আমাকে আসতে বলেছেন। বোধহয় মালাদেরও আসতে বলেছেন। তাছাড়া আলাদা করে আপনাকেও থাকতে বলেছেন। আমিও চাই আমার পরামর্শদাতা হিসেবে আপনি আমার সঙ্গে থাকুন।'

'অবশ্যই থাকব।'

'শুদ্ধশীল ব্যানার্জি আপনার আসল পরিচয় জানেন। বললেন, আপনি ওঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আপনি মাকে যে রিপোর্টটা জমা দিয়েছিলেন সেটা নিয়েও কিছু আলোচনা আছে। মিঃ ব্যানার্জি আমাকে বললেন, আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। আপনার ফোন নম্বরটা ওদের কাছে নেই। তাই সরাসরি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না।'

'কটার সময় যেতে হবে?'

'বলেছে সন্ধে সাড়ে ছ'টা।'

'আমি ঠিক সময় পৌঁছে যাব।'

ফোনটা রেখে আদিত্য কাগজ কলম নিয়ে বসল। মোবাইলে বিভিন্ন লোকের কথোপকথন যা যা রেকর্ড করেছে তার সারাৎসার ডায়েরিতে লিখে রেখেছিল। তাছাড়া পুরোনো খবর কাগজ থেকেও কিছু কিছু নোট করা আছে। মূল ঘটনাগুলোর একটা কালানুক্রমিক সূচি তৈরি করা দরকার। আদিত্য লিখল,

১৯৯০ সুবীর চৌধুরির প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু

২০০৮ মন্দাকিনীর সঙ্গে সুবীর চৌধুরির বিয়ে (এই সময় সুবীর চৌধুরির বয়েস ৬৩, মন্দাকিনীর ৩৫, শঙ্খমালার ২০, শঙ্খদীপের ৩৩, সোহিনীর ১৫)

২০১১ সুবীর চৌধুরির মৃত্যু

জুন, ২০১৭ মন্দাকিনীকে খুনের প্রথম চেষ্টা

জানুয়ারি, ২০১৮ সোহিনী মৈত্র আমার সঙ্গে যোগাযোগ করল

মে, ২০১৮ পাহাড় থেকে মন্দাকিনীর গাড়ির পতন

সারাদিন অসহ্য গরমের পর আজ আবার বিকেলে বৃষ্টি নেমেছে। খুব জোরে নয়, আবার খুব আস্তেও নয়। আদিত্য ছাতা নিয়ে বেরিয়েছে। এই ছাতাটা তার খুব পছন্দ। ইতালি থেকে অমিতাভ এনে দিয়েছে। এরকম লম্বা ছাতা আজকাল খুব বেশি লোক ব্যবহার করে না। ছাতাটা হাতে থাকলে কেমন একটা কনফিডেন্স পাওয়া যায়। মর্গ্যান ব্যানার্জির আপিসটা তার আপিস থেকে মোটেই দূরে নয়, তবে এই সময় রাস্তা পার হওয়াটা এক মহা সমস্যা। আদিত্য বউবাজার স্ট্রিট পেরিয়ে হেমন্ত বসু সরণি ধরে হাঁটতে হাঁটতে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল অব্দি পৌঁছল, আর একটু এগিয়ে রাস্তা পার হয়ে হাইকোর্টের দিকে যাবে।

সামনে একদল ইসকনের হরেকেষ্ট পার্টি খোল-কর্তাল বাজাতে বাজাতে চলেছে। কিছু ন্যাড়া মাথা সাহেব, আর তাদের শাড়ি পরা মেমসাহেব বোষ্টুমি। আদিত্যর মনে পড়ে গেল ছেলেবেলায় পড়া লাইন যত ছিল ন্যাড়া বেনে/ সব হল কীর্তুনে/ গাড়ু ভেঙে গড়াল কর্তাল। আদিত্যর মনে হল, আচ্ছা এই সামনের লম্বা ন্যাড়া মাথা সাহেবটা, যে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে নাচতে নাচতে চলেছে, সে যদি জিন্স আর টি-শার্ট পরে একমাথা ব্লন্ড চুল নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াত, তাহলে তাকে কেমন দেখাত? ভাবতে ভাবতে আদিত্য ভাবনায় ডুবে গেল, কখন দু-দুটো রাস্তা পেরিয়ে হাইকোর্ট পাড়ায় মর্গ্যান ব্যানার্জির আপিসের সামনে পৌঁছে গেছে, সে নিজেই টের পায়নি।

মর্গ্যান ব্যানার্জির মিটিং রুমে ঢুকে আদিত্য দেখল শঙ্খমালা-সুব্রত এবং সোহিনী এসে গেছে, শিশির চ্যাটার্জি রয়েছেন, এক কোনে ড্রাইভার শৈলেনবাবুও বসে আছেন। আর একটি ছেলে বসে আছে যাকে আদিত্য চেনে না। শুধু শঙ্খদীপ চৌধুরি নেই। শুদ্ধশীল ব্যানার্জি তখনও ঘরে ঢোকেননি। গোল টেবিল ঘিরে কয়েকটা চেয়ার ফাঁকা রয়েছে। আদিত্য সোহিনীর পাশে একটা ফাঁকা চেয়ারে গিয়ে বসল।

তাকে দেখে শিশির চ্যাটার্জি উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, 'এ তো সেই সাংবাদিক। এ এখানে কী করছে?'

সুব্রতও দাঁড়িয়ে উঠল। আদিত্যকে উদ্দেশ্য করে বলল, আপনি তো চৌধুরিবাড়ির ইতিহাস লিখছিলেন। এখানে পৌঁছে গেলেন কী করে? এখানে আমাদের পারিবারিক কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। একান্তই গোপনীয় আলোচনা। আমার মনে হয় না এখানে আপনার বিন্দুমাত্র প্রবেশাধিকার আছে।'

আদিত্য সোহিনীর দিকে তাকাল। সোহিনী বলল, 'আদিত্য মজুমদারকে শুদ্ধশীল ব্যানার্জিই এখানে আসতে বলেছেন। কেন বলেছেন, সেটা উনিই বলবেন। আপনারা একটু ধৈর্য ধরে বসুন।'

আদিত্য লক্ষ করল একমাত্র শঙ্খমালার কোনও হেলদোল নেই। সে মৃদুমৃদু হাসছে। যেন আদিত্যর ছদ্ম-পরিচয়টা আগেই ধরে ফেলেছিল। মেয়েটা অসাধারণ বুদ্ধিমতি। বুদ্ধিটা ঠিক কাজে লাগাতে পারলে অনেকদূর পৌঁছে যেত। ঠিক ছটা বেজে তেত্রিশ মিনিটে শুদ্ধশীল ব্যানার্জি ঘরে ঢুকলেন, সঙ্গে তাঁর জুনিয়র।

হাতের কাগজপত্র টেবিলের ওপর রেখে শুদ্ধশীল বললেন, আমার তিন মিনিট দেরি হয়ে গেল, তার জন্য ক্ষমা চাইছি।'

আদিত্যর মনে হল, তিন মিনিট পরে ঢুকেছে তো কী হয়েছে? যত সব সাহেবি আদিখ্যেতা।

শুদ্ধশীল বললেন, 'আপনারা চা খেয়েছেন তো?' দু'একজন সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল। আদিত্য স্থির হয়ে বসে রইল। সে পৌঁছনোর আগেই চা-পর্ব শেষ হয়ে গিয়েছিল।

শুদ্ধশীল বললেন, 'দুজনকে বাদ দিয়ে আপনারা সকলেই সকলকে চেনেন। এই দুজনের একজন সৌরাশিস ঘোষ বাঁ দিকের কোনায় বসে আছেন। উনি পিস ইন্টারন্যাশানাল বলে একটি আন্তর্জাতিক এনজিও-র ভারত-প্রধান। আর সোহিনী মৈত্রর ডানদিকে বসে আছেন আদিত্য মজুমদার যিনি একজন বেসরকারি গোয়েন্দা। এঁরা দুজন কেন এখানে এসেছেন সেটা যথাসময় স্পষ্ট করা হবে। এবার তাহলে আমরা শুরু করতে পারি। আমি আজ আপনাদের সামনে সদ্য-প্রয়াত মন্দাকিনী চৌধুরির উইলটি পড়ে শোনাব। আপনারা সকলেই জানেন সুবীর চৌধুরি উইল করে পুরো সম্পত্তি তাঁর স্ত্রী মন্দাকিনী চৌধুরিকে দিয়ে গিয়েছিলেন। শঙ্খমালা সেন এবং সোহিনী মৈত্রর জন্যে শুধু একটা মাসোহারার ব্যবস্থা ছিল। শঙ্খদীপ চৌধুরির জন্য কিছুই ছিল না। মন্দাকিনী চৌধুরি যেরকম উইলই করুন না কেন, মন্দাকিনীর মৃত্যুর পরেও এই মাসোহারা শঙ্খমালা এবং সোহিনী পেয়ে যাবেন, যতদিন তাঁরা বেঁচে থাকবেন, যেহেতু এই মাসোহারা সুবীর চৌধুরি তাঁদের দিয়ে গিয়েছিলেন। এ-নিয়ে কারও কোনও প্রশ্ন আছে?' শুদ্ধশীল ব্যানার্জি একটু থামলেন।

সকলকে নিশ্চুপ দেখে শুদ্ধশীল ব্যানার্জি আবার শুরু করলেন। 'যেহেতু পুরো সম্পত্তি গিফট করে মন্দাকিনীকে দেওয়া হয়েছিল তাই মন্দাকিনী সেই সম্পত্তি যাকে খুশি তাকে দিয়ে যেতে পারতেন। তবে দীর্ঘদিন তিনি কোনও উইল করেননি। হয়তো তিনি ধরে নিয়েছিলেন উইল করার জন্য অনেকটা সময় তাঁর হাতে আছে। লক্ষণীয় যে, মারা যাবার সপ্তাহ খানেক আগে তিনি একটা উইল করেছিলেন। কেন উইল করছেন সেটা নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন।'

অনেকক্ষণ আদিত্যর মনটা চা-চা করছিল, এবার সে উতুল্ল হয়ে দেখল, উর্দিপরা বেয়ারা আবার চা নিয়ে ঘরে ঢুকছে। চা পরিবেশন করতে কিছুটা সময় চলে গেল। বেয়ারা চা দিয়ে বেরিয়ে যাবার পর শুদ্ধশীল আবার বলতে লাগলেন। 'কয়েকটি সাম্প্রতিক ঘটনার ফলে মন্দাকিনী চৌধুরির ধারণা হয়েছিল কেউ তাঁকে খুন করার চেষ্টা করছে। এগুলিকে ঘটনা না বলে অবশ্য দুর্ঘটনা বলাটাই ঠিক। এই দুর্ঘটনাগুলির কথা

আপনারা সকলেই জানেন, তবু একবার সংক্ষেপে মনে করিয়ে দিচ্ছি। প্রথম দুর্ঘটনা ঘটে বছর খানেক আগে, তার ছিঁড়ে লিফট নীচে পড়ে যায়। এরপর আরও দুটো ঘটনা ঘটে। কিছুদিন পরে ডায়মন্ডহারবার রোডের ওপর মন্দাকিনীর গাড়ির অ্যাক্সিডেন্ট হয় এবং আরও কিছুদিন পরে দার্জিলিং যাবার পথে তাঁর গাড়ির ব্রেক ফেল করে। এই ঘটনাগুলির যে-কোনও একটিতেই তিনি মারা যেতে পারতেন। তাই তাঁর ভয় পাবার যথেষ্ট কারণ ছিল। তাঁর ভয় যে অমূলক নয় সেটার সব থেকে বড় প্রমাণ তাঁর অপঘাত মৃত্যু।'

শুদ্ধশীল ব্যানার্জি থামলেন। গেলাস থেকে এক ঢোঁক জল খেলেন। ঘরে অখণ্ড নিস্তব্ধতা। আবার বলতে শুরু করলেন শুদ্ধশীল।

'সত্যিই কেউ তাকে খুন করার চেষ্টা করছে কিনা নিশ্চিত হবার জন্য মন্দাকিনী আদিত্য মজুমদার নামে একজন বেসরকারি গোয়েন্দাকে নিয়োগ করেন। আগেই বলেছি, আদিত্য মজুমদার আজ আমাদের মধ্যেই উপস্থিত আছেন, আমি সকলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছি।'

আদিত্য লক্ষ রাখছিল তার আসল পরিচয় পেয়ে কার কী মুখের অবস্থা হয়। সুব্রতকে বিস্মিত দেখাল, শঙ্খমালা নির্বিকার, শিশির চ্যাটার্জি পরিষ্কার ক্রুদ্ধ। শৈলেন ড্রাইভারকে দেখে মনে হল, কী ঘটছে সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। সৌরাশিস বলে এনজিও-র লোকটির মুখ দেখে মনে হল সে খুব মন দিয়ে সব কিছু শুনছে। শুদ্ধশীল আবার শুরু করলেন।

'ছদ্ম-পরিচয়ে আদিত্য মজুমদার আপনাদের সকলের সঙ্গেই কথা বলেন, শঙ্খদীপের সঙ্গেও, যিনি এখানে আসবেন বলেছিলেন কিন্তু এখনও এসে পৌঁছতে পারেননি। আদিত্যবাবু তাঁর তদন্তের একটি রিপোর্ট মন্দাকিনী চৌধুরিকে জমা দেন। তাতে পরিষ্কার বলা আছে মন্দাকিনীর ভয় মোটেই অমূলক নয়। এই রিপোর্টটি নিয়ে মন্দাকিনী আমার কাছে আসেন এবং বলেন তিনি খুব তাড়াতাড়ি একটা উইল করতে চান। তাঁর উইলটি সংক্ষেপে এইরকম যদি তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিক কারণে হয় তাহলে তাঁর সম্পত্তি সোহিনী, শঙ্খদীপ এবং শঙ্খমালার মধ্যে সমানভাবে ভাগ হয়ে যাবে। এছাড়া চৌধুরি বাড়ির বিশ্বস্ত কর্মচারী হিসেবে শিশিরবাবু এবং শৈলেনবাবুও একটা করে ভাল মাসোহারা পাবেন। কিন্তু যদি কোনও অস্বাভাবিক কারণে তাঁর মৃত্যু হয়, যার মধ্যে খুন এবং অ্যাক্সিডেন্ট দুটোই ধরা হচ্ছে, তাহলে তাঁর সম্পত্তির সিংহভাগ পাবে পিস ইন্টারন্যাশানাল বলে একটি আন্তর্জাতিক এনজিও, সুইজারল্যান্ডে যাদের হেড আপিস এবং যাদের ইন্ডিয়ান কান্ট্রি হেড সৌরাশিস ঘোষ আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। এই এনজিও-টির কাজকর্মের সঙ্গে মন্দাকিনী অনেক দিন ধরে পরিচিত। অতীতে এদের তিনি অনেক টাকাপয়সাও দিয়েছেন। শঙ্খমালা, শঙ্খদীপ, সোহিনী, শিশিরবাবু, শৈলেনবাবু সকলের জন্যই অবশ্য একটা করে মাসোহারা থাকছে, তবে তার কোনওটার পরিমাণই খুব বেশি নয়। আসলে, এটা আমি খোলাখুলিই বলছি, মন্দাকিনীর ধারণা হয়েছিল, তাঁর খুব চেনাশোনাদের মধ্যেই কেউ তাঁকে খুন করার চেষ্টা করছে। তিনি ধরে নিয়েছিলেন, তাঁর খারাপ কিছু ঘটলে টাকার লোভে তাঁর কোনও আত্মীয়ই সেটা ঘটাবে। তাই এই রকম একটা উইল করে তিনি বাঁচতে চেয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, এই রকম একটা উইল আছে জানতে পারলে তাঁকে মারার কোনও মোটিভ কোনও নিকট আত্মীয়ের থাকবে না। তিনি ঠিক করেছিলেন, দার্জিলিং থেকে ফিরে উইলের কথা সবাইকে জানিয়ে দেবেন। দুর্ভাগ্যবশত, সেই সুযোগটা তিনি আর পেলেন না।'

ঘরের আবহাওয়া রীতিমত ভারী হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকেরই চেহারায় হতাশার ছাপ যদিও মুখে কেউ কিছু বলছে না। শঙ্খমালা এতক্ষণ স্থির হয়ে বসেছিল, সেও এখন তার স্বামীকে ফিসফিস করে কিছু বলছে।

সুব্রত হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে উত্তেজিতভাবে বলল, 'মন্দাকিনী চৌধুরি যে মারা গেছেন তার প্রমাণ কী? বডিটাই তো পাওয়া যায়নি।'

'এটা তো খুব সঙ্গত একটা প্রশ্ন। পুলিশ বলছে, মন্দাকিনী মারা গেছেন, কিন্তু আপনারা সেটা কোর্টে কনটেস্ট করতেই পারেন।'

'কিন্তু কনটেস্ট করে লাভ কি?' সোহিনী জিজ্ঞেস করল।

'যদি কোর্ট মনে করে মন্দাকিনী মারা গেছেন এটা এখনও ঠিকমতো প্রমাণিত নয় তাহলে আইন অনুযায়ী সাত বছর তাঁর ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এটা নিয়ে ম্যাডরাস হাইকোর্টের ২০১৬ সালের একটা রায় আছে। মহামান্য ম্যাডরাস হাইকোর্ট বলছেন, যদি কোনও ব্যক্তি সাত বছর ধরে মিসিং থাকে, তাহলে তাকে মৃত বলে ধরে নিতে হবে। মৃত্যুর দিনটা কিন্তু ধার্য হবে যেদিন মিসিং থাকার সাত বছর কমপ্লিট হল সেই দিনটা থেকে। এবার আপনারাই ভেবে দেখুন মন্দাকিনী চৌধুরির মৃত্যুটা কনটেস্ট করবেন কিনা।' শুদ্ধশীল বিলিতি কায়দায় শ্রাগ করলেন।

'খুব লাভ হবে বলে মনে হচ্ছে না, ' সুব্রত সোহিনীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'সাত বছরের মধ্যে যদি মাম ফিরে না আসে তাহলে সাত বছর পরে নিশ্চয় এই উইলটাই ইমপ্লিমেন্টেড হবে। আর এই সাত বছর নিশ্চয় এখনকার ব্যবস্থাটাই চলবে। আর যদি ফিরে আসে তাহলে তো এখনকার ব্যবস্থাটাই চালু থাকবে। ইন আইদার কেস আমরা কেউ বিরাট সম্পত্তির মালিক হচ্ছি না। কি, ঠিক বললাম, মিঃ ব্যানার্জি?'

'পুরোটা ঠিক নয়, মিঃ সেন। যদি সাত বছরের মধ্যে মন্দাকিনী ফিরে না আসেন তাহলে তো যেটা বললাম সেটা হবে। কিন্তু যদি ফিরে আসেন এবং ইভেনচুয়ালি ওঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়, তাহলে পিস ইন্টারন্যাশানাল কিছুই পাবে না। সেদিক থেকে দেখলে আপনারা মন্দাকিনীর মৃত্যুটা কোর্টে কনটেস্ট করতে পারেন। যতদিন না মন্দাকিনীর মৃত্যু প্রমাণিত হচ্ছে, ততদিন কোম্পানি চালাবে বোর্ড অফ ডিরেক্টারস। তাঁদেরই মধ্যে কাউকে মন্দাকিনীর বদলে চেয়ারম্যান নির্বাচন করা হবে। তখনও কিন্তু কোম্পানির মালিকানা পিস ইন্টারন্যাশানালের হাতে যাচ্ছে না। আর সুবীর চৌধুরির দিয়ে যাওয়া ভাতা যাঁরা পেতেন তাঁরা তো সেটা সব অবস্থাতেই পাচ্ছেন।'

'একটা প্রশ্ন করতে পারি?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল। সকলের দৃষ্টি তার দিকে ফিরল। উত্তরের অপেক্ষা না করেই আদিত্য বলল, 'ধরা যাক ভবিষ্যতে কখনও প্রমাণিত হল সুবীর চৌধুরি মারা যাবার পর মন্দাকিনী চৌধুরি কোনও পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, তাহলে মন্দাকিনী চৌধুরির বর্তমান উইলের কি হবে?'

'ভেরি গুড কোয়েশ্চেন।' শুদ্ধশীল চৌধুরি বললেন, 'সুবীর চৌধুরির উইলে স্পষ্ট করে লেখা আছে, যদি কখনও প্রমাণিত হয় মন্দাকিনী কখনও, সুবীর চৌধুরির সঙ্গে বিয়ে হবার পর, কোনও পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, তাহলে মন্দাকিনীর করা উইল সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যাবে। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে এর মানে হল, পিস ইন্টারন্যাশানাল সম্পত্তিটা এই শর্তে পাচ্ছে যে ভবিষ্যতে কখনও মন্দাকিনী চৌধুরি আনফেথফুল প্রমাণিত হলে সম্পত্তির মালিকানা তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ পিস ইন্টারন্যাশানাল কোম্পানির মূলধনে কখনোই হাত দিতে পারবে না, যেহেতু সেই মূলধন তাদের কখনও ফিরিয়ে দিতে হতেও পারে, তবে কোম্পানির আয়ে তাদের পূর্ণ অধিকার থাকবে। মালিকানা পাবার পর কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরও তারাই ঠিক করবে। আর কোনও প্রশ্ন আছে?'

আর কারও কোনও প্রশ্ন আছে বলে মনে হল না।

শুদ্ধশীল ব্যানার্জি বললেন, 'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন, আজ তাহলে আমাদের মিটিং শেষ করছি। আপনাদের সবার কাছেই আমার নম্বর দেওয়া আছে। দরকার হলে আমাকে ফোন করবেন। আই শ্যাল বি ডিলাইটেড টু হেল্প।'

আর ঠিক এই সময় লম্বা কোলকুঁজো একটা লোক ঘরে ঢুকল। আদিত্য প্রথমে তাকে চিনতেই পারেনি। তার দামি গ্রীষ্মকালীন স্যুট পরা গা থেকে মদ এবং ফরাসি পারফিউম মেশানো একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার করে কামানো। তারপর আদিত্য লোকটাকে চিনতে পারল। এ তো শঙ্খদীপ চৌধুরি! তাকে দেখে মনে হচ্ছে তার দারিদ্র ঘুচে গেছে।

শঙ্খদীপ চারদিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যালো এভরিবডি, আমার একটু দেরি হয়ে গেল। আমাকে মাফ করবেন। আই ওয়াজ হেল্ড আপ উইথ ইম্পর্টেন্ট বিসনেস। হোপ দ্য পার্টি ইজ স্টিল অন।'

'অন দ্য কন্ট্রারি উই আর থ্রু।' শুদ্ধশীল শান্তভাবে বললেন, 'আমি মন্দাকিনী চৌধুরির নতুন উইলটা সকলকে শোনালাম। মন্দাকিনী তাঁর সমস্ত সম্পত্তি পিস ইন্টারন্যাশানাল বলে একটা এনজিওকে দিয়ে গেছেন। আপনারা প্রায় কিছুই পাচ্ছেন না। আপনি ডিটেলটা আমার জুনিয়র সাত্যকি রায়ের কাছ থেকে শুনে নিতে পারেন।'

আদিত্য ভেবেছিল শঙ্খদীপ একটা অস্বস্তিকর নাটক শুরু করবে। কিন্তু সে আশ্চর্য হয়ে দেখল শঙ্খদীপ সেরকম কিছুই করল না। দুহাতে কপাল ঢেকে বসে পড়ল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'দ্যাট বিচ! দ্যাট বিচ! লেট হার সোলরটইন হেল। আমাদের খানদানটাকে শেষ করে দিল। আমিও ছাড়ব না। সব ফাঁস করে দেব। সব ফাঁস করে দেব।'

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

(১)

আজকাল সকালে আদিত্যর ঘুম ভাঙতে একটু দেরি হচ্ছে। গরমকালে এমনিতে তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙে যাবার কথা। কিন্তু আদিত্যর গরমের মধ্যে ঘুমোনো অভ্যাস হয়ে গেছে। তার ঘুম ভাঙে রাস্তার উল্টোদিকে চায়ের দোকানটা খুললে মানুষজনের কথাবার্তায়। জানলাটা খোলা থাকে বলে কথাবার্তা সরাসরি আদিত্যর ঘরে ঢুকে তার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। এখন ফুটবল বিশ্বকাপ চলছে। অনেকেই নিশ্চয় রাত জেগে খেলা দেখছে, তাই পরদিন সকালে দেরি করে চায়ের দোকানে আসছে। ফলে একদম সকালের দিকে চায়ের দোকানটা ফাঁকাই থাকছে। আদিত্যর ফুটবল নিয়ে তেমন উৎসাহ নেই। তবে ফুটবলের কল্যাণে সে যে একটু বেশিক্ষণ ঘুমোতে পারছে এর জন্য সে ফুটবল-প্রেমীদের কাছে কৃতজ্ঞ।

বলরাম চা এনে দরজা ধাক্কা দিচ্ছিল। দরজা খুলে দিতে চা-বিস্কুট টেবিলে রাখল। আদিত্য বাথরুম থেকে মুখ ধুয়ে বেরিয়ে দেখে বলরাম তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

'কিছু বলবি?'

'হ্যাঁ, বলছিলাম, আমার দাদার মেয়েটা এবার উচ্চ মাধ্যমিক পাস করল। বাহাত্তর পার্সেন্ট নম্বর পেয়েছে, অঙ্কতে চুরাশি। টানাটানির সংসারেও দাদা মেয়েকে কলকাতার কলেজে পড়াতে চায়। দাদার এক শালা ঠাকুরপুকুরের দিকে থাকে, তারা আমার ভাইজিকে রাখতে রাজি হয়েছে। এখন ওদিকেই কোনও কলেজে ভর্তি হওয়া দরকার। বেশি যাতায়াত করতে পারবে না। যাতায়াতের খরচও তো আছে। ওদিকটায় তোমার কোনও কলেজে চেনাশোনা আছে? আমাদের একটু দেরি হয়ে গেছে।'

'কী নিয়ে পড়তে চায়?'

'অঙ্ক। মেয়েটার আশ্চর্য অঙ্কের মাথা। যে অঙ্কই দাও ঠিক করে দেবে। ইংরিজির জন্যেই মোট নম্বরটা কমে গেল।'

'দাঁড়া, একটু ভেবে দেখি। ঠাকুরপুকুরের দিকে কলেজ?'

হঠাৎ আদিত্যর মনে পড়ে গেল। ঠাকুরপুকুরের দিকে সুব্রত সেন পড়ায় না? অঙ্কই তো পড়ায়। তার সঙ্গে একবার দেখা করতে পারলে ভাল হত। এই ছুতোয় একবার দেখা তো করাই যায়। কলেজটার কী যেন নাম? কলেজের নামটা আদিত্যর কিছুতেই মনে পড়ল না। নোটবই খুলে দেখল নামটা অডিও থেকে নোট করা আছে। রামকৃষ্ণ কলেজ।

সে বলরামকে বলল, 'বিকেলের দিকে আমার সঙ্গে যেতে পারবি? ঠাকুরপুকুরের দিকে রামকৃষ্ণ কলেজ আছে, সেখানে আমার চেনা একজন অঙ্ক পড়ায়। কিছু করবে কিনা জানি না, তবে একবার বলে দেখতে পারি। বলে দেখতে তো দোষ নেই।'

'বিকেল হলে যেতে পারি। তবে সন্ধের আগেই চলে আসতে হবে। বাবুরা আপিস থেকে ফিরলেই আমার খোঁজ পড়বে। দুপুর হলে আর একটু ভাল হতো।'

'দুপুরে হবে না। লোকটাকেই পাওয়া যাবে না। ওদের সন্ধের কলেজ। তুই একদিন ছুটি নে। ফিরতে ফিরতে রাত্তির হয়ে যাবে।'

'দেখি ম্যানেজারবাবুকে বলে।'

'যদি নেহাতই ছুটি না পাস, তাহলে আমি একাই চলে যাব। তোর কাছে তোর ভাইঝির মার্কশিটের জেরক্স আছে তো?'

'আছে।'

ম্যানেজার লোকটা অতি জঘন্য, বলরামকে কিছুতেই ছুটি দিল না। শেষ পর্যন্ত আদিত্যকে একাই যেতে হল। ধর্মতলা থেকে পৈলানের বাস ধরে আদিত্য যখন ঠাকুরপুকুরে এসে নামল তখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা

বেজে গেছে। রামকৃষ্ণ কলেজটা ডায়মন্ডহারবার রোডের ওপরেই, প্রায় বাস স্টপের গায়ে। নতুন বিল্ডিং। একদিকে এখনও কনস্ট্রাকশন চলছে। ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড় ঠেলে দোতলায় উঠল আদিত্য। গেটেই দারোয়ান বলে দিয়েছিল স্টাফরুমটা দোতলায়। একটা দরজার গায়ে লেখা রয়েছে স্টাফরুম, আদিত্য স্টাফরুমের সামনে দাঁড়ানো খাঁকি পোশাক পরা একজনকে জিজ্ঞেস করল, 'প্রফেসর সুব্রত সেন এসেছেন?'

'হ্যাঁ, এই একটু আগে এলেন। ভেতরে চলে যান, দেখতে পাবেন। বাঁ দিকের কোনায় উনি বসেন।'

আদিত্য ভেতরে ঢুকে দেখল, বেশ বড় একটা ঘর, মাঝে দু-তিনটে টেবিল জোড়া দিয়ে একটা মস্ত টেবিল বানানো হয়েছে। সেই টেবিলের দুদিকে চেয়ার। কিছু চেয়ারে মাস্টার-মশাইরা বসে আছেন, কিছু চেয়ার ফাঁকা। এছাড়াও ঘরের দুধারে কয়েকটা ইজি-চেয়ার রয়েছে। দু-একজন ইজি-চেয়ারে বসে বিশ্রাম করছেন বা কিছু একটা পড়ছেন। আদিত্য এদিক-ওদিক তাকিয়ে সুব্রত সেনকে একটা ইজি-চেয়ারের ওপর দেখতে পেল।

'আমাকে চিনতে পারছেন? আমি আদিত্য মজুমদার। কাল মর্গ্যান ব্যানার্জির আপিসে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।' আদিত্য এগিয়ে গিয়ে বলল।

'খুব মনে পড়ছে। সেদিন খুব ঠকিয়েছিলেন আমাকে। মালা অবশ্য প্রথম থেকেই বলছিল, লোকটা যা বলছে সেটা ও নয়। তা এখানে কী মনে করে? আমি কিন্তু আপনার কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই।'

'না, না। আমি গোয়েন্দাগিরি করতে আসিনি। আমার এক পরিচিত মেয়ে, গ্রামে থাকে, সহরে এসে আপনাদের এখানে অঙ্ক অনার্স পড়তে চায়, আপনি কি তার ভর্তির ব্যাপারে কিছু সাহায্য করতে পারেন?'

'অ, অ্যাডমিশন। মার্কশিট এনেছেন?' সুব্রত সেনকে খানিকটা নিশ্চিন্ত দেখাল।

মার্কশিট ভাল করে দেখে সুব্রত সেন বলল, 'নম্বর তো ভালই পেয়েছে। আমাদের এখানে যারা পড়তে আসছে তাদের অনেকের থেকেই ভাল। তা এখানে পড়তে চায় কেন? এ তো আরও ভাল জায়গায় পেয়ে যাবে। আমাদের এখানে একেবারে অগারা আসে।'

'মেয়েটি যে আত্মীয়র বাড়িতে থেকে পড়বে তিনি ঠাকুরপুকুরে থাকেন। মেয়েটি বেশি দূরের কলেজে যেতে পারবে না।'

'তাহলে তাকে বলুন অরিজিনাল মার্কশিট আর টাকা-পয়সা নিয়ে কালকেই চলে আসতে। কালই ভর্তি হয়ে যেতে পারবে। ভর্তি হতে কত লাগবে নিচের ক্যাশ অফিস থেকে জেনে নেবেন। ছটা অব্দি অফিস খোলা আছে। তবে ওকে ডে-তে ভর্তি হতে বলুন। ডে-টা নাইটের থেকে একটু ভাল।'

ঠিক এই সময় সুব্রত-র মোবাইলটা বেজে উঠল। সুব্রত ফোন ধরে বলল, 'বলো।'

মনে হয় চেনা কেউ, হয়তো শঙ্খমালা। যিনি ফোন করেছেন তিনি নিশ্চয় ওদিক থেকে কিছু একটা বললেন, কী বললেন আদিত্যর পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না, কিন্তু আদিত্য লক্ষ করল সুব্রতকে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে। সে আদিত্যর দিকে একবার চকিতে তাকিয়ে নিয়ে ফোনে বলল, 'আমি একটু বাদে কল করছি।'

'কোনও খারাপ খবর?' আদিত্য ভদ্রতাবশত জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, একটা খারাপ খবর। মালা ফোন করেছিল। বলল, ওর দাদা শঙ্খদীপের একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। পুলিশ থেকে জানিয়েছে। কতটা সিরিয়াস অ্যাক্সিডেন্ট জানি না। মালাকে খুব আপসেট মনে হল। আপনি আজ আসুন, আমাকে একটু বাড়ি যেতে হবে।' সুব্রত উঠে দাঁড়াল।

আদিত্যর আরও দু'একটা প্রশ্ন করার ছিল, কিন্তু এর পরে তো আর দাঁড়ানো যায় না। সে সুব্রতকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্টাফরুম থেকে বেরিয়ে এল। শঙ্খদীপের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? কীভাবে হল? নেশাখোররা অবশ্য চিরকালই অ্যাক্সিডেন্ট-প্রোন। আদিত্য সিঁড়ি দিয়ে নামার আগে একবার পেছন ফিরে দেখল, সুব্রত স্টাফরুম থেকে বেরিয়ে এসে মোবাইলে কথা বলছে।

ঠাকুরপুকুর থেকে ফেরার পথে আদিত্যকে ল্যাপটপটা নেবার জন্য একবার আপিসে আসতেই হল।

ল্যাপটপটা নিয়ে আপিস থেকে বেরোতে যাবে এমন সময় গৌতমের ফোন এল।' শোন, সাংঘাতিক ব্যাপার। কাল রাত্তিরে ব্যারাকপুরের কাছে সুবীর চৌধুরির কুলাঙ্গার পুত্র শঙ্খদীপ চৌধুরির লাস পাওয়া গেছে। মনে হচ্ছে খুন। একটা লরি চাপা দিয়ে চলে গেছে। হিট অ্যান্ড রান। মাথায় একটা বড় আঘাত লেগেছিল যেটা লরি চাপা দেবার আগেও হতে পারে আবার লরি চাপা দেবার ফলেও হতে পারে। চোখে দেখে মনে হচ্ছে প্রথমটা। ফরেন্সিক রিপোর্ট পেলে আরও ভাল করে বোঝা যাবে। উন্মত্ত অবস্থায় ছিল। পেটে অনেকটা মদ পাওয়া গেছে। বডি ক্ষতবিক্ষত তবে চেনা যাচ্ছে। তাছাড়া সঙ্গের কাগজপত্র থেকেও বডি আইডেনটিফাই করা গেছে। কাগজপত্রের মধ্যে একটা ভিজিটিং কার্ড ছিল যাতে তোর নাম লেখা। কার্ডে যে ফোন নাম্বারটা দেওয়া আছে সেটাও তোর। যদিও তোর পরিচয় লেখা আছে ফ্রি-লান্স জার্নালিস্ট। সেটা অবশ্য কেন, তুই আমাকে বলেছিস। তুই ইন্টারেস্টেড হবি বলে তোকে জানালাম। তাছাড়া ইনভেস্টিগেশনের সময়ও তোকে লাগবে।'

গৌতমের শেষের দিকের কথাগুলো আদিত্যর মাথায় ঢুকছিল না। শঙ্খদীপ মারা গেছে? খুন হয়েছে? কালই তো দেখা হল। কী আফশোস! তার বোঝা উচিত ছিল শঙ্খদীপের বিপদের সম্ভাবনা আছে। এখন আর কিছু করার নেই।

আদিত্যকে চুপচাপ দেখে গৌতম আবার বলল, 'কী রে, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?'

'না না ঘুমোইনি। শকটা হজম করার চেষ্টা করছিলাম। শঙ্খদীপ চৌধুরির সঙ্গে আমার দুবার দেখা হয়েছিল। একবার তার বান্ধবীর বাড়িতে, যে সাক্ষাৎকারের কথা তোকে আগেই বলেছি। গতকাল সন্ধেবেলা শেষ দেখা। মর্গ্যান ব্যানার্জির আপিসে। আমার বোঝা উচিত ছিল লোকটা ভালনারেবল অবস্থায় আছে। আমার গুন্ডা আক্রমণের বৃত্তান্ত, মন্দাকিনীর অ্যাক্সিডেন্ট এবং এই খুন একই সুতোয় জড়িত মনে হচ্ছে। শঙ্খদীপের খুনের ব্যাপারে কাউকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে?'

'অ্যারেস্ট এখনও করা হয়নি, তবে একজনকে সাসপেক্ট করা হচ্ছে। নাম মাইকেল ডিসুজা। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের একটা অত্যন্ত শেডি বারে বাউন্সারের কাজ করে। কিছুদিন আগে শঙ্খদীপ চৌধুরির সঙ্গে ঝামেলা হয়েছিল। মাইকেল গা ঢাকা দিয়েছে। তবে পুলিশের চোখ এড়িয়ে বেশি দিন থাকতে পারবে না।'

'মার্থা বলে একটি মেয়ের সঙ্গে শঙ্খদীপ থাকত। তার সঙ্গে কথা বলেছিস?'

'কথা বলব কী, সে তো কেঁদেই আকুল। সত্যি বলছি ভাই, এমন সতীলক্ষ্মী বেশ্যা আমি আমার পুলিশ জীবনে দেখিনি। যাইহোক, অনেক ধমক-ধামকের পর তাকে দিয়ে কথা বলানো গেল। সে বলল, ইদানীং শঙ্খদীপের হাতে কিছু টাকা এসেছিল। কোথা থেকে এসেছিল মার্থা জানে না। সেই টাকা সৎকাজে ব্যয় করার জন্য খুন হওয়ার দিন রাত্তিরবেলা শঙ্খদীপ তার এক পুরোনো ইয়ারের সঙ্গে বারে যায়। এটা সেই বার যেখানে মাইকেল কাজ করে এবং যেখানে মাস খানেক আগে শঙ্খদীপের সঙ্গে মাইকেলের ঝামেলা হয়েছিল। ইয়ারের নাম দিলবর সিং। দিলবরের সেদিন কী একটা কাজ ছিল বলে সে তাড়াতাড়ি অর্থাৎ রাত্তির এগারোটা নাগাদ বার ছেড়ে চলে যায়। অনেকেই তাকে চলে যেতে দেখেছে। মার্থাও দেখেছে। সে ওই বারেই ছিল। শঙ্খদীপও বারে থেকে গিয়েছিল। এরপর শঙ্খদীপের টেবিলে মাইকেল এসে বসে এবং রাত্তির প্রায় একটা অব্দি তারা এক সঙ্গে মদ্যপান করে। এটারও মার্থা সহ অনেকে সাক্ষী। একটায় বার বন্ধ হয়ে যায়। শঙ্খদীপ সেদিনের সমস্ত খরচ মিটিয়ে দেয় এবং মার্থাকে বলে সে আর মাইকেল একটু হাঁটতে যাচ্ছে, আধঘণ্টার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসবে। মার্থা ভেবেছিল মাইকেলের সঙ্গে শঙ্খদীপের ভাব হয়ে গেছে। মাইকেল আর শঙ্খদীপ পার্ক স্ট্রিটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে চলে যায়, মার্থা বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু বলাই বাহুল্য শঙ্খদীপ আর ফেরে না। সংক্ষেপে এই হল মার্থার গল্প।

'তোরা মার্থার বাড়িটা সার্চ করেছিস?'

'বাড়ি তো নয়, শুধু একটা ঘর। তারই মধ্যে থাকা, রান্নাবান্না, ব্যবসা-বাণিজ্য। খুব ভাল করে সার্চ করিনি, ওপর ওপর দেখেছি। তুই বললে আর একবার নয় সার্চ করা যাবে।'

'আমি সার্চের সময় থাকতে পারি?'

'অবশ্যই পারিস।'

একটু পরেই বিমলের ফোন এল। আদিত্য তখন বাড়ি পৌঁছে গেছে।

'তোমাকে তো ফোনে পাওয়াই যায় না। কোথায় থাক? আদিত্য একটু বিরক্ত হয়েছে।

'একটু অসুবিধের মধ্যে ছিলুম স্যার। কাল আপিসে থাকবেন? একটু দেখা করতাম।'

'চলে এস তাহলে।'

পরদিন বিমল এল প্রায় বারোটায়। যখন আসবে বলেছিল তার এক ঘণ্টা পরে।

'ব্যাপার কি?'

'খুব সরি স্যার। ট্রেন মাঝপথে প্রায় এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইল। আর চলেই না। একদিকে নাকি লাইন সারাই হচ্ছে। তাই সিঙ্গল লাইন করে দিয়েছে। এবার শিক্ষা হয়ে গেল। পরের বার আগের ট্রেনটা ধরব।'

'ট্রেন কেন? কোথা থেকে আসছ?'

'তাই তো স্যার বড় ভুল হয়ে গেছে। আসল কথাটাই বলা হয়নি। আমি ফেমিলি নিয়ে গড়িয়ায় যে বস্তিটায় থাকতাম সেখানে হাইরাইজ উঠছে। বস্তি তুলে দিল। আমাদের প্রত্যেককে কিছু টাকাও দিয়েছে। কোথায় যাই? আপাতত বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে শশুরবাড়িতে উঠেছি। গোবরডাঙ্গায়। ওখান থেকেই রোজ যাতায়াত করছি। ঠিক গোবরডাঙ্গাও নয়। গোবরডাঙ্গা থেকে ভ্যানরিক্সায় আরও কুড়ি মিনিট। ওখানে মোবাইলের টাওয়ার পাওয়া যায় না স্যার। কলকাতায় একটা বাড়ি খুব খুঁজছি, কিন্তু কোথায় বাড়ি? ছেলেমেয়ের ইস্কুল যেতে খুব অসুবিধে হচ্ছে স্যার।'

'তাহলে তো খুবই মুস্কিলে পড়লে দেখছি। আমার একটা ছোট কাজ ছিল। কাজটা রাত্তিরে করতে হবে। কিন্তু কাজটা করে গোবরডাঙ্গা ফিরতে পারবে কিনা জানি না। তোমার তো আবার নাইট ডিউটি। সেখান থেকেও ছুটি নিতে হবে। এত কিছু পারবে কি?'

'আপনি কাজটা বলুন স্যার, আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব।'

'শোনো, কিছুদিন আগে শঙ্খদীপ চৌধুরি বলে একজনের খবর এনে দিয়েছিলে, মনে আছে?'

'নিশ্চয় মনে আছে স্যার, এই তো সেদিনের ঘটনা।'

'লোকটা খুন হয়েছে। ব্যারাকপুরে লাস পাওয়া গেছে। খুন হবার আগে লোকটার হাতে কিছু টাকা এসেছিল। কোথা থেকে এল? এই খবরটা জোগাড় করতে হবে। এর জন্য সেই বারে আবার যেতে হবে। গিয়ে দেখতে হবে সেখানে কেউ কিছু জানে কিনা। পারবে?'

'পারব স্যার। কাজের জায়গা থেকে না হয় এক রাত্তির ছুটি নিয়ে নেব। আগের বারও তাই নিয়েছিলাম। কিন্তু খবর জোগাড় করতে করতে যদি মাঝরাত্তির হয়ে যায় তাহলে ট্রেন বন্ধ হয়ে যাবে। তখনই মুস্কিল।'

'তুমি এক কাজ কর। আমার এই আপিস ঘরের একটা ডুপ্লিকেট চাবি আছে সেটা তোমার কাছে রেখে দাও। খুব রাত্তির হয়ে গেলে এই আপিস ঘরে এসে শুয়ে পড়বে। আমি শ্যামলকে বলে রাখব। শ্যামলকে চেনো তো? আমাদের ম্যানেজার।'

'মুখ চিনি স্যার। তবু আপনি বলে রাখলে ভাল হয়।'

'আচ্ছা, আর এই দু-হাজার টাকা রাখো। ওখানে খরচা করতে হবে।'

আদিত্য মানিব্যাগ থেকে একটা দু-হাজারের নোট বার করে বিমলকে দিল। বলল,

'আর কিছু জিজ্ঞেস করবে?'

'শঙ্কুবাবুর খুন সম্বন্ধে যদি আর কিছু জানা যেত'

'তার দরকার নেই। বলবে, তুমি কানাঘুষোয় শুনেছ শঙ্কুবাবু খুন হয়েছে। খবরটা সত্যি কিনা যাচাই করতে চাও। এটাও শুনেছ মরার আগে শঙ্কুবাবু কিছু টাকা পেয়েছিল। সেই টাকা কার কাছে আছে জানতে পারলে তুমি তার কাছে গিয়ে তোমার টাকা ফেরত চাইতে পার। শঙ্কুবাবু হ্যান্ডনোট কেটে তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল। সেই হ্যান্ডনোট তোমার কাছে আছে। ব্যাস, এইটুকুই।'

বিমল চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গৌতম ফোন করল।

'আমরা শঙ্খদীপের ফ্ল্যাটটা সার্চ করতে যাচ্ছি। আধঘণ্টার মধ্যে লালবাজার চলে আসতে পারবি?'

'অবশ্যই পারব। আমার জন্য অপেক্ষা করিস।' আদিত্যর আপিস থেকে লালবাজার হাঁটা পথে খুব বেশি হলে দশ মিনিট। এককাপ চা খাবার সময় আছে। আদিত্য মোবাইলে শ্যামলকে চা আনতে বলল।

(৩)

মার্থা আজ আর কান্নাকাটি করছে না। পুলিশের সঙ্গে আদিত্যকে দেখে একবার শুধু চমকে উঠেছিল। এখন একেবারে গুম মেরে বসে আছে। তার সামনে পুলিশের লোক তার এক চিলতে সংসার বেয়াব্রু করে দিচ্ছে। জাগতিক সম্পদ কী বা আছে তার সংসারে? একটু আগে স্টোভে সে ভাত রেঁধেছিল আর একটা চিকেনের তরকারি। ঠিক চিকেন নয়, চিকেনের ছাঁট, নাড়িভুঁড়ি, পাকস্থলী, যা আসলে কুকুর বেড়ালের খাদ্য, সেও হয়তো কুকুরকে খাওয়ানোর ওজুহাতেই সস্তায় বাজার থেকে কিনে এনেছে। কোনওটাই খাওয়া হয়নি এখনও। আদিত্য ভাবছিল, হাঁড়ির ঢাকা, ডেকচির ঢাকা সরে যাওয়া মানে পৃথিবীর কাছে যেন উলঙ্গ হয়ে যাওয়া। এটা একটা অপমান। প্রাইভেসিতে চরম আঘাত। একমাত্র আদিত্যই বোধহয় মার্থার অপমানটা বুঝতে পারছিল।

এছাড়া কিছু পুরোনো জামা-কাপড় ছিল আর পুরোনো হাতঘড়ি, বাসন-কোসন, ছুরি-কাঁচি, স্ক্রু-ড্রাইভার, চাবির গোছা, পাউডারের কৌটো, লিপস্টিক, ভুরু আঁকার পেনসিল, বিস্কুটের টিন, ফাঁকা হরলিক্স-এর শিশি, হাতল ভাঙা সুটকেস, তালা, ছুঁচ-সুতো ইত্যাদি টুকিটাকি, যা সংসারে বেঁচে থাকতে থাকতে মানুষের অজান্তেই জমে ওঠে। এসবের সঙ্গে একটা নতুন ভ্যানিটি ব্যাগ আর মেয়েদের কয়েক প্রস্থ নতুন পোশাক ও অন্তর্বাসও ছিল। নতুন ব্যাগ, পোশাক, অন্তর্বাস সবই বেশ দামি।

'এখানে তো কিছুই নেই।' গৌতম হতাশ গলায় বলল।

সেকথার উত্তর না দিয়ে আদিত্য মার্থার দিকে তাকিয়ে বলল,

'শঙ্খদীপ মারা যাবার আগে কিছু টাকা পেয়েছিল। বারে প্রচুর টাকা ওড়াচ্ছিল। তোমাকেও নতুন জামা, ব্যাগ কিনে দিয়েছে। শঙ্খদীপ কোথায় টাকা পেল?'

'আই ডোনট নো।' মার্থা সংক্ষিপ্ত কিন্তু দৃঢ়ভাবে বলল।

'পুলিশ ওকে বহুবার এই প্রশ্নটা করেছে। প্রত্যেকবার ওই একই উত্তর দিচ্ছে। কিন্তু আমার মনে হয় ও নিশ্চয় কিছু জানে।' গৌতম বলল।

আদিত্য জিনিসপত্রের স্তূপের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ টুক করে চাবির গোছাটা তুলে নিয়ে বেশ উৎফুল্ল গলায় বলল,

'যা পাবার পেয়ে গেছি। এবার আমরা এখান থেকে চলে যেতে পারি।'

চাবির গোছাটা তুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে মার্থার মুখে একটা পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। সে মরিয়া গলায় বলল, 'হোয়াট আর ইউ গোয়িং টু ডু উইথ দোজ কিস?'

'আই থিঙ্ক ওয়ান অফ দেম ইজ আ কি টু আ ব্যাঙ্ক লকার। ইট উইল সেভ আস আ লট অফ ট্রাবল ইফ ইউ টেল আস হুইচ কি অ্যান্ড হুইচ ব্যাঙ্ক।' আদিত্য ঠান্ডা গলায় বলল।

'আই ডোনট নো। শ্যাঙ্কি নেভার ডিসকাসড হিজ ফিনানশিয়াল ম্যাটারস উইথ মি।'

'দেন হোয়াই ডু ইউ লুক সো আপসেট?'

'আই অ্যাম নট আপসেট।'

মার্থা আবার মৌন হয়ে বসে আছে। গৌতম চাবির গোছাটা সঙ্গে নিয়ে একটা রসিদ লিখে দিল। বলল, 'আমাদের কাজ হয়ে গেলে এই চাবিগুলো ফিরিয়ে দেব।'

অনেক খুঁজেও কিন্তু মার্থার ঘর থেকে শঙ্খদীপ চৌধুরির কোনো ব্যাঙ্কের কাগজ বা পাশবই পাওয়া গেল না। ফেরার পথে গৌতম জিজ্ঞেস করল, 'চাবির কথা তোর মনে হল কেন?'

'দ্যাখ, খুন হওয়ার আগে শঙ্খদীপ চৌধুরির হাতে অনেক টাকা এসেছিল। কে টাকা দিল? এমনি এমনি তো কেউ টাকা দেবে না, আর শঙ্খদীপ চৌধুরি হঠাৎ অনেক টাকা রোজগার করে ফেলল, এটাও সম্ভব নয়। একমাত্র সম্ভাবনা, শঙ্খদীপ কাউকে ব্ল্যাকমেল করছিল। এবং যাকে ব্ল্যাকমেল করছিল সে-ই সম্ভবত শঙ্খদীপকে খুন করেছে। কিন্তু ব্ল্যাকমেল করার জন্য কিছু ইনক্রিমিনেটিং এভিডেন্স লাগে। সেটা শঙ্খদীপ নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে রেখেছিল। কোথায় রাখতে পারে? হয় মার্থার বাড়িতে কিংবা কোনও ব্যাঙ্কের লকারে। কিন্তু লকারে রাখলে লকারের তো একটা চাবি থাকবে। সেই চাবিটা আর পাঁচটা কেজো-অকেজো চাবির সঙ্গে লুকিয়ে রাখলে কেউ টেরও পাবে না। এখন কোন চাবিটা লকারের চাবি এবং চাবিটা দিয়ে কোন ব্যাঙ্কের লকার খুলবে সেটা তোদের বার করতে হবে।'

'কোনও ব্যাপারই না। এটা কয়েক দিনের মধ্যেই বার করে ফেলা যাবে। কিছু জানতে পারলে আমি তোকে জানাব। কিন্তু মন্দাকিনী চৌধুরির কেসটার সঙ্গে এই কেসটার কি কোনও সম্পর্ক আছে?'

'না থাকলে আমি খুবই অবাক হব। কিন্তু ঠিক কী সম্পর্ক সেটা এখনও ধরতে পারিনি।'

লালবাজারের মোড়ে আদিত্য নেমে পড়ল। বাকি রাস্তাটা হেঁটে যাবে। হাঁটতে হাঁটতে তার চিন্তা করা অভ্যাস।

## (৪)

দু-দিন পরে দুপুরবেলা একটি প্লেন ধোসা ও নবীন একখানি শসা দিয়ে লাঞ্চ সমাপ্ত করে আদিত্য সবে সিগারেট ধরিয়েছে এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। আদিত্য ভাবল শ্যামল বুঝি খাবারের পয়সা নিতে এসেছে। ভাবতে ভাবতে দরজায় আবার টোকা পড়ল। শ্যামল তো এতবার টোকা দেয় না। দরজা খুলে নিজেই ঢুকে পড়ে। উঠে গিয়ে দরজা খুলে আদিত্য দেখে বিমল দাঁড়িয়ে আছে।

'ব্যাপার কি তোমার? কোথায় বেপাত্তা হয়ে গেছিলে? যথারীতি ফোনেও পাওয়া যায় না।' আদিত্য একটু কড়া গলাতেই বলল।

'বলছি স্যার। সব বলছি। আগে একটু বসি।'

চেয়ারে বসে বিমল দু-মিনিট চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'এবার আর টাওয়ার পাবার সমস্যা নয় স্যার, মোবাইলটাই চুরি হয়ে গেছে। যেন শনির দশা চলছে স্যার। বনগাঁর ট্রেনে কখনও উঠেছেন? সে এক অমানুষিক ভিড়। ওখানেই কেউ পকেট থেকে তুলে নিয়েছে। এখনও গোবরডাঙা থেকে যাতায়াত করছি। সামনের মাসে টালিগঞ্জের দিকে একটা ঘর ভাড়া পাবার কথা আছে। দেখি কী হয়।'

'আমার কাজটা কিছু এগিয়েছে?'

'সেই কথাটাই তো বলতে আসা স্যার। বার তিনেক সেই বারটাতে গেছিলাম। যেটুকু জানতে পেরেছি, বলছি। মনে হয় আপাতত এর বেশি খবর আর বার করতে পারব না। জানলাম, ইদানীং শঙ্খদীপ চৌধুরির হাতে বেশ কিছু টাকা এসেছিল। এটা সকলেই বলল। ইয়ারবন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে সে মাঝেমাঝেই খানাপিনা করছিল। সব বিল নিজে মিটিয়ে দিত। ইয়ারবন্ধুদের মধ্যে মাইকেলও থাকত। লোকে বলছে, মাইকেল আর

তার দলবল টাকার লোভে শঙ্খদীপ চৌধুরিকে নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে খুন করেছে। শঙ্খদীপের পকেটে তাড়াতাড়া নোট থাকত। অনেকেই দেখেছে।

'টাকা কোথা থেকে আসত জানতে পেরেছ?'

'ওটাই তো স্যার জানতে পারিনি। কেউ বলতে পারল না।'

'পুলিশ মাইকেলকে ধরেছে?'

'এখনও ধরেনি স্যার। সকলে বলছে ধরবেও না। পুলিশের ওপর মহলে নাকি মাইকেলের অনেক চেনাশোনা আছে।'

'শঙ্খদীপ যে মেয়েটার সঙ্গে থাকত তার খবর কিছু জান?'

'খবর নিয়েছি স্যার। মেয়েটা বার-এ আর আসে না। সারাদিন বাড়ির ভেতরেই থাকে। সন্ধেবেলা ওর এক মেয়ে বন্ধু আছে তার কাছে যায়। ও নাকি শরীরের ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে।

'কিন্তু ব্যবসা ছেড়ে দিলে ওর পেট চলবে কী করে?'

'ওর বন্ধু আর ও মিলে এলিয়ট রোডের মোড়ে একটা খাবারের রেস্টুরেন্ট চালাচ্ছে। চালাচ্ছে মানে দোকানটা আগে থেকেই ছিল, ওর বন্ধুই চালাত, লোকে বলছে মার্থা তাতে নতুন করে টাকা ঢেলেছে। হয়তো শঙ্খদীপ মারা যাবার আগে মার্থাকে কিছু টাকা দিয়ে গিয়েছিল।'

'বন্ধুর নাম-ঠিকানা জোগাড় করেছ?'

'হ্যাঁ স্যার। বন্ধুর নাম রোজ। রোজ লি। চিনে খ্রিস্টান। এলিয়ট রোডটা এঁকেবেঁকে গিয়ে যেখানে রিপন স্ট্রিটে পড়েছে সেই মোড়েই খাবারের দোকানটা। দোকানের নাম রিপন কাফে। চাইনিজ, সাহেবি সবরকম খাবার পাওয়া যায়।'

'হুঁ, সে তো বুঝলাম। কিন্তু আসল কথাটাই তো জানা গেল না। শঙ্খদীপের কাছে এত টাকা কোথা থেকে এল?'

'হ্যাঁ স্যার, আসল কথাটাই জানা গেল না।' তারপর একটু থেমে বিমল বলল, 'আপনার আপিসের এই ডুপ্লিকেট চাবিটা ফেরত দিয়ে যাচ্ছি স্যার। কদিন খুব কাজে লেগেছিল। রাত্তিরে এখানে এসে ঘুমিয়েছি। এখন আর দরকার হবে বলে মনে হচ্ছে না।'

বিমল চাবিটা পকেট থেকে বার করে টেবিলের ওপর রাখল। বলল, 'একটা ছোট্ট খটকা আছে স্যার। হয়তো কিছুই নয়, তবু মনে হল আপনাকে বলা দরকার। কথাটা হচ্ছে, গত রবিবার মার্থা কোথাও একটা গিয়েছিল। কোথায় গিয়েছিল কেউ বলতে পারল না। ভোরবেলা বেরিয়ে গিয়েছিল, সন্ধে করে ফিরেছে। বন্ধুকে বলে গিয়েছিল, একটা কাজে যাচ্ছে। দোকানে আসতে দেরি হবে। দোকানের এক কর্মচারী আমাকে বলেছে। এখন কথা হচ্ছে, মার্থা কোথায় গিয়েছিল? কী কাজ? কবরডাঙার দিকে তার এক বোন থাকে, কিন্তু বোনের স্বামী-ছেলে মেয়ে আছে। মার্থার মতো মেয়েমানুষের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক না থাকাটাই স্বাভাবিক। আপনাকে কথাটা বলে রাখলাম। হয়তো আপনার কাজে লাগতে পারে।'

'তুমি অনেক খবর এনেছ। খবর আনতে খরচ হয়েছে নিশ্চয়। তাছাড়া তোমার নিজের পারিশ্রমিক তো আছেই। আপাতত হাজার দশেক রাখো। পরে আবার হয়তো তোমাকে কাজে লাগতে পারে। আর শোনো। যত তাড়াতাড়ি পার একটা মোবাইল কিনে নাও। মোবাইল না থাকলে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব কীকরে?'

'মোবাইল কিনেছি স্যার। তবে আপনার নম্বরটা মুখস্ত ছিল না তো, তাই আপনাকে ফোন করতে পারিনি। আপনার নম্বরটা একবার বলবেন স্যার, একটা মিসকল দেব। একটু যদি আমার নতুন নম্বরটা সেভ করে রাখেন।'

আদিত্য নিশ্চিত যে শঙ্খদীপ কাউকে ব্ল্যাকমেল করছিল। কাকে? নিশ্চয় টাকা আছে এমন কাউকে। চৌধুরি বাড়ির কাউকে কি? মন্দাকিনীকে? যদি তাই হয় তাহলে প্রশ্ন ওঠে মন্দাকিনীর কি এমন গোপন খবর থাকতে পারে? আর থাকলেও সেটা শঙ্খদীপ জানতে পারল কী করে? কিন্তু শঙ্খদীপকে খুন কে করল? মন্দাকিনীর পক্ষে লোক লাগিয়ে শঙ্খদীপকে খুন করা শক্ত ছিল না। কিন্তু মন্দাকিনী নিজেই তো খুন হয়ে গেছে। আবার এটাও ঠিক যে, যদি সম্পত্তি তিন ভাগ হবার প্রশ্ন ওঠে তাহলে শঙ্খদীপ না থাকলে অন্য দুজনের সুবিধে। কিন্তু সম্পত্তি তিন ভাগ হবে কেন? মন্দাকিনী তো অন্যরকম উইল করেই গেছে। অবশ্য সে উইল বাতিল হয়ে যাবে যদি কখনও প্রমাণিত হয় মন্দাকিনীর অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। সেদিন কী খবর পেয়ে সুব্রত সেনকে চিন্তিত দেখাল? শঙ্খদীপের মৃত্যু সংবাদ? কিন্তু শঙ্খদীপ মারা গেলে সুব্রত সেনের কী? শঙ্খদীপ কী জিনিস ফাঁস করে দেবার কথা বলেছিল? তারও আগে শঙ্খদীপ একটা পারিবারিক অভিশাপের কথা বলেছিল। সেটা কী উপাধ্যায়ের বইতে যে অভিশাপের কথা লেখা আছে, সেই অভিশাপ?

সব মিলিয়ে ভারি গোলমেলে ব্যাপার। গত কয়েকদিন ধরে আদিত্য বারবার অডিওগুলো শুনেছে। সেখানেও কোথাও কোথাও বিরাট অ্যানোম্যালি আছে। আদিত্য এখনও পুরোটা ধরতে পারেনি। তবে কিছু গরমিল একেবারে স্পষ্ট। সে গৌতমের নম্বরটা ডায়াল করল।

'একটা কথা। আমার ধারণা শঙ্খদীপ চৌধুরি মন্দাকিনীকে কিছু একটা নিয়ে ব্ল্যাকমেল করছিল। যে ডকুমেন্টটার ওপর নির্ভর করে ব্ল্যাকমেল করছিল সেটা সম্ভবত মার্থার কাছে রয়ে গেছে। এলিয়ট রোড-রিপন স্ট্রিটের মোড়ে মার্থা রিপন কাফে বলে একটা খাবারের দোকানে পয়সা ঢেলেছে। ডকুমেন্টটা সেখানে থাকতে পারে। কিংবা কবরডাঙায় মার্থার এক বোন থাকে সেখানেও থাকতে পারে। একই দিনে দুটো জায়গাতেই সার্চ করতে হবে। এটা তোদের কাজ। যত তাড়াতাড়ি কাজটা করা যায় তত ভাল।'

'হয়ে যাবে। তুই কাল সকাল এগারোটা নাগাদ একবার লালবাজারে চলে আয়। খুব দরকারি একটা আলোচনা আছে। তুই নিজে আমাকে ফোন না করলে আমিই তোকে করতাম।'

## (৫)

'তুই ঠিকই ধরেছিলি, মার্থার কাছ থেকে পাওয়া চাবির গোছাটার মধ্যে একটা ব্যাঙ্কের লকারের চাবি ছিল। কোন ব্যাঙ্ক, কোন ব্রাঞ্চ সেসব বার করতে অনেকটা ম্যান পাওয়ার খরচ করতে হল। কিন্তু অবশেষে বার করা গেছে। সেসব ডিটেলে আর যাচ্ছি না। লকার খুলে একটা জেরক্স করা ২০১০ সালের ডায়েরি পাওয়া গেল। তাতে নানা ধরনের জিনিস লেখা আছে। ডায়েরির লেখক সুবীর চৌধুরি। আমাদের বিশ্বাস এই ডায়েরিটা দিয়েই শঙ্খদীপ মন্দাকিনী চৌধুরিকে ব্ল্যাকমেল করছিল।' গৌতম তার চায়ের কাপে একটা চুমুক দিল।

আদিত্য খুব মন দিয়ে শুনছিল। বলল, 'ডায়েরিতে কী এমন আছে যা দিয়ে মন্দাকিনীকে ব্ল্যাকমেল করা যায়?'

'ডায়েরিতে নানা ধরনের কথা আছে। কিছু বিজনেস নোটস। কিছু যা যা কাজ করতে হবে তার তালিকা। ডাক্তারের ঠিকানা ও ফোন নম্বর। কিছু ওষুধপত্রের লিস্টি এবং তাদের সেবন করার সময় ও ডোজ।। আমাদের মনে রাখতে হবে, সুবীর চৌধুরি অ্যাকিউট হার্ট পেশেন্ট ছিলেন। আর কিছু ব্যক্তিগত কথা আছে ডায়েরিতে। ব্যক্তিগত কথাগুলো খুব গুছিয়ে লেখা নয়। এখানে খানিকটা, ওখানে খানিকটা। কিন্তু সেগুলো সব কটা একসঙ্গে মেলালে মনে হয় মারা যাবার আগে বেশ কিছুদিন সুবীর চৌধুরি একটা তীব্র হীনমন্যতায় ভুগছিলেন। যৌন হীনমন্যতা। ডায়েরির লেখা থেকে এটা পরিষ্কার যে সুবীর চৌধুরি তাঁর সুন্দরী তরুণী ভার্যাকে শারীরিকভাবে তৃপ্ত করতে পারছিলেন না। তাছাড়া তিনি ওই বুড়ো বয়েসে একটি পুত্র সন্তানও

চাইছিলেন যে তাঁর উত্তরাধিকারী হতে পারে। তাঁর ছেলে শঙ্খদীপ তাঁকে হতাশ করেছিল। ব্যাস, এর বেশি আর কিছু নেই ডায়েরিতে। প্রশ্ন হল, এটা নিয়ে কি কাউকে ব্ল্যাকমেল করা যায়?'

'তোদের কী মনে হচ্ছে?'

'আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হচ্ছে ব্ল্যাকমেলিং-এর জন্য দু'ভাবে ডায়েরিটা ব্যবহার করা সম্ভব। এক, চৌধুরিদের স্ক্যান্ডেল প্রকাশ করে দেব এই ভয় দেখিয়ে কেউ টাকা চাইতে পারে। দুই, যে বিজনেস নোটসগুলো ডায়েরিতে আছে তার মধ্যে চৌধুরিদের কিছু কিছু বিজনেস প্র্যাক্টিসের কথা লেখা আছে যেগুলো আইনত সিদ্ধ নয়। সব কোম্পানিরই এরকম কিছু কিছু থাকে। কিন্তু এগুলো প্রকাশ পেয়ে গেলে কোম্পানির সমূহ বিপদ। অতএব রাইভাল গ্রুপের হাতে ডায়েরিটা দিয়ে দেব এইরকম ভয় দেখিয়েও কেউ টাকা চাইতে পারে।

'হুঁ, বুঝলাম। মার্থা কী বলছে?'

'ডায়েরির পাতাগুলো লকার থেকে বেরোবার পর আমরা মার্থাকে কাস্টডিতে নিয়েছিলাম। ইন্টারোগেশনের সময় প্রথমে মার্থা মুখ টিপে ছিল। সে নাকি শঙ্খদীপের ব্যাপারে কিছুই জানে না। তার বক্তব্য, লকারে শঙ্খদীপ কী রাখছে না রাখছে সে জানবে কী করে? কিন্তু পুলিশি জেরা তো, খুব বেশিদিন কথা গোপন রাখা যায় না। তাছাড়া, আমাদের ভাগ্য ভাল লকারটা মার্থার নামে। অতএব সে তো দায়িত্ব এড়াতেই পারে না। মার্থা অবশেষে স্বীকার করেছে, এই ডায়েরিটা দেখিয়ে শঙ্খদীপ মন্দাকিনী চৌধুরিকে ব্ল্যাকমেল করছিল। সে মন্দাকিনীকে বলেছিল, টাকা না পেলে সে মিডিয়ার কাছে ডায়েরিটা ফাঁস করে দেবে। এরকম রসালো একটা স্ক্যান্ডেল পেলে মিডিয়া অবশ্যই লুফে নেবে। আর এই কেচ্ছা মিডিয়ায় বেরোলে চৌধুরি এন্টারপ্রাইজের ব্যবসা ও সুনামের রীতিমতো ক্ষতি হয়ে যাবে। এইসব বলে সে মন্দাকিনীর কাছ থেকে টাকা আদায় করেছিল। অনেকবার নয়, একবারই মন্দাকিনী চৌধুরি শঙ্খদীপকে টাকা দিয়েছিলেন। তবে সেটা বেশ মোটা একটা টাকা। কথা হয়ে ছিল আর এক কিস্তি টাকা পেলেই শঙ্খদীপ আসল ডায়েরিটা মন্দাকিনীর হাতে তুলে দেবে।'

'আসল ডায়েরিটা কোথায়?'

'এটা মার্থা বলতে পারল না। আমাদের মনে হয়েছে, ও সত্যিই জানে না।'

'কিন্তু তার মানে দাঁড়াচ্ছে, শঙ্খদীপের একজন পার্টনার ছিল যার কাছে অরিজিনাল ডায়েরিটা রয়ে গেছে।'

'সেটাই তো দাঁড়াচ্ছে।'

'আচ্ছা, একটা কথা বল। মিডিয়া যদি ডায়েরিটা হাতে পায় তাহলেই কি সেটা ছাপিয়ে দিতে পারবে? চৌধুরি এন্টারপ্রাইজেস তো মামলা করে দেবে। দেশে একটা আইন-কানুন তো আছে।'

'দ্যাখ, মিডিয়া সরাসরি হয়ত এটা এদেশে ছাপাতে পারবে না, কিন্তু অন্য অনেক দেশ আছে যেখানে আইন-কানুন শিথিল। সেখান থেকে ছাপিয়ে এনে চুপিচুপি বিক্রি করতে পারে, সোশাল সাইটে পোস্ট করতে পারে। তাতে বিক্রি আরও বাড়বে। তাছাড়া বিজনেস ম্যাল প্র্যাক্টিসের ব্যাপারটাও আছে। এটা চৌধুরি এন্টারপ্রাইজের রাইভাল কোনও গ্রুপের হাতে পড়লে তারা এটাকে তাদের কাজে লাগাতেই পারে।'

'আমি কি ডায়েরিটা একবার দেখতে পারি?'

'অবশ্যই। আমি চাই ডায়েরিটা তুই খুব ভাল করে দেখিস। তাই তোর জন্য একটা কপি করিয়ে রেখেছি। এমন কিছু ডায়েরিটাতে থাকতেই পারে যা আমার চোখ এড়িয়ে গেছে, কিন্তু তোর চোখে পড়ে গেল।'

'মার্থা কি ছাড়া পেয়েছে?'

'বেল পেয়েছে। কোর্ট থেকে বেল পেয়ে গেল।'

'মার্থার দোকান এবং কবরডাঙায় ওর বোনের বাড়ি সার্চ করে হয়তো কিছু পাওয়া যেতে পারে?'

'আজকেই জানলাম, তুই বলার আগেই আমার অফিসাররা ওই দুটো জায়গা সার্চ করেছিল। দোকানে কিছুই পাওয়া যায়নি, কবরডাঙাতেও না। তবে দুটো জায়গার লোকেরাই বলল, মার্থার হাতে বেশ কিছু টাকা

এসেছে। দোকানে টাকা ইনভেস্ট করেছে, বোনের কাছে বেশ কিছু টাকা গচ্ছিত রেখেছে। আমরা মার্থাকে জিজ্ঞেস করলাম, এত টাকা কোথা থেকে পেলে। মার্থা বলল, এটা নাকি ওর নিজের হার্ড আর্নড মানি।'

'মাইকেল ডিসুজাকে অ্যারেস্ট করেছিস? আমার মনে হয়, অ্যাকচুয়াল মার্ডারটা ও বা ওর লোকজন মিলে করেছে।'

'সেটাই মোস্ট লাইকলি। তবে ওকে সম্ভবত কেউ কাজে লাগিয়েছে। নেপথ্যে থাকা সেই ব্যক্তিটির কাছে পৌঁছনো দরকার। তাই মাইকেলকে এখনও অ্যারেস্ট করিনি। ইচ্ছে করেই ছেড়ে রেখেছি। ওর ওপর কড়া নজর আছে। ও কোথায় যায়, কার কার সঙ্গে কথা বলে সবই নোট করা হচ্ছে।'

গৌতম তার টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা এ-ফোর সাইজের খাম বার করল। খামের মুখ বন্ধ। আদিত্যর হাতে দিয়ে বলল, এটাতে ডায়েরিটা জেরক্স করা আছে। তুই ভাল করে পড়ে দেখ।'

আদিত্য খামটা হাতে নিয়ে বলল, 'আর একটা প্রশ্ন। মন্দাকিনী চৌধুরির ব্যাপারটায় আর কিছু জানা গেল?'

'একটা ব্যাপার জানা গেছে। সুবীর চৌধুরি মারা যাবার পরথেকেই কম্পানির অবস্থা একটু একটু করে খারাপ হয়েছে। এই মুহূর্তে চৌধুরি এন্টারপ্রাইজের বাজার দর একেবারে তলানিতে। একটা অবভিয়াস এক্সপ্লানেশন হল সুবীর চৌধুরির মতো কোম্পানি চালানোর ক্ষমতা মন্দাকিনীর ছিল না। হয়তো তার অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে কিছু চুরি-টুরি হয়েছে। আসল চিত্রটা বোঝার জন্য কোম্পানির একটা ফরেনসিক অডিট দরকার। একটা অডিট ফার্মকে সেই দায়িত্বটা দেওয়া হয়েছে।'

'মন্দাকিনী চৌধুরি তার সমস্ত সম্পত্তি যে এনজিও-টিকে দিয়ে গেছে, তার সম্বন্ধেও খোঁজ নেওয়া দরকার।'

'এই এনজিও-র ব্যাপারটা আমরা সদ্য জানতে পেরেছি। এনজিওটা মরিশাসে রেজিস্টার্ড। একটু গোলমেলে। ওদের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতে একটু সময় লাগবে। কিছু ইন্টারন্যাশানাল ফর্ম্যালিটি আছে।'

বেয়ারা আর একবার চা নিয়ে এসেছে। সঙ্গে ক্রিমক্র্যাকার। গৌতম চায়ে চুমুক লাগিয়ে বলল, এবার তোর কথা বল। তুইতো কিছুদিন ধরেই ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট করছিস।'

'হ্যাঁ করছি। বিভিন্নলোকের সঙ্গে কথা বলে আমার মনে একটা আবছা ধারণা তৈরি হয়েছে। বলতে পারিস সেটা একটা হাইপথিসিস, যা আমি এখখুনি প্রমাণ বা অপ্রমাণ কিছুই করতে পারব না। তাছাড়া তাতে এই মুহূর্তে কিছু গ্যাপও আছে। কিন্তু আমি আমার হাইপথিসিসটা তোর সঙ্গে শেয়ার করতে চাই। তোর সঙ্গে আলোচনা করলে আমার কাছেও জিনিসটা পরিষ্কার হবে।'

গৌতমের সঙ্গে কথা বলে আদিত্য যখন লাল বাজার থেকে বেরোল তখন তিনটে বেজে গেছে। আদিত্য টের পেল তার বেশ খিদে পেয়েছে।

## নবম পরিচ্ছেদ

(১)

বাইন্ডার ক্লিপ আটকানো একতাড়া জেরক্স করা কাগজ। পুরো ডায়েরিটাই কপি করে দিয়েছে। লাইন টানা পাতা প্রায় চারশো। প্রত্যেক পাতার ওপরে তারিখ লেখা। তবে দেখে মনে হয় না, ডায়েরির এন্ট্রি□□□□ তারিখ মেনে হয়েছে। বেশিরভাগ পাতাই ফাঁকা। কিছু কিছু পাতায় আবার এলোমেলো ভাবে দুটো তিনটে শব্দ, হয়তো শুধু একটা নাম, আবার কখনো-কখনো দু'চার লাইন লেখা নাম-ঠিকানা, তার নীচে কিছু কমেন্ট। অন্য কিছু কিছু পাতায় টানা লেখা এক-দুই প্যারাগ্রাফ। তবে তেমন পাতার সংখ্যা খুব বেশি নয়। অনুমান করা যেতে পারে, সুবীর চৌধুরির প্রত্যেক দিনের করনীয়গুলো তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারির কাছে লেখা থাকত। এই লেখাগুলো সেরকম নয়। শুধুমাত্র নিজের জন্য ডায়েরিতে দু'-চারটে কথা লিখে রাখা। কোনও কোনও ব্যক্তি সম্বন্ধে বেশ নিন্দাসূচক মন্তব্য আছে। কারো কারো সম্বন্ধে প্রশংসা। নিজের স্ত্রীকে নিয়েও অনেক কথা আছে যার সবটাই প্রশংসা নয়। ব্যবসা-সংক্রান্ত কথাও অনেক আছে। মনে হয়, সুবীর চৌধুরী কখনো চাননি এই ডায়েরি অন্য কেউ দেখুক। প্রায় সব লেখাই ইংরেজিতে, কালেভদ্রে দু'একটা বাংলা লেখাও আছে। একটা বড় সুবিধে, সুবীর চৌধুরির হাতের লেখা অত্যন্ত পরিষ্কার। পড়তে একটুও অসুবিধে হয় না। গৌতম বলেছিল, পুলিস যাচাই করে নিয়েছে এটা সুবীর চৌধুরিরই হাতের লেখা।

গত দুদিন আদিত্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ডায়েরিটা পড়েছে। একটা ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস কিনে নিয়েছে যাতে কিছু মিস না করে যায়। দু'একটা লেখা পেন্সিলে যেগুলো ম্যাগ্নিফায়িং গ্লাস ছাড়া পড়া সম্ভব ছিল না।

আদিত্য ডায়েরির এন্ট্রিগুলো দু'ভাগে ভাগ করে নিয়েছে। প্রথম ভাগে রেখেছে ব্যক্তিগত লেখাগুলোকে। দ্বিতীয় ভাগে ব্যবসা সংক্রান্ত নোটস। ব্যক্তিগত লেখাগুলো থেকে এটা স্পষ্ট যে সুবীর চৌধুরির দ্বিতীয় বিয়েটা সুখের হয়নি। লেখাগুলোর ছত্রে ছত্রে তার প্রমাণ রয়েছে। আদিত্য কিছু কিছু জায়গায় দাগ দিয়ে রেখেছে। দাগ দেওয়া জায়গাগুলো সে আলাদা একটা তালিকা করে তার নোট খাতায় লিখে রাখল যা বাংলা তর্জমা করলে এইরকম দাঁড়াবে :

১। ম-এর শরীরটা যতটা সুন্দর, মনটা ততটাই ঠান্ডা। তবে ওকে দোষ দিতে পারছি না। আমার শারীরিক অক্ষমতা ক্রমশ বাড়ছে। ম-এর কতই বা বয়েস? আমিই তো ওকে টাকার লোভ দেখিয়ে ছিনিয়ে এনেছি।

২। কাল রাতে আবার পারলাম না। না পারার থেকেও কষ্টকর ওর ঠান্ডা নিরাসক্তি।

৩। অভিশাপ, চৌধুরিদের ওপর সেই পুরোনো অভিশাপটা আবার ফিরে এসেছে। নিজেকে মহাভারতের পাণ্ডুর মতো মনে হয়। ম যেন মাদ্রী, আমাকে ভীষণ আকর্ষণ করে, কিন্তু ছোঁয়া যাবে না।

৪। ম-এর প্রথম স্বামীর জন্য দুঃখ হয়। লোকটা ছিল একটা আদর্শবাদী গাধা। কিন্তু আদর্শবাদী গাধাদেরও তো বাঁচার অধিকার আছে। আমি পয়সার জোরে ওর ভেতরের মানুষটাকে মেরে ফেলেছি। এটাই কি অভিশাপের কারণ?

৫। আবার কাল রাতে ব্যর্থ। কিছু একটা করতেই হবে। শরীরটাও ভাল নেই।

৬। আমার একজন পুত্র সন্তান দরকার যে আমার উত্তরাধিকারী হতে পারবে। আমাকে হতাশ করেছে। ম বলছে একটা আয়ুর্বেদিক ওষুধ চেষ্টা করতে। ও-ই জোগাড় করবে। এর নাকি কোনও পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নেই। আমি রাজি হয়েছি।

৭। অনুরাধা, আমি তোমার দিকে যথেষ্ট নজর দিইনি। তাই কি তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে গেলে? তুমি থাকলে ছেলেমেয়েগুলো এরকম কুপথে যেতো না। বিশেষ করে।

৮। প্যাকেটের গায়ে ওষুধের নাম লেখা আছে অশ্বগন্ধেশ্বরী। বলছে এতে অশ্বগন্ধা ছাড়াও আরও তিরিশ রকমের শেকড়-বাকড় আছে। কবিরাজের নাম অবিনাশ সেন। ঠিকানা ১৩/২ গৌর দে লেন। (সেটা আবার কোথায়?)। রোজ সকালে মধু দিয়ে খেতে হবে। দেখা যাক।

৯। শরীরের অবস্থা রোজ খারাপ হচ্ছে। পরিশ্রম কমাতে হবে। দুশ্চিন্তা কমাতে হবে।

১০। ডাক্তার বদল করতে বলছে। কিন্তু ডাঃ সেনগুপ্ত আমাকে অনেকদিন দেখছে। আমার নাড়ি নক্ষত্র জানে। তাকে বদলানো কি ঠিক হবে?

১১। মাঝে মাঝে মনে হয়, আর বেশি দিন নেই। একটা প্রায়শ্চিত্য করতে হবে। যদি আমাকে আর একটু ভালবাসত।

ব্যবসা সংক্রান্ত মন্তব্যগুলোতে আদিত্য তেমন কিছু পেল না। ব্যবসার কিছু কৌশলের কথা আছে। কয়েকজন প্রতিযোগীর নাম আছে। তাদের কী করে শায়েস্তা করা যায় তার নানারকম প্ল্যান আছে। যেমন কিছুটা বাঁকা পথে তাদের কাঁচা মালের জোগান বন্ধ করে দিলে কিংবা খুচরো দোকান যাতে তাদের মাল না নেয় তার ব্যবস্থা করলে তাদের বিক্রি কতটা মার খেতে পারে তার লম্বা আলোচনা আছে। কী করে ট্যাক্স বাঁচানো যায় সেই সম্বন্ধেও অনেক কথা আছে। আদিত্যর মনে হল এইসব পরিকল্পনার কোনওটাই ঠিক বেআইনি নয়। অনৈতিক হলেও হতে পারে। কিন্তু ব্যবসায় কে কবে নিয়ম-নীতি মেনে চলে? চৌধুরিদের প্রতিযোগীরাও কি চলে? যাই হোক, আদিত্য নিশ্চিত যে এসব দিয়ে মন্দাকিনীকে ব্ল্যাকমেল করা যায় না। গৌতম যাই বলুক।

কিন্তু ব্যক্তিগত যে কথাগুলো আছে তাই দিয়েও কি মন্দাকিনীকে ব্ল্যাকমেল করা চলে? সুবীর চৌধুরি শারীরিকভাবে অক্ষম হলে মন্দাকিনীর কি দোষ? তাকে বরং লোকে সহানুভূতির চোখেই দেখবে। এসব ব্যক্তিগত জিনিস বাজারে বেরোলে চৌধুরিদের ব্যবসার বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে এমনও মনে হয় না। তাহলে মন্দাকিনী শঙ্খদীপের মুখ বন্ধ করার জন্য টাকা দিল কেন? নিশ্চয় ডায়েরির মধ্যে এমন কিছু আছে যেটা মন্দাকিনীর পক্ষে মারাত্মক ছিল। আদিত্য এখনও সেটা ধরতে পারেনি। সেটা ঠিক কী শঙ্খদীপ কি বুঝতে পেরেছিল? তার তো অতটা বুঝতে পারার কথা নয়। শঙ্খদীপের একজন পার্টনার ছিল। সে-ই কি ব্যাপারটা বুঝে, নিজে আড়ালে থেকে শঙ্খদীপকে সামনে এগিয়ে দিয়েছিল? ডায়েরিটা কি সেই পার্টনার-এর কাছেই ছিল? কী করে গেল?

এইসব ভাবতে ভাবতে আদিত্যর মাথাটা গরম হয়ে গিয়েছিল। বাইরে রোদ্দুরের তেমন তেজ নেই, আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। ঘড়িতে বিকেল চারটে পাঁচ। আদিত্য ভাবল একটু হেঁটে আসবে। বেরোনোর আগে সে গুগল ম্যাপে দেখল, গৌর দে লেনটা বউবাজারের খুব কাছে, তার আপিস থেকে হাঁটা পথ।

(২)

বউ বাজারের ছানাপট্টি থেকে বড় রাস্তা ধরে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের দিকে কয়েক মিনিট হাঁটলেই হিদারাম ব্যানার্জি লেন বাঁ-হাতে ঢুকে গেছে। সেই রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে প্রথম বাঁ দিকের গলিটার নাম গৌর দে লেন। গলিটা এত সরু যে দিনের বেলাতেও সূর্যের আলো ঢোকে না, অতিবৃদ্ধ বাড়িগুলো পরস্পরের গায়ে গা লাগিয়ে কোনো রকমে দাঁড়িয়ে আছে। দু-একটা বাড়ির শরীর দিয়ে বট-অশথ ঝুরি নামিয়েছে, কোনও কোনও বাড়িতে জানলা-দরজার বালাই নেই, ভেতরে বাদুড়-চামচিকের সঙ্গে জবর দখল কারিরা খাটিয়া পেতে বাস করে। এক ঝলক তাকালেই বোঝা যায়, গত একশো-দেড়শো বছর এই রাস্তাটা পরিবর্তনের মুখ দেখেনি।

১৩/২ বাড়িটা খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। সদর দরজাটা হাট করে খোলা। সদর দরজার গায় ফাটল ধরা বাঁধানো বসার বেদী পেরিয়ে আদিত্য ভেতরে ঢুকল। সাবেকি উঠোন ঘিরে আট-দশটা ঘর। কোনও ঘরে গাড়ির ব্যাটারির দোকান, কোথাও পুরোনো খবর কাগজ, শিশি-বোতলের আড়ত, কয়লার ডিপো। তারই মধ্যে আবার দুটো ঘর জুড়ে একটা প্রেস চলছে। একটা ঘরে মেশিন, ঘটাং ঘটাং করে কী যেন ছাপা হচ্ছে সেখানে। অন্য ঘরে একজন অতি শীর্ণকায় কম্পোজিটার বসে বসে কম্পোজ করছেন। আদিত্য তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কবিরাজ অবিনাশ সেন কি এখানে থাকেন?'

একটা 'গ'কে চিমটে দিয়ে তুলে ফ্রেমবদ্ধ করতে করতে কম্পোজিটর মশাই বললেন, 'চিঠি লিখে আসছেন তো? না হলে কিন্তু কবিরাজ মশাই দেখা করেন না। তাছাড়া ওনার শরীরটাও ভাল নেই। বয়েস হচ্ছে তো।'

কম্পোজিটর মশাইকে কাজ করতে দেখে আদিত্যর মনে হল এই কায়দায় বোধহয় উইলিয়ম কেরির আমলে শ্রীরামপুরে বাইবেল ছাপা হত। সে মুখে বলল, 'চিঠি তো লেখা হয়নি। আমি অনেক দূর থেকে আসছি বললে দেখা করবেন না?'

'দেখুন চেষ্টা করে। দোতলায় উঠে কোনার ঘরটায় কবিরাজ মশাই থাকেন।'

কবিরাজ মশায়ের দরজাটা আধখোলা। আদিত্যে একটু ধাক্কা দিতেই ক্যাঁঅ্যাঁঅ্যাঁচ করে একটা বিশ্রী শব্দ হল আর সঙ্গে সঙ্গে একটা কাঁপা কাঁপা গলায় কেউ বলে উঠল, 'কেএএ?'

আদিত্য কী বলবে ভাবছে, এমন সময় সেই কাঁপা কাঁপা গলাটা আবার বলে উঠল, 'কাঞ্জিলাল দ্যাখ তো কেউ এল নাকি।'

কাঞ্জিলাল নামক লোকটি এবার দরজার সামনে এসে দেখা দিল। আদিত্যকে দেখে বলল, 'কবিরাজ মশায়ের সঙ্গে দেখা করবেন? চিঠি দিয়েছিলেন?'

'চিঠি তো দেওয়া হয়নি। আসলে আমি রুগি নই। খবর কাগজের আপিস থেকে আসছি। কবিরাজ মশায়ের একটা ইন্টারভিউ নেব।'

কবিরাজ মশাই মনে হয় কথাগুলো শুনতে পেলেন। কারণ ঘরের ভেতর থেকে সেই কাঁপা কাঁপা গলাটা আবার শোনা গেল, 'কাঞ্জিলাল ওঁকে ভেতরে আসতে বল।'

ঘরের ভেতরটা প্রায় অন্ধকার। প্রথম দু-মিনিট আদিত্য কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। শুধু ওষুধ, পুরোনো জামাকাপড় আর বদ্ধ ঘরের একটা সম্মিলিত দুর্গন্ধ তার ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে পীড়া দিচ্ছিল। তারপর চোখটা একটু সয়ে আসতে আদিত্য দেখল ঘরের এক কোনে একটা চৌকির ওপর কেউ শুয়ে আছে। আর একটু ভাল করে দেখে আদিত্য বুঝল যিনি শুয়ে আছেন তাঁর বয়েস নব্বই বছরের কম হবে না।

নবতিপর বৃদ্ধটি কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'আমার শরীরটা ভাল নেই। বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারি না। আপনার সঙ্গে শুয়ে শুয়ে কথা বলছি বলে মার্জনা করবেন।'

'আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে রাজি হয়েছেন, সেটাই আমার পরম সৌভাগ্য। আপনাকে বেশিক্ষণ কষ্ট দেব না। আমি একজন ফ্রিলান্স সাংবাদিক। খবর কাগজে টুকটাক লিখি। এই আমার কার্ড।'

আদিত্য তার সাংবাদিক পরিচয়ের একটা ভিজিটিং কার্ড বৃদ্ধের হাতে দিল।

বৃদ্ধ বললেন, 'আপনি এই চেয়ারটায় বসুন। আমি চোখে প্রায় দেখতেই পাই না, ভিজিটিং কার্ড পড়ব কী করে? কাঞ্জিলাল, এই কার্ডটা রেখে দে।'

আদিত্য বলল, 'আমি ইনফারটিলিটি বা বন্ধ্যাত্ব নিয়ে একটা ফিচার লিখছি। ভারতে প্রথম টেস্ট টিউব বেবি জন্মেছিল চল্লিশ বছর আগে, যদিও সেই সময় সেই অসাধারণ কৃতিত্ব সরকারি স্বীকৃতি পায়নি। পরে পেয়েছে। তারপর কৃত্রিম উপায়ে আরও অনেক শিশুর জন্ম হয়েছে। কিন্তু এই কৃত্রিম উপায়ে প্রজনন যখন মানুষের আয়ত্বে আসেনি, তখনও বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা হত। বস্তুত, প্রাচীন আয়ুর্বেদেই বন্ধ্যাত্বের নানারকম চিকিৎসা আছে। একটা সময় ছিল যখন ছেলে এবং মেয়েদের বন্ধ্যাত্বের আপনি অসাধারণ চিকিৎসা করতেন। সেই চিকিৎসা সম্বন্ধে যদি কিছু বলেন।'

বৃদ্ধ একটু উঠে বসার চেষ্টা করলেন। তাঁকে খানিকটা উত্তেজিত মনে হল। উত্তেজনা এবং উঠে বসার পরিশ্রমে তিনি কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। খানিকক্ষণ দম নিয়ে বৃদ্ধ বললেন, 'বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা-পদ্ধতি আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলাম। আমরা সাত পুরুষের কবিরাজ। কিন্তু আপনি হয়তো জানেন না আমি একজন এমবিবিএস পাশ করা অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারও বটে। তবে নিজে কখনও অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা করিনি। বংশ পরম্পরায় যে জ্ঞান আমি লাভ করেছি, সারাজীবন তারই চর্চা করে গেছি। অবশ্য অ্যালোপ্যাথিতে যে নানা রকম টেস্ট আছে আমি তা সব সময় ব্যবহার করেছি।'

বৃদ্ধ থামলেন। খানিকটা দম নিয়ে শুরু করলেন আবার। 'মেয়েদের বন্ধ্যাত্বের কিছু কিছু চিকিৎসা আমি করেছি, কখনো কখনো সাফল্যও পেয়েছি। কিন্তু সেটা বলার মতো কিছু নয়। আমার আসল সাফল্য ছিল পুরুষদের বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসায়। একটা ওষুধ তৈরি করেছিলাম যা পুরুষদের বন্ধ্যাত্বে বা পুরুষত্বহীনতায় খুব ভাল কাজ করত। তবে এই ওষুধটার একটা সমস্যা ছিল। যাদের হার্ট দুর্বল তাদের এই ওষুধটা দেওয়া যেত না। তাই নানারকম পরীক্ষা করে ভীষণ সাবধানে এই ওষুধটা দিতে হত।'

'কতদিন অব্দি আপনি এই চিকিৎসাটা করেছেন?'

'সঠিক বলতে পারব না, যতদূর মনে পড়ছে সাত-আট বছর আগেও এই ওষুধটা দিয়ে কাজ পেয়েছি। তারপর কী হল, নাড়ি দেখার জন্য যে প্রবল মনসংযোগটা লাগে সেটা আমি আস্তে আস্তে হারিয়ে ফেললাম। অথচ ভাল করে নাড়ি দেখে হার্টের অবস্থাটা বুঝতে না পারলে ওষুধটা দেব কী করে? তাই ওই চিকিৎসাটাই ছেড়ে দিলাম। কাঞ্জিলাল, আমার পুরোনো লাল খাতাটা বার কর তো।'

কাঞ্জিলাল খাতা নিয়ে আসার পর বৃদ্ধ বললেন, 'শেষ এন্ট্রির তারিখটা দেখ তো কবে।'

কাঞ্জিলাল খাতার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একটা জায়গায় থামল। তারপর বলল, 'শেষবার আপনি ওষুধটা দিয়েছিলেন আট বছর আগে, ২০১০ সালের জুন মাসে।'

একটু পরে রাস্তায় নেমে আদিত্য গৌতমকে ফোন করল।

'শোন। একটা ঠিকানা লিখে নে, ১৩/২ গৌর দে লেন। রাস্তাটা বউবাজার মোড়ের খুব কাছে। দোতলায় থাকেন কবিরাজ অবিনাশ সেন। খুব বৃদ্ধ মানুষ। তিনি এক সময় পুরুষদের বন্ধ্যাত্ব কাটানোর একটা ওষুধ দিতেন, নাম অশ্বগন্ধেশ্বরী। যাদের দিতেন তাদের নাম ঠিকানা একটা লাল খাতায় লিখে রাখতেন। ওই খাতাটার একটা কপি চাই। পুলিশ চাইলে উনি নিশ্চয় দিয়ে দেবেন। হেঁয়ালি মনে হচ্ছে? দেখা হলে পুরোটা খুলে বলব। রাস্তায় রয়েছি। এখন রাখছি।'

রহস্যের জট ক্রমশ খুলছে। আদিত্য খুশি হয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলল। সিগারেটটা ধরিয়ে সবে দু-চার পা এগিয়েছে, সোহিনীর ফোন।

'আদিত্যবাবু, ভাল আছেন?'

'আমিতো ভালই আছি। আপনারা কেমন আছেন?'

'আমাদের কিছু খবর আছে। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারলে ভাল হতো। আপনি আমাদের বাড়িতে কি একবার আসতে পারবেন?'

'কবে যাব?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আজ সন্ধেবেলা আসতে পারবেন?'

আদিত্য একটু ভাবল। আজ সন্ধেবেলা হাতে তেমন কাজ নেই। বলল, 'ঠিক আছে। ঘণ্টা খানেক ঘণ্টাদেড়েকের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছি। আপনাদের বাড়ির ঠিকানাটা বলবেন?'

'১৭৭ সানিপার্ক। একটা পুরোনো দোতলা বাড়ি। আমরা একতলায় থাকি। বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে। বিড়লা মন্দিরের দক্ষিণদিক দিয়ে রাস্তাটা বেরিয়েছে।'

বউবাজারের মোড় থেকে এসপ্লানেডের ট্রাম ধরল আদিত্য। ফাঁকা ট্রাম, উঠেই বসার জায়গা পেয়ে গেল। এসপ্লানেডে গাড়ি বদল। এবার ট্রাম গুমটির ঘড়ির নীচ থেকে বালিগঞ্জের ট্রাম ধরল। তার ভাগ্য ভাল এবারও বসার জায়গা পেয়ে গেল। ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে ট্রাম চলেছে। রাস্তায় আপিস-ফেরত মানুষের ভিড়। একটু পরে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের কাছে যখন ট্রাম থেমেছে তখন আদিত্যর মনে হল, আহা এখান থেকেই তো উঠলে পারতাম। খামোকা এসপ্লানেড অব্দি যেতে গেলাম কেন? তারপর ভাবল এখান থেকে উঠলে কি আর বসার জায়গা পেতাম? গাড়ি যখন রিপন স্ট্রিট পেরোচ্ছে, আদিত্য জানলা দিয়ে হঠাৎ রিপন কাফে দোকানটা দেখতে পেল। বেশ সাজানো দোকান, এতটাই সাজানো যে ওই অঞ্চলটার পক্ষে যেন একটু

বেমানান। আধঘণ্টা বাদে আদিত্য যখন বালিগঞ্জ পোস্টাপিসের স্টপে গিয়ে নামল তখন সাড়ে ছটা বেজে গেছে।

ষাট-সত্তর দশকে অতি অবস্থাপন্নরা কীভাবে বসবাস করত সোহিনীর ফ্ল্যাটে ঢুকলে তার একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। সেই অতি অবস্থাপন্নদের উত্তরপুরুষরা অনেকেই এখন আধুনিকতর জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে বহুতলের বাসিন্দা হয়ে গেছে। পুরোনো বাড়িগুলোও দ্রুত উধাও হয়ে গিয়ে আকাশচুম্বি আবাসনগুলোকে জায়গা করে দিচ্ছে। সেদিক থেকে ১৭৭ সানি পার্ক একটা ব্যতিক্রম। টাকাপয়সার অভাব নেই বলেই হোক বা অন্য যে-কোনও কারণেই হোক, চৌধুরি এন্টারপ্রাইজেস এখনও এই বাড়িটা প্রোমোটারদের হাতে তুলে দেয়নি। একতলায় সোহিনীকে তার মা থাকতে দিয়েছে, দোতলায় কোম্পানির চিফ ফিনান্স অফিসার সুব্রমনিয়ম পরিবার নিয়ে থাকেন।

বাড়ির ভেতরে ঢুকে আদিত্য দেখল বাঁদিকে লন, ডানদিকে দোতলা বাড়ি। একতলায় কলিং বেলের বদলে পেতলের চকচকে ঘণ্টা। ঘণ্টা থেকে সুদৃশ্য দড়ি ঝুলছে। আদিত্য দড়ি ধরে টান দিতে ঘণ্টা বাজল, দরজা খুলে গেল, বেয়ারা আদিত্যকে নিয়ে গিয়ে বসাল ঠান্ডা ড্রয়িংরুমে। মস্ত ড্রয়িংরুম, একদিকে সোফাসেট, বাড়তি দু'তিনটে আরাম-কেদারা, অন্যদিকে গ্র্যান্ড পিয়ানো। সোহিনী মৈত্রকে তার মা আরামেই রেখেছিল।

'আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ জানাব, এত অল্প নোটিসে আপনি এলেন।' ভেতরের একটা দরজা দিয়ে সোহিনী ঘরে ঢুকল। আদিত্যর পাশে একটা কৌচে বসে বলল, 'চা খাবেন তো?'

'আপত্তি নেই।'

'ফোনে বলেছিলাম, খবর আছে। খবরটা আগে দিয়ে নিই। একটা নয়, একসঙ্গে দুটো খবর। মা খুব জোর করেছিল বলে আমি পিএইচডি করার জন্য বিদেশের কয়েকটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করেছিলাম। তার মধ্যে নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন দিয়েছিল, কিন্তু কোনও ফিনানশিয়াল সাপোর্ট দেয়নি। মা অবশ্য পুরোটাই স্পনসর করবে বলেছিল, কিন্তু মার কাছ থেকে অতগুলো টাকা নিতে আমি রাজি হইনি। আমি তার বদলে কয়েকটা আউটসাইড এজেন্সিতে স্পনসরশিপ বা স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম, তার মধ্যে দু'একটা এজেন্সির নাম মা-ই সাজেস্ট করেছিল। গতকাল মরিশাসের একটা ট্রাস্ট জানিয়েছে তারা আমার পিএইচডি-র সমস্ত খরচ দিতে রাজি আছে। এটা তাদের পেরেন্ট কোম্পানির করপোরেট সোশাল রেসপন্সিবিলিটির একটা স্কীম। ট্যুইশন ছাড়াও একটা জেনরস ফেলোশিপ পাব যা দিয়ে নিউ ইয়র্কের মতো শহরেও ল্যাভিশলি চলে যাবে। আমি ভাবছিলাম, এত ভাল সুযোগ তো আর আসবে না, তাই এটা ছাড়া উচিত নয়। তাছাড়া মার নতুন উইলে যেটুকু পাব তা দিয়ে কলকাতায় চালানো শক্ত। এই বাড়িটাও তো ছেড়ে দিতে হবে।

বেয়ারা চা দিয়ে গেল। সোহিনী একটু থামল। আদিত্যর জন্যে এবং নিজের জন্যে চা ঢালল। চায়ে একটা চুমুক দিয়ে আবার শুরু করল।

'শুধু চিন্তা ছিল নন্দনকে নিয়ে। আমি বিদেশ চলে গেলে নন্দনকে কে দেখবে? ও এখনও ঠিক নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেনি। একটা ভালরকমের সাপোর্ট ওর দরকার হয়। অথচ দুর্দান্ত গাইছে। এই সময় গান থামিয়ে ওকে যদি পেটের চিন্তা করতে হয় তাহলে ওর গানটাই নষ্ট হয়ে যাবে। নন্দন অবশ্য মাঝে মাঝে বলে মুম্বাই গিয়ে কমার্শিয়াল লাইনে লাক ট্রাই করবে। আমার ওপর এভাবে নির্ভর করতে ওর ভাল লাগে না। কিন্তু সেসব কথার কথা। আমি জানি, ওকে যদি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ছেড়ে দিতে হয় তাহলে ও মরেই যাবে। এমনই ভাল কপাল, আজ সকালে পুনের একটা সঙ্গীত-আশ্রম নন্দনকে জানিয়েছে ওকে ওরা জুনিয়র ফ্যাকাল্টি হিসেবে নিয়োগ করতে চায়। সঙ্গীত আশ্রমটি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের জগতে খুবই বিখ্যাত। কিছুদিন আগে পুনেতে নন্দন প্রোগ্রাম করেছিল। ওদের কর্তারা নন্দনের গান শুনে খুশি হয়েছেন। জুনিয়র ফ্যাকাল্টি হিসেবে নন্দন যেমন তরুণ শিক্ষার্থীদের গান শেখাবে, তেমনি ওখানকার কোনও সিনিয়র ফ্যাকাল্টির কাছে

নাড়া বেঁধে নিজে শিখতেও পারে। ওখানে নন্দনদের ঘরের একজন বৃদ্ধ ওস্তাদ আছেন যাঁর কাছে সঙ্গীতের অফুরন্ত ভাণ্ডার রয়েছে। সেসব শিখতে পারলে নন্দনের গান আরও অনেক ম্যাচিয়োর্ড হবে। নন্দন এই সুযোগ ছাড়তে চায় না।

'তাহলে ব্যাপারটা এই দাঁড়াচ্ছে যে খুব শিগগির আপনারা দুজনেই উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। আপনাদের দুজনকেই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।' আদিত্য খুশি হয়ে বলল। তারপর একটু থেমে বলল, 'তাহলে কি ধরে নেব মন্দাকিনী চৌধুরির কেসটা থেকে আমাকে অব্যাহতি দেওয়া হল? সেটা বলতেই কি আমাকে ডেকেছেন?'

'ঠিক তা নয়। আমরা খুবই চাই মার মৃত্যুর ব্যাপারটার একটা কিনারা হোক। কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন, এখন আর চৌধুরি এন্টারপ্রাইজেস-এর রিসোর্স-এর ওপর আমার কোনও কনট্রোল নেই। আমার পক্ষে আপনার পারিশ্রমিকটা দেওয়া আর সম্ভব নয়।'

'ম্যাডাম, একটা কথা বলি। এটা ঠিকই যে আমার টাকার কিছু প্রয়োজন আছে। কিন্তু তাই বলে আমাকে একেবারে মার্সিনারি ভাববেন না। মন্দাকিনী চৌধুরির কেসটা সলভ করতে না পারলে আমার বিরাট পরাজয় হবে। নিজের কাছে নিজেই ছোট হয়ে যাব। তাই টাকাপয়সা বাদ দিলেও আলাদা করে কেসটা সলভ করার ব্যাপারে আমার একটা স্বার্থ আছে। ইট উইল বুস্ট মাই ইগো। আপনি টাকাপয়সা নিয়ে ভাববেন না। আপনি শুধু আপনার তরফ থেকে বলুন আপনার মা-র মৃত্যুরহস্যের কিনারা করার জন্য আপনি আমাকে বহাল রাখছেন। টাকাপয়সা কিচ্ছু লাগবে না। আপনি বললেই আমি কাজটা করে যেতে পারব। কিন্তু আপনি আমাকে ফরম্যালি নিয়োগ না করলে আমার এই কাজটা করতে কিছু টেকনিক্যাল অসুবিধে আছে।'

সোহিনী অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। বোঝাই যায় আদিত্যকে বিনা পয়সায় কাজ করাতে তার আভিজাত্যে বাধছে। আবার আদিত্যর উৎসাহটাকেও সে উপেক্ষা করতে পারছে না।

শেষে সে বলল, 'ঠিক আছে। আপনি কাজ করুন। আমার তো আগস্টের শেষে বিদেশ যাওয়া। আশা করি তার মধ্যে কেসটা আপনি সলভ করে ফেলবেন।'

'অতদিন লাগবে না।' আদিত্য বেশ জোর দিয়ে বলল। তারপর একটু থেমে বলল, 'আপনি আমাকে দু-একটা প্রশ্নের উত্তর দিন।'

'বলুন।'

'সুবীর চৌধুরির মৃত্যুর পরে শঙ্খমালা সেন বা তার স্বামীর সঙ্গে চৌধুরি প্যালেসের কতটা যোগাযোগ ছিল?'

'আমার ধারণা খুব বেশি ছিল না। তবে আমি খুব জোর দিয়ে বলতে পারব না। আমি তো আর রোজ রোজ চৌধুরি ম্যানসনে যেতাম না। অবশ্য মালা ওখানে গেলে মা নিশ্চয় গল্প করত। মা খুব বেশি বলত না মালার আসার কথা।'

'কোনও বিশেষ দিন মনে আছে যখন শঙ্খমালা ওখানে গিয়েছিলেন? হয়তো চৌধুরি প্যালেস থেকে কিছু নিয়েও এসেছিলেন?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না আপনি কী বলছেন। তবে কাকুর মৃত্যুর কিছুদিন পরে মালা একদিন এসে মাকে বলল তার মায়ের যে গয়নাগুলো চৌধুরি প্যালেসে আছে সেগুলো সে নিয়ে যেতে চায়। সঙ্গে সুব্রতদাও ছিল। মা আপত্তি করেনি, গয়নাগুলো ব্যাঙ্কের লকারে ছিল। মা সেগুলো বার করে আনল। গয়না নিয়ে মালা খুশি হয়েই চলে যাচ্ছিল। সুব্রতদা কিন্তু নানারকম আপত্তি তুলল। তার বক্তব্য, এত কম গয়না তো ছিল না। আরও গয়না নিশ্চয় আছে। মা ভীষণ অপমানিত বোধ করেছিল। শেষে মালা ব্যাপারটাকে কোনো রকমে সামলে দেয়। এরপর ওরা অনেকদিন চৌধুরি বাড়িতে আসেনি। সুব্রতদা এমনিতে লোক খারাপ নয়, কিন্তু ওর মধ্যে একটা অনভিজাত লোভী মন আছে।'

'চৌধুরি বাড়ি থেকে মালা আর কিছু নিয়ে যায়নি? একটু ভাল করে ভেবে দেখুন তো।'

সোহিনী কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, 'আপনি বলতে মনে পড়ছে। একটা সকালে মালা এসেছিল। গয়না নিয়ে যাবার বেশ কিছুদিন পরে। আমিও সেদিন ওখানে ছিলাম। ওর মার এক স্যুটকেস ভর্তি পুরোনো জিনিসপত্র কাকুর পড়ার ঘরের একটা ক্লজেটে পড়েছিল। মালা সেটা দেখতে পেয়ে বলল, সে ওই জিনিসগুলো নিয়ে যেতে চায়। ওগুলো তার মার স্মৃতিচিহ্ন। আমার মা আপত্তি করেনি।'

'আর একটা খুব ব্যক্তিগত প্রশ্ন। ইচ্ছে না হলে আপনি উত্তর নাও দিতে পারেন। আপনার আর্থিক অবস্থা এই মুহূর্তে কেমন?'

প্রশ্নটা শুনে সোহিনীর একাধিক অভিব্যক্তি খেলে গেল। প্রথমটা বিস্ময়, তারপর বিরক্তি, তারপর রাগ।

সে বলল, 'এরকম ব্যক্তিগত একটা প্রশ্ন কেউ করতে পারে আমার ধারণাই ছিল না। আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব না।'

'ইচ্ছে না হলে কেন উত্তর দেবেন? আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে তদন্তের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে আমি আপনাকে প্রশ্নটা করতাম না।'

'ঠিক আছে, তাহলে শুনুন' সোহিনী মরিয়া গলায় বলল, 'মা চলে যাবার এক সপ্তাহ আগে আমাকে একটা মোটা টাকা দিয়েছিল। সেটা ব্যাঙ্কে পড়ে আছে। যদি এই বাড়িটা ছাড়তে না হয়, সেই টাকায় আমার আগামী আগস্ট অব্দি ভালোই চলে যাবে। তারপর তো বিদেশ চলে যাব। বিদেশ যাবার সমস্ত খরচ অবশ্য মরিশাসের ট্রাস্টটাই দিচ্ছে।'

'এইটুকুই আমার জানবার ছিল। আমি আজ চলি। দরকার হলে ফোন করব।'

সোহিনী উত্তর দিল না। শেষ প্রশ্নটায় সে স্পষ্টতই বিরক্ত হয়েছে।

## (৩)

পরের তিনটে দিন মোটের ওপর ঘটনাবিহীন কেটে গেল। এর মধ্যে দ্বিতীয় দিন গৌতম কবিরাজ মশাই-এর খাতার একটা কপি উদ্ধার করে পাঠিয়ে দিয়েছিল। আদিত্য দেখল ২০০৮ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে মাত্র পাঁচজনকে অশ্বগন্ধেশ্বরী নামক ওষুধটা দেওয়া হয়েছে। তাদের নাম-ঠিকানা রয়েছে। বলাই বাহুল্য, সুবীর চৌধুরির নাম কোথাও নেই। আদিত্য গৌতমকে বলেছে, এই পাঁচজনের হদিশ করতে হবে।

তৃতীয় দিন রাত্তির সাড়ে বারোটা নাগাদ আদিত্য যখন ঘুমোতে যাবার তোড়জোড় করছে, গৌতম ফোন করল।

'পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে বাড়ির সামনে দাঁড়া। আমি তোকে তুলে নেব। নরেন্দ্রপুরের দিকে যেতে হবে। বাকিটা যেতে যেতে গাড়িতে বলব।'

আদিত্যকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়েই গৌতম ফোনটা রেখে দিল। নিশ্চয় বড় কিছু ঘটেছে। নাহলে গৌতম এইভাবে এত রাত্তিরে ফোন করত না। আদিত্যর তৈরি হতে খুব বেশি সময় লাগল না। বাইরে অনেকক্ষণ বৃষ্টি পড়ছে। কখনও কম, কখনও বেশ জোরে। অভ্যাসবশত আদিত্য ছাতাটা সঙ্গে নিয়ে নিল। একবার অবশ্য মনে হল, পুলিশের গাড়িতেই তো যাচ্ছি, ছাতার কী দরকার। তারপর ভাবল, রাস্তায় বেরিয়ে কতক্ষণ দাঁড়াতে হয় কে জানে, ছাতাটা সঙ্গে থাকা ভাল।

সদর দরজায় তালা পড়ে গেছে। চাবিটা বলরামের কাছে থাকে। দরজার পাশেই যে ছোট ঘরটা আছে, যেখানে পুরোনো খবর কাগজ থেকে শুরু করে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার, কয়লা, চেলা কাঠ সব কিছু মজুত করা থাকে, সেই ঘরেই বলরাম রাত্তিরে ঘুমোয়। আদিত্য দেখল বলরাম শুয়ে পড়েছে। সে বলরামকে জাগিয়ে দিয়ে বলল, 'একটু দরজাটা খুলে দে। বেরোতে হবে।'

'এখন বেরোচ্ছ? ফিরবে কখন?' বলরাম অবাক।

'কখন ফিরব জানি না। একটু সজাগ থাকিস। ফিরে দরজায় টোকা দেব। তখন খুলে দিস।'

'এত রাত্তিরে যাচ্ছ কোথায়?' বলরামকে চিন্তিত দেখাল, 'একে রাত্তির তার ওপর এই বৃষ্টি, রাস্তায় শেয়াল-কুকুরও বেরোয়নি।'

'চিন্তা করিস না। পুলিশের গাড়িতেই তো যাচ্ছি। একটা কাজ আছে।'

'যত্ত সব উদ্ভট কাজ।' বলরাম গজগজ করতে করতে সদর দরজাটা খুলে দিল।

আদিত্য ছাতা খুলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে মিনিট দুয়েকও হয়নি, গৌতমের স্করপিওটা আদিত্যর সামনে এসে দাঁড়াল।

'উঠে পড়।' ভেতর থেকে গৌতমের গলা।

পেছনের সিটে আদিত্য আর গৌতম। সামনে ড্রাইভার ছাড়াও একজন পুলিশ, সম্ভবত গৌতমের দেহরক্ষী।

'ব্যাপার কী? এত রাত্তিরে নরেন্দ্রপুর যাবার দরকার পড়ল কেন?' গাড়ি চলতে শুরু করার পর আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'দরকার পড়ল কারণ নরেন্দ্রপুরের কাছে একটা প্রাইভেট রিসর্টে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় একজোড়া লাশ পাওয়া গেছে। একটা বসার ঘরে, অন্যটা বেডরুম থেকে ড্রয়িংরুমে ঢোকার চৌকাঠে। লাশ দুটোর বিশদ পরিচয় দিলে তোর আর একটু বুঝতে সুবিধে হবে। চৌকাঠে যাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে তিনি মন্দাকিনী চৌধুরি। আর বসার ঘরে যাকে পাওয়া গেছে সে দীননাথ যোশি, মন্দাকিনীর ড্রাইভার কাম বডিগার্ড। বডি এখনও ওখানেই পড়ে আছে। আমি বলেছি, আমরা না দেখা অব্দি ওখানেই থাকবে। রাত্তিরেই বেরোতে হল কারণ কাল সকালে এলে বৃষ্টিতে এভিডেন্স ধুয়ে যেতে পারে।'

আদিত্য অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। ব্যাপারটা হজম করতে তার সময় লাগছে। তারপর বলল, 'কী করে ব্যাপারটা জানা গেল?'

'রিসর্টের ম্যানেজার পুলিশে খবর দিয়েছে। তবে এখনও আমরা পুরো ব্যাপারটা জানি না। যেটুকু জানতে পেরেছি, বলছি। নরেন্দ্রপুরের ওই বিলাসবহুল রিসর্টটিতে সেলিব্রিটিরা নির্জনতা উপভোগ করার জন্য অজ্ঞাতবাস করেন। সেই সব সেলিব্রিটি যাঁদের রাস্তায় বেরলে মবড হয়ে যাবার সম্ভবনা। রিসর্টটি অত্যন্ত দামি। খুব বড়লোক ছাড়া এখানে কেউ আসে না। আর ভাড়া নিলে পুরো রিসর্টটাই ভাড়া নিতে হয়। রিসর্টের মালিকও বাসিন্দাদের সম্পর্কে চরম গোপনীয়তা পালন করে থাকেন। রিসর্টের ম্যানেজার জানিয়েছে কিছুদিন আগে একটা কালো কাঁচ ঢাকা গাড়িতে বোরখা পরা এক ভদ্রমহিলা বাগানবাড়িতে আসেন। এঁরা আগে থেকেই অন লাইনে এক মাসের জন্য বাড়িটা বুক করে রেখেছিলেন। কাগজপত্র যা কিছু ড্রাইভারের কাছেই ছিল, সে-ই ম্যানেজারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। বোরখা পরা মহিলা সোজা নিজের ঘরে চলে যান। ম্যানেজার ধরে নেয় ইনি একজন সেলিব্রিটি যিনি ম্যানেজারকেও নিজের পরিচয় জানাতে চান না। এরকম আগেও হয়েছে, তাই ম্যানেজার খুব একটা অবাক হয়নি। যাইহোক, এই ক'দিন ভদ্রমহিলা ঘর থেকে একবারের জন্যেও বেরোননি। তাঁর খাবার রিসর্টের প্যান্ট্রিতেই তৈরি হত, ড্রাইভারের মাধ্যমে তিনি জানাতেন কী খাবেন। আর সেই খাবার ড্রাইভার প্যানট্রি থেকে নিয়ে তাঁর ঘরে পৌঁছে দিত। অর্থাৎ বাড়ির স্টাফেরা কেউই তাঁকে কোনদিন দেখেনি। যখন হাউসকিপার ঘর পরিষ্কার করতে আসত, তিনি বোরখা পরে থাকতেন।

'ঠিক কবে উনি এখানে এসেছিলেন?'

'আমাদের ইনভেস্টিগেটিং অফিসার জানাচ্ছে, যেদিন থেকে মন্দাকিনী চৌধুরি নিখোঁজ তার দুদিন পর থেকে। অর্থাৎ ধরে নেওয়া যায়, চৌধুরি প্যালেস থেকে বেরিয়ে মন্দাকিনী দু'দিন কোথাও একটা কাটিয়েছিলেন, তারপর এখানে চলে এসেছিলেন। সেই থেকে এখানেই আছেন।'

'যে গাড়িতে উনি এসেছিলেন সেটা কি চৌধুরিদের?'

'বোধহয় না। ইনভেস্টিগেটিং অফিসার বলছে, নাম্বার প্লেটের রঙ দেখে মনে হয় গাড়িটা ভাড়া গাড়ি।'

'ড্রাইভার কোথায় থাকত?'

'এই রিসর্টেই ড্রাইভারদের জন্য থাকার ব্যবস্থা আছে। সে সেখানেই রাত্তিরে থাকত। এখানেই স্টাফেদের সঙ্গে খেত। তবে দিনের বেলায় মাঝে মাঝে তাকে বাড়িতে দেখা যেত না। হয়তো সে বাইরে কোথাও বেরোত, কখন বেরোত কখন ফিরত ম্যানেজার বা সিকিউরিটি ঠিক খেয়াল করতে পারছে না। তবে গাড়িটা চব্বিশ ঘণ্টাই বাগানবাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে দাঁড় করানো থাকত।'

গভীর চিন্তায় ডুবে গেল আদিত্য। গৌতমও আর কথা বলছে না। তারা যখন পার্ক সার্কাস কানেক্টার থেকে ডানদিকে বাঁক নিয়ে বাইপাসে পড়ছে তখন আবার মুষলধারায় বৃষ্টি নামল। ওয়াইপার সব থেকে জোরে চালিয়েও প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আন্দাজে এগোতে হচ্ছে। একটাই সুবিধে। এই ভূতুড়ে সময়ে বাইপাসে অন্য গাড়ি প্রায় নেই। আরও মিনিট চল্লিশ পরে তারা নরেন্দ্রপুরের বাগানবাড়িটাতে পৌঁছল। বৃষ্টি ততক্ষণে খানিকটা ধরেছে।

লনের একধারে পুলিশের টিমটা অপেক্ষা করছিল। তাদের সঙ্গে রিসর্টের ম্যানেজার এবং অন্যান্য স্টাফ। গৌতম গাড়ি থেকে নেমেই বলল, 'ভেতরে যাওয়া যাক।'

ভেতরে ঢুকে দেখা গেল বসার ঘরে দীননাথ যোশির লাশটা হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। ছিপছিপে মজবুত শরীর, কামানো মাথার পিছনে মোটা টিকি। তিনটে গুলি লেগেছে। একটা বুকের বাঁ দিকে, একটা পেটে, একটা চোয়ালে। মনে হয় বুকে গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গে দীননাথের মৃত্যু হয়েছে। খুব কাছ থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছে। চোয়ালে গুলি লাগার ফলে মুখের একটা অংশ উড়ে গিয়ে বীভৎস একটা ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। মৃতের চোখে মুখে যেন একটা বিস্ময়। যেন সেমরার আগে অব্দি ভাবতেই পারেনি আততায়ী তাকে গুলি করতে পারে। কার্পেটের ওপরে রক্তের পুকুর।

একটু দূরে, বসার ঘর থেকে শোবার ঘরে ঢোকার দরজার গায়ে হেলান দিয়ে মন্দাকিনী চৌধুরির মৃতদেহ। শুভ্র রাত্রিবাসের ওপর থোকা থোকা রক্ত। চোখ খোলা ও বিস্ফারিত। আদিত্য ভাবছিল, মৃত্যু সুন্দরকেও কী ভীষণ কুৎসিত করে দিতে পারে। মন্দাকিনী চৌধুরি তাহলে সত্যি সত্যি মারা গেলেন।

গৌতম এবং আদিত্যর সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন পুলিশ অফিসার এবং রিসর্টের স্টাফ বাড়ির ভেতরে ঢুকেছিল। একজন পুলিশ বলল, 'একটা বডি তো স্যার দেখাই যাচ্ছে মন্দাকিনী চৌধুরির। অন্যটাও আইডেন্টিফায়েড হয়ে গেছে স্যার। ওটা মন্দাকিনী চৌধুরির ড্রাইভার দীননাথ যোশির। চৌধুরিদের একজন স্টাফ আগে দার্জিলিং-এ চা-বাগানে কাজ করত। এখন কলকাতায় চলে এসেছে। সে দীননাথকে ভালই চিনতো। তাকে একটু আগে ধরে এনেছিলাম। মুখটা গুলি লেগে এমন মিউটিলেটেড হয়ে গেছে যে সেও প্রথমে দীননাথকে চিনতে পারেনি। পরে অবশ্য ভাল করে দেখে বলেছে বডি দীননাথেরই।'

'বডিগুলো প্রথম কে দেখে?' গৌতম অফিসারটিকে জিজ্ঞেস করল।

অফিসারটি একজন স্টাফকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'ইনি এখানকার ম্যানেজার। ইনি ভাল বলতে পারবেন।'

ম্যানেজার বলল, 'রাত্তির নটা নাগাদ ম্যাডাম ডিনার খান। ডিনারটা ম্যাডামের ড্রাইভার প্যানট্রি থেকে নিয়ে যায়। আজ কেউ ডিনার নিতে আসেনি। বাইরে খুব বৃষ্টি পড়ছিল। ড্রাইভারের ঘরটা আউটহাউসে। লন পেরিয়ে যেতে হয়। প্যানট্রির ছেলেটা ভাবল ড্রাইভার বুঝি বৃষ্টির জন্য ঘর থেকে বেরোতে পারছে না। সে সাড়ে নটা নাগাদ ম্যাডামের ঘরের নম্বরে ফোন করে, কিন্তু কোনও উত্তর পায় না। তখন সে গেটের একজন সিকিউরিটিকে ব্যাপারটা বলে। তারা দুজনে ছাতা নিয়ে ড্রাইভারের ঘরে যায়, কিন্তু গিয়ে দেখে সেখানেও কেউ নেই। তখন ওরা আমার কাছে আসে।'

'আপনি এখানে কতক্ষণ থাকেন?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'সাধারণত নটা সাড়ে নটার মধ্যে বেরিয়ে পড়ি। আমার বাড়ি এখান থেকে হেঁটে পনেরো-কুড়ি মিনিট।

'বুঝেছি। তারপর বলুন।'

আমরা তিনজন, মানে আমি, প্যান্ট্রির ছেলেটি এবং গেটের সিকিউরিটি, তখন দরজার সামনে গিয়ে ম্যাডামকে ডাকি। যখন ডাকাডাকি করছি সেই সময় হঠাৎ সিকিউরিটি ছেলেটি লক্ষ করে আমাদের মেন গেটটা খোলা। অথচ বৃষ্টি আসার আগে গেটটা যে ও বন্ধ করেছিল সেটা ও হলফ করে বলছে। আমরা ম্যাডামের দরজার হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে দেখি সেটাও লকড নয়। হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে আমরা ভেতরে ঢুকি। ঘরে আলো জ্বলছিল, এসি চলছিল। ঢুকেই দুটো বডি চোখে পড়ে। আমি তখন পুলিশে খবর দিই।'

পুলিশদের দল থেকে প্লেন ড্রেস পরা একজন এগিয়ে এসে গৌতমকে বলল, একটা কথা ছিল স্যার।'

গৌতম বলল, 'বলুন ডাঃ বরাট।', তারপর আদিত্যর দিকে ফিরে বলল, 'ইনি ডাঃ বরাট। আমাদের টিমের ডাক্তার।'

ডাক্তার বরাট বললেন, 'আমি দুটো বডিই খানিকটা পরীক্ষা করেছি। আমার প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে ঘণ্টা চারেক আগে, মানে নটা নাগাদ, দুটো মৃত্যু প্রায় একসঙ্গে হয়েছে। সম্ভবত আততায়ী প্রথমে দীননাথ যোশিকে গুলি করেছিল। সে তখন বসার ঘরে ছিল। গুলির শব্দ পেয়ে মন্দাকিনী বেডরুম থেকে বেরিয়ে আসে। আততায়ী তখন তাকেও গুলি করে।

'কেউ কোনও গুলির শব্দ শুনতে পায়নি?' আদিত্য ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করল।

'খুব বৃষ্টি পড়ছিল। মনে হয় বৃষ্টির শব্দে গুলির আওয়াজটা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল।'

'দীননাথের সঙ্গে রিভলভর ছিল স্যার।' প্রথম অফিসারটি বলল, 'কিন্তু সে বন্দুক বার করার সময় পায়নি। বন্দুকটা তার বগলের নীচে হোলস্টারে ভরা ছিল। আমরা বার করে রেখেছি। মনে হয় খুনি দুজনকে মারার পর বসার ঘরের দরজাটা টেনে দিয়ে সদর দরজা খুলে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে গেছে। দরোয়ান গেটে ছিল না। বৃষ্টি পড়ছিল বলে ঘরে বসে ওয়ার্ল্ড কাপ দেখছিল। তাই খুনিকে কেউ দেখতে পায়নি।'

'কোনও পায়ের ছাপ-টাপ পাওয়া গেছে?' গৌতম জিজ্ঞেস করল।

'বৃষ্টিতে প্রায় সব ধুয়ে গেছে স্যার, ' অফিসারটি জানাল।

বাড়িটা বিলাসবহুল। দুটো শোবার ঘর, একটা বসার ঘর, কিচেন, ডাইনিং রুম, দুটো বাথরুম, অ্যান্টিরুম, ব্যালকনি। ঘরগুলো মস্ত বড় বড়। সব মিলিয়ে অন্তত আড়াই হাজার স্কোয়ার ফিট। আদিত্য ঘুরে ঘুরে বাড়িটা দেখছিল। একটা বেডরুম ব্যবহৃতই হয়নি। অন্যটার বিছানা রাত্তিরে ঘুমোবার জন্য পরিপাটি করে তৈরি। নিশ্চয় এখানকার হাউসকিপিং স্টাফ রোজ বিছানা করে দিয়ে যায়। রাত্তিরের জন্য তৈরি বিছানাটিও অব্যবহৃত। অনুমান করা যায়, মন্দাকিনী ডিনার খাওয়া অব্দি শোবার ঘরের আরাম কেদারায় বসে টিভি দেখছিলেন কিংবা কোনও ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। ডিনার আনবে কিনা জিজ্ঞেস করতে দীননাথ বসার ঘরে ঢুকেছিল। ঠিক এমন সময় আততায়ী ঘরে ঢোকে। তখনই বেরিয়ে যাবে বলে দীননাথ দরজাটা ভেজিয়ে রেখেছিল। ফলে ঘরে ঢুকতে আততায়ীর কোনও অসুবিধে হয়নি।

ভাবতে ভাবতে আদিত্য মন্দাকিনীর বেডরুম সংলগ্ন বাথরুমটাতে ঢুকল। মেঝেতে পুরু কারপেট পাতা, একদিকে ম্যাগাজিন স্ট্যান্ড, অন্যদিকে সৌখিন লতার টব। প্রকাণ্ড আয়নার নিচে ক্যাবিনেট, সেখানে হরেক রকম প্রসাধনী, সবই বিদেশি, পারফিউমগুলো বেশিরভাগ ফরাসিদেশের। ধনীরা কীভাবে বাঁচে এসব দেখলে খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যায়। আদিত্য লক্ষ করল, প্রসাধনীর সঙ্গে একটি জারে এক সেট নকল দাঁত ভেজানো আছে। মন্দাকিনী নকল দাঁত পরত নাকি? হতেও পারে। পর্দাভিনেত্রীদের শোনা যায় সবই নকল। হঠাৎ আদিত্য খেয়াল করল, ক্যাবিনেটের এক কোনে একটি সেফটিরেজারও একটি শেভিং ফোমের কৌটো। কোনও কোনও মহিলা সেফটিরেজার ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু সেগুলো ঠিক এরকম নয়। এই সেফটিরেজারটি শুধুমাত্র পুরুষদের ব্যবহারেরই যোগ্য। এটা এখানে এল কেন? তার চিন্তায় ছেদ পড়ল, গৌতম ডাকছে, 'বসার ঘরে চলে আয়, ইন্টারোগেশন শুরু হবে।'

ইন্টারোগেশন মানে রিসর্টের স্টাফেদের জেরা করা। যখন তার পর্ব চুকল তখন ভোর পাঁচটা বেজে গেছে।

# (৪)

'কোথাও বসে একটু চা খেলে মন্দ হত না।' গাড়িতে উঠে আদিত্য বলল।

'আমার বাড়ি আসতে পারিস, তবে মালিনী এখনও ওঠেনি, কাজের মাসিও আসেনি। আমি চা করে খাওয়াতে পারি। কিন্তু সেটা নিজের রিস্কে খেতে হবে।'

'বুঝে গেছি। রাস্তার চায়ের দোকানগুলোও তো বন্ধ। তাহলে কোথায় যাই?'

'একটা কাজ করা যায়। অমিতাভ-রত্নাদের বাড়ি যাওয়া যায়। রত্না বলেছিল ও নাকি রোজ ভোর পাঁচটায় উঠে আধঘণ্টা যোগ ব্যায়াম করে। গিয়ে দেখা যেতে পারে কথাটা সত্যি কিনা আর সেই সঙ্গে ওখানে এক কাপ চাও খাওয়া যেতে পারে।'

'কথাটা মন্দ বলিসনি।' আদিত্য একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টায় চোখ বুঝল।

ঘণ্টাখানেক পরে যখন আমিতাভর বসার ঘরে বসে আদিত্য, গৌতম এবং অমিতাভ চা খাচ্ছে আর রত্না পাশের ঘরে টুবলুর স্কুলের ইউনিফর্ম ইস্তিরি করছে, তখন গৌতম বলল, 'আজ সারাদিন আমার ঘুম-টুম হবে না। মিডিয়া সামলাতেই দিনটা কেটে যাবে। আদিত্য, তুই এখন মেসে গিয়ে টানা ঘুম দিবি নিশ্চয়।'

আদিত্য প্রতিবাদ করল না। রাত্রি জাগরণের ফলে তার চোখ দুটো জ্বালা করছে। সে প্রসঙ্গ পালটে বলল, 'তোরা কি কবিরাজ মশায়ের সেই পাঁচটা রুগির খোঁজ নিয়েছিলি যারা অশ্বগন্ধেশ্বরী বলে ওষুধটা কবিরাজ মশায়ের কাছ থেকে নিয়েছিল?'

'করেছিলাম বৈকি। পাঁচজনের মধ্যে চারজনের হদিশ পাওয়া গেছে। একজনের পাওয়া যায়নি। তার নামটা ভুলে যাচ্ছি। দাঁড়া রিপোর্টটা আমার ব্যাগে আছে। ব্যাগটা গাড়িতে। আমার ড্রাইভারকে এনে দিতে বলছি।'

অমিতাভ মিউজিক প্লেয়ারে মিঞা কি তোড়ি লাগিয়েছে। কিশোরী আমোনকর। মুক্ত আকারের বিস্তার। আদিত্য ভাবল, কয়েক মিনিটে ঘরের আবহাওয়াটা কেমন বদলে গেল। ইনি মন দিয়ে গাইলে খুব কম গাইয়েই এঁর সামনে দাঁড়াতে পারত।

'কী যে তোরা অ্যা অ্যা গান শুনে আনন্দ পাস। আমার বাবা রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া চলে না। বড় জোর দু'একটা অতুলপ্রসাদী।' গৌতম হাই তুলতে তুলতে বলল।

ড্রাইভার ইতিমধ্যে ব্যাগটা এনে দিয়েছে। রত্নার কাজের মাসি আর এক প্রস্থ চা দিয়ে গেল।

'এই যে নামটা বিজয় মাকাল, করবী মাকাল এদের কোনও অস্তিত্ব নেই।' গৌতম একটা ফাইল দেখে বলল, 'যাদের রেফারেন্সে এরা এসেছিল বলে খাতায় লেখা আছে চর মাদারিপাড়ার লীলারানি ও পরেশ হালদার তাদের কাছে পুলিশ গিয়েছিল। তারা বলছে, বিজয় মাকাল বা করবী মাকাল কাউকেই ওরা চেনে না। বস্তুত কারোর কাছেই ওরা কবিরাজ মশায়ের নাম রেফার করেনি। তবে ওষুধ খেয়ে ফল পাবার পর দুজনেই আলাদা করে অনেকের কাছে কবিরাজ মশায়ের সুখ্যাতি করেছিল।'

'লীলারানি আর পরেশ কি চর মাদারিপাড়াতেই থাকে?'

'দাঁড়া, দেখে বলতে হবে।' গৌতম আবার ফাইলে চোখ রাখল, 'পরেশ ওখানেই থাকে। লীলারানি অবশ্য কলকাতায় বাবু বাড়িতে থেকে রাঁধুনির কাজ করে।'

'কলকাতার কোন অঞ্চলে লীলারানি থাকে?'

'দাঁড়া, এটাও দেখে বলতে হবে। হ্যাঁ, লীলারানি থাকে বাগবাজার অঞ্চলে।'

গৌতম অমিতাভকে জোড়া লাসের গল্পটা বলছিল। ইতিমধ্যে কিশোরী আমোনকর তোড়িতে একটা অতিদ্রুত তরানা ধরেছেন। আদিত্য নিজের অজান্তেই সোফার হাতলে তাল দিচ্ছে। গৌতমকে আর কী কী যেন জিজ্ঞেস করার ছিল। সে গৌতমকে বলল, 'মন্দাকিনী এবং তার ড্রাইভারের সঙ্গে কী কী জিনিস ছিল তার একটা লিস্ট নিশ্চয় তোরা করবি। করা হয়ে গেলে আমাকে একটা কপি পাঠাবি? আর দু'টো কথা।

একটা রেড করতে হবে। এবং একজনকে চোখে চোখে রাখতে হবে। সে কোথায় যাচ্ছে কার সঙ্গে কথা বলছে সব জানতে হবে। ডিটেলটা বলছি।'

বাড়ি ফিরে মোবাইল অফ করে সারাদিন ঘুমোল আদিত্য। ঘুম না হলে সে বেজায় কাবু হয়ে পড়ে। ছাত্রজীবনেও কখনও রাত জেগে পড়তে পারত না। ঘুম ভাঙল সেই সন্ধের মুখে। কেউ দরজায় টোকা দিচ্ছে। খুলে দেখে বিমল।

'আপনাকে মোবাইলে পাচ্ছিলাম না স্যার, তাই ভাবলাম একবার গিয়ে দেখি।'

'বাড়িতে আছি জানলে কী করে?'

'আন্দাজ করলাম স্যার। আপিসে থাকলে নিশ্চয় মোবাইলটা খোলা থাকত।'

আদিত্য যুক্তিটা ঠিক ধরতে পারল না। ওটা নিয়ে ভাবতেও খুব ইচ্ছে করল না। লাঞ্চ খাওয়া হয়নি। খিদে পেয়েছে। এখন খাবার আনার জন্য বলরামকেও পাওয়া যাবে না। সে বিমলকে বলল, 'শোনো, আমাদের মেস থেকে বেরিয়ে ডানদিকে গেলে একটা গলি দেখবে। গলির মোড়ে এই সময় কচুরি ভাজে। তাই গোটা দশেক নিয়ে এস। সঙ্গে ছোলার ডাল দেবে। আমার আজ দুপুরে খাওয়া হয়নি। তুমিও আমার সঙ্গে একটু খেও। তোমার গিন্নির জন্যেও নিয়ে যেও। দশটায় হবে?'

'আমি এখান থেকে কাজে যাব স্যার। গিন্নির জন্য কচুরি নিলে খারাপ হয়ে যাবে।'

'তাহলে তুমি নিজেই পরে খেয়ে নিও। আর এই কেটলিটা নিয়ে যাও। একটু চা এনো।'

খাওয়াদাওয়া শেষ হওয়ার পর বিমল ভাঁড়ে চা ঢালল। বলল, 'একটা ভাল খবর আছে স্যার। সেটা জানাতেই এলাম। কলকাতায় একটা ঘর পেয়ে গেছি। আর গোবরডাঙা থেকে যাতায়াত করতে হবে না।'

'কোথায় ঘর পেলে? টালিগঞ্জে?'

'টালিগঞ্জের ঘরটা শেষ অব্দি পাওয়া গেল না স্যার। অনেক টাকা অ্যাডভান্স চাইল। শেষে একটা ঘর পেলাম কৈলাশ বোস স্ট্রিটে, আপনার বাড়ির খুব কাছে। কাজের জায়গাটা অবশ্য একটু দূর হয়ে গেল।'

'তোমার গোবরডাঙার থেকে তো কাছে হলো।'

'তা তো হলোই স্যার।'

'শোনো, এলেই যখন, তখন একটু কাজের কথা বলি। দুটো জায়গায় গিয়ে খোঁজ-খবর নিতে হবে। একটা বাগবাজারের কাছে, রাজবল্লভ পাড়ায়, অন্যটা জনাইতে।'

আদিত্য অনেকক্ষণ ধরে বিমলকে বোঝাল কী করতে হবে। যাবার সময় বিমলকে বলে দিল, 'আমার খুব তাড়াতাড়ি রিপোর্ট চাই কিন্তু।'

## দশম পরিচ্ছেদ

(১)

চৌধুরি বাড়ির রহস্য ভেদ হয়ে যাবার অনেকদিন পরেও মাঝে মাঝে আদিত্য নিজেকে প্রশ্ন করত এই রহস্য ভেদের পেছনে তার নিজের কতটুকু অবদান ছিল? তার বারবার মনে হয়েছে, অপরাধীদের শাস্তি হবার পেছনে তার যত না কৃতিত্ব ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি কৃতিত্ব ছিল ভাগ্যদেবতার, ভবিতব্যের। এই ভবিতব্যই যেন খুব তাড়াহুড়ো করে একটা কাহিনির অবসান ঘটিয়ে দিল, যে কাহিনিটা আরও অনেকদিন চলতে পারত।

মন্দাকিনী চৌধুরির দ্বিতীয় খুনের খবর নিয়ে কয়েকটা দিন মিডিয়ায় অভূতপূর্ব তোলপাড় হল, ঠিক যেরকম আদিত্য আশঙ্কা করেছিল। পুলিশের সমালোচনা, সরকারের মুণ্ডপাত, মাতব্বরদের বিশ্লেষণ কিছুই বাদ গেল না। এই ক'দিন আদিত্যর বাড়িতে বসে বসে ভাবা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। বসে বসে চিন্তা করা আর গৌতম এবং বিমলের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করা।

এর মধ্যে গৌতমের সঙ্গে কয়েকবার লালবাজারে মিটিং হয়েছে। বিমল ফোন করল দুদিন পরে।

'জনাই, বাগবাজার দুটো জায়গাতেই গিয়েছিলাম স্যার।'

'কী জানতে পারলে?'

'স্যার, জনাইতে যে বাড়িটায় যেতে বলেছিলেন সেখানে গিয়ে দেখি একতলাটা অনেকদিন তালা বন্ধ পড়ে রয়েছে। বাড়িওলা বলল, ভাড়াটে ছ'মাসের ভাড়া দিয়ে বলে গেছে কিছুদিনের জন্য সে বাইরে যাচ্ছে। বাড়ি তালাবন্ধ পড়ে থাকবে, বাড়িওলা যেন একটু নজর রাখে।'

'আর বাগবাজার?'

'সেখানে গিয়ে ওই কাজের মাসির খবর পেতে পেতেই দুটো দিন লেগে গেল। মাসি এখন আর রাজবল্লভ পাড়ায় কাজ করে না। খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারলাম মাসি এখন বাগবাজার স্ট্রিটের একটা বাড়িতে রাতদিনের কাজ করছে। ঠিকানা খুঁজে সেখানে একটা দুপুরবেলা পৌঁছে গেলাম। রাজবল্লভ পাড়ার বৌদির কথা মাসির ভালই মনে আছে। বলল, বৌদি সিরিয়ালে করত। দাদা সারাদিন বাড়ি থাকত। সন্ধেবেলা নাটকের রিহার্সাল হত। দাদা-বৌদির প্রচণ্ড ভালবাসা ছিল। ওদের একটা ফুলের মতো সুন্দর মেয়ে ছিল। তবে মাঝে মাঝে টাকাপয়সার বেশ টানাটানি যেত। কিন্তু তাতে ভালবাসা কমেনি। পরে দাদা-বৌদির ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে শুনে মাসি একটু অবাকই হয়েছিল।'

'তার মানে দাদা-বৌদির ছাড়াছাড়ির সময় মাসি ওদের কাজ করত না?'

'না। মাসি তার আগেই বাচ্চা হবার জন্য কাজ ছেড়ে দেশে চলে গিয়েছিল। দুবছর কাজ করেনি।'

'তোমাকে যেটা জিজ্ঞেস করতে বললাম, জিজ্ঞেস করেছিলে?'

'করেছিলাম স্যার। মাসি নিজে ওই ওষুধটা ব্যবহার করে ফল পেয়েছিল। তাই ওষুধ এবং কবিরাজ মশায়ের কথা বলতেই বুঝতে পারল। এসব নিয়ে প্রশ্ন করছি বলে বেশ চটেও গেল। আমি বললাম, মাসি ওই ওষুধটার খোঁজেই তো তোমার কাছে এসেছি। আমার নিজের দরকার। তুমি নাকি এই ওষুধটার কথা অনেককে বলেছ। তখন মাসি একটু নরম হল। বলল, হ্যাঁ, উপকার পেয়েছি বলেই তো অনেককে বলেছি। তবে বৌদিকে বলেছিলাম কিনা মনে করতে পারছি না। মাসির কাছ থেকে এইটুকুই জানতে পেরেছি স্যার।'

'যা জানতে পেরেছ, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। সময় পেলে একদিন চলে এস।'

এর একদিন পরে সকালে আপিস গিয়ে আদিত্য দেখল গৌতম একটা খাম পাঠিয়েছে। একজন পুলিশ এসে খামটা শ্যামলের হাতে দিয়ে গেছে। খাম খুলে দেখে এক তাড়া কাগজ কী কী জিনিস মন্দাকিনী ও তার ড্রাইভারের কাছ থেকে পাওয়া গেছে তার লম্বা তালিকা। তালিকাটায় একবার চোখ বোলাতে না বোলাতে গৌতমের ফোন।

'লিস্টটা দেখলি?'

'দেখলাম। বড় মানুষদের বাঁচার জন্য কত কী লাগে দেখলে অবাক হতে হয়। তবে সব থেকে আশ্চর্য হলাম মন্দাকিনীর হুইগের কালেকশন দেখে। দু'একটা ব্লন্ড পরচুলাও রয়েছে দেখলাম। মন্দাকিনী পরচুলা পরত নাকি?'

'হয়তো এমনিতে পরত না, কিন্তু আত্মগোপন করার জন্য পরচুলা পরার দরকার পড়েছিল।' গৌতম ভেবেচিন্তে বলল।

'আর একটা জিনিস লক্ষ করেছিস? মেয়েদের উইগগুলোর সঙ্গে একটা ছেলেদের নকল গোঁপ-দাড়ি এবং চুল রয়েছে। সেটা কার জন্যে?'

'আমার মনে হয়, ওটা ড্রাইভারের জন্যে। সেলব্রিটিদের ড্রাইভাররাও তো অনেকের পরিচিত। তাছাড়া এই লোকটাও তো অ্যাবস্কন্ড করে ছিল। তার হয়ত মাঝে মাঝে নকল চুল এবং গোঁপ-দাড়ির দরকার পড়ত।'

'সেটা হতে পারে। তবে মালকিনের দামি উইগগুলোর সঙ্গে ড্রাইভারের নকল গোঁপ-দাড়ি-চুল থাকাটা একটু অড। ওটা ড্রাইভারের ঘরে পাওয়া গেলে আরও স্বাভাবিক হত। যাই হোক, যেখানে রেড করতে বলেছিলাম সেখানে রেড করে কিছু পেলি?'

'সার্চ-টার্চ কিছু করতে হয়নি। জিনিসটা চাইতেই ভদ্রমহিলা দিয়ে দিলেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই দিলেন। আমরাও ওটা নিয়ে সুড়সুড় করে ফিরে এলাম।'

'খুবই সেন্সেবল মহিলা।'

'তাহলে এবার কী করণীয়?' গৌতম জিজ্ঞেস করল।

'রহস্যের জাল গুটিয়ে এসেছে। তুই পরশুদিন সন্ধে সাতটায় মরগ্যান ব্যানার্জির আপিসে একটা মিটিং অরগানাইজ কর। রত্নাবলী, সুব্রত এবং সোহিনী এদের আসতে বল। সোহিনীর বয়ফ্রেন্ড নন্দন চক্রবর্তীও থাকলে ভাল হয়। আর হ্যাঁ, শিশির চ্যাটার্জি এবং শৈলেন ড্রাইভার দুজনকেই থাকতে বলিস। শুদ্ধশীল ব্যানার্জিকে তো থাকতেই হবে। মার্থাকেও আসতে বলিস। পিস ইন্টারন্যাশানালের সেই ছেলেটি, নাম বোধহয় সৌরাশিস ঘোষ, তার থাকাটাও বিশেষ জরুরি। তুই তো অবশ্যই থাকবি। কয়েকজন আরমড পুলিশ সঙ্গে রাখিস। বোথ পুরুষ এবং মহিলা পুলিশ। বলা যায় না কে কীভাবে রিঅ্যাক্ট করবে। সেদিন যবনিকা উদ্ঘাটিত হবে।'

বিকেলে একটা মিনিবাস ধরে অমিতাভদের বাড়িতে পৌঁছল আদিত্য। রত্না তখনও ফেরেনি। টুবলু নীচের কম্পাউন্ডে খেলতে গেছে। অমিতাভ একা একা বসে কম্পিউটারে কী একটা লিখছিল।

'তারপর, তোর চৌধুরি প্যালেস রহস্য কত দূর এগোল?' অমিতাভ সহজ ভাবে জিজ্ঞেস করল।

'প্রায় সলভ করে এনেছি। পরশু মনে হচ্ছে পর্দা উঠবে। তোকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে এসেছি। শুনলাম নন্দন চক্রবর্তী পুনায় চলে যাচ্ছে। এটা কি ওর পক্ষে ভাল হবে?'

অমিতাভকে রীতিমত উত্তেজিত দেখাল।

'নন্দন চলে যাচ্ছে তুই জানিস তাহলে। আমি বলব, পুনায় গেলে ওর সর্বনাশ হবে। শুধু যে ওর গানের ক্ষতি হবে তাই নয়, ব্যক্তিগতভাবে ও নেশাভাঙ করে একেবারে শেষ হয়ে যাবে। দ্যাখ, নন্দনের তালিম যা হবার হয়ে গেছে। নতুন করে ওর আর কিছু শেখার নেই। ও এখন যেটুকু শিখেছে সেটা অ্যাসিমিলেট করছে। নিজস্ব একটা স্টাইল তৈরি করছে। এটা না করতে পারলে কেউই সত্যিকারের বড় শিল্পী হতে পারে না। এই অ্যাসিমিলেশনের জন্য ওর নির্জনতা দরকার। সারাদিন যদি গান শেখাতে হয় তাহলে নিজে রেওয়াজ করবে কখন? চিন্তা করবে কখন?'

'তাহলে ও যাচ্ছে কেন?'

'এখানে কে ওকে দেখবে? সোহিনী তো কলম্বিয়া যাচ্ছে। নন্দন চায় সোহিনী বিদেশে গিয়ে একটা ভাল পিএইচডি করুক। সে সোহিনীর কেরিয়ারে কোনও বাধা হতে চায় না। তাই পুনের অফারটা নন্দন নিয়ে নিয়েছে।'

'পুনেতে গেলে ও তো নতুন কিছু শিখতেও পারবে।'

'সেটা আর একটা সমস্যা। পুনেতে যে ওস্তাদের সঙ্গে ওকে ফিট করা হচ্ছে তিনি আগ্রা ঘরানার পুরোনো ওস্তাদ। ভীষণ অর্থোডক্স। ফৈয়জ খাঁর গানের বাইরে আর কিচ্ছু বোঝেন না। নন্দনকে দিয়ে ফৈয়জ খাঁর মতো করে গাওয়াতে গেলে নন্দনের বারোটা বেজে যাবে।'

'তোরা নন্দনের জন্য কিছু করতে পারিস না?'

'অবশ্যই পারি। কয়েকজন মিলে কন্ট্রিবিউট করে নন্দনের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। কিন্তু সোহিনী যেভাবে ওকে আগলে রাখে, একটু একটু করে নেশা ছাড়াবার চেষ্টা করে, ওর নানারকম বায়নাক্কা সহ্য করে, আমরা সেরকম কিছু পারব না। নন্দনও আমাদের কাছ থেকে সাহায্য নেবার বদলে একটা ইন্সটিটিউশনের টাকা নেওয়াটা প্রেফার করবে।

'সোহিনী কি এসব বোঝে না?'

'কিছুটা হয়ত বোঝে। কিন্তু তারই বা উপায় কী? এখানে থাকলে তার নিজেরটাই তো চলবে না। তার মা তো তাকে কিছুই দিয়ে যায়নি। তবে সোহিনী বিশ্বাস করে পুনেতে গেলে নন্দনের ভালই হবে। নাহলে সে নন্দনকে ছেড়ে অ্যামেরিকা যেত না।'

'শোন। নন্দনকে নিয়ে চিন্তা করিস না। পরশু দিন রহস্য উদঘাটনের পর হয়ত অনেক কিছুই বদলে যাবে।' আদিত্য আস্তে আস্তে বলল।

(২)

সারাদুপুর বৃষ্টি পড়েছে। রাস্তায় জল জমার মতো নয়, কিন্তু ছাতা ছাড়া বেরোলে ভিজে যেতে হবে। বৃষ্টি ধরল সন্ধের মুখে। একে শনিবার, তার ওপর বৃষ্টি, আপিস পাড়ার রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা। রাস্তায় বেরিয়ে আদিত্যর মনে হল, চারদিকে একটা বিষণ্ণতা ছড়িয়ে রয়েছে। হয়ত বাইরে নয়, বিষণ্ণতা তার ভেতরে। চৌধুরি বাড়ির রহস্যটা আর তার কাছে রহস্য নেই। সব কিছু জলের মতো পরিষ্কার। মানুষের লোভ, ঘৃণা, নীচতা আরও একবার নগ্নভাবে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। হয়ত বিষণ্ণতা সেই জন্য। যতই সে নিজেকে জীবনযুদ্ধে পোড়-খাওয়া একজন অবিশ্বাসী, সন্দেহপ্রবণ, সদাসতর্ক ভাড়াটে সৈনিক হিসেবে কল্পনা করুক না কেন, তার ভেতরে এখনও এমন একটা ছেলেমানুষি সত্তা লুকিয়ে আছে যে বিধাতার মঙ্গলসাধনে বিশ্বাস রাখে। মানুষের মধ্যে অশুভ কিছু দেখলে যার বিষণ্ণ লাগে।

মর্গ্যান ব্যানার্জির মিটিং রুমে ঢুকে আদিত্য দেখল কয়েকজন ইতিমধ্যেই এসে গেছে। আগের বার যে ঘরটায় মিটিং হয়েছিল এটা তার থেকে আরও বড় একটা মিটিং রুম। তারা বসে থাকতে থাকতে বেয়ারা চা দিয়ে গেল। চা খেতে খেতে আদিত্য লক্ষ করল কেউই আজ বিশেষ কথা বলছে না। কিছুক্ষণের মধ্যে সকলেই চলে এল, এমনকি মার্থাও। দু-একজন মার্থার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল বটে, কিন্তু সেটা মার্থা খুব একটা গা করল বলে মনে হলো না। অবশেষে গৌতম তার দলবল নিয়ে ঢুকল, পেছনে পেছনে তাঁর জুনিয়রের সঙ্গে শুদ্ধশীল ব্যানার্জি।

ঘরে একটাই দরজা। পুলিশ অফিসারেরা সেই দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে। যেন কেউ বাইরে যেতে গেলেই পথ আটকাবে। শুদ্ধশীল ব্যানার্জি বললেন, 'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন, থ্যাঙ্কস ফর কামিং। আজকের এই মিটিংটা আমি ডাকিনি, ডেকেছেন জয়েন্ট কমিশনার ক্রাইম, গৌতম দাশগুপ্ত।'

গৌতম সকলকে হাত তুলে নমস্কার করল। বলল, 'আপনারা শুনে খুশি হবেন, আমরা মন্দাকিনী চৌধুরির অন্তর্ধান এবং হত্যা রহস্য সলভ করে ফেলেছি। মন্দাকিনীর অন্তর্ধান এবং মৃত্যুর সঙ্গে আপনাদের সকলের ভাগ্যই জড়িত বলে আজ আপনাদের এখানে ডাকা হয়েছে। এই রহস্য সমাধানের একটা গুরুত্বপূর্ণ আইনি তাৎপর্যও আছে। তাই এই মিটিংটা শুদ্ধশীল ব্যানার্জির উপস্থিতিতে মর্গ্যান ব্যানার্জির অফিসে করা হচ্ছে। আপনাদের কোনও প্রশ্ন আছে?'

'হ্যাঁ আছে। ইনি কে? ইনি এখানে কী করছেন?' সুব্রত সেন মার্থার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল।

'ইনি মার্থা স্যাভিও। শঙ্খদীপ চৌধুরি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি একে উইল করে দিয়ে গেছেন। যদি কোনও কারণে মন্দাকিনী চৌধুরির শেষ উইলটি বাতিল হয়ে যায় তাহলে ইনি চৌধুরি এন্টারপ্রাইজেসের এক তৃতীয়াংশ মালিক হবেন। তাই মার্থাকে এখানে আসতে বলা হয়েছে।' গৌতম ঠান্ডা গলায় বলল।

গৌতমের কথা শুনে একটা চাপা গুঞ্জন উঠল। সেই গুঞ্জন থিতিয়ে যাবার পর গৌতম আবার শুরু করল, 'চৌধুরি বাড়ির রহস্য ভেদ করতে পুলিশকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন আদিত্য মজুমদার, যাকে বেসরকারি গোয়েন্দা হিসেবে প্রথমে মন্দাকিনী চৌধুরি এবং পরে সোহিনী মৈত্র নিয়োগ করেছিলেন। আমি আদিত্যকে এখান থেকে টেক আপ করতে অনুরোধ করব। তবে আগেই বলে রাখি, আদিত্য যা বলবে তার পেছনে পুলিশের অনুমোদন আছে।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর আদিত্য বলতে শুরু করল, 'মাস ছয়েক আগে মন্দাকিনী চৌধুরি তাঁর মেয়ে সোহিনীর মাধ্যমে আমাকে নিয়োগ করেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল কেউ তাঁকে খুন করার চেষ্টা করছে। এবং তাঁর ধারণা একেবারে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়নি কারণ তার আগে তাঁর তিন-তিনটে অ্যাকসিডেন্ট হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য আশ্চর্যভাবে তিনটে ক্ষেত্রেই তিনি শারীরিক ভাবে অক্ষত ছিলেন। পরপর তিনটে অ্যাকসিডেন্ট কাকতালীয় হতে পারে না, তাই তাঁর মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল যে, কেউ তাঁকে খুন করার চেষ্টা করছে। আমার কাজ ছিল তদন্ত করে দেখা তাঁর ধারণাটা কতদূর ঠিক।

'আমি সাংবাদিকের ভেক ধরে আপনাদের অনেকের সঙ্গে কথা বললাম। দেখলাম মন্দাকিনী চৌধুরিকে কেউই পছন্দ করে না, কেউ কেউ তাঁকে রীতিমতো ঘৃণা করে, এমনকি সোহিনীও তার মাকে ইদানীং অপছন্দ করতে শুরু করেছে, কারণ তার মা তার বয়ফ্রেন্ডকে অনুমোদন করেননি। তাই এটা মোটেই অসম্ভব নয় যে, কেউ মন্দাকিনীকে খুন করতে চাইছে। যখন তদন্ত করছি তখন আমার ওপর দুজন গুণ্ডা হামলা করল, আমাকে বলল আমি যদি আমার তদন্ত না থামাই তাহলে আমাকে জানে মেরে দেবে। সোজাসুজি থ্রেট। গুণ্ডাগুলো পরে ধরা পড়েছিল। তাদের চাপ দিয়ে জানা গেল একজন বাবরি চুলওলা কালো চশমা পরা লোক ওদের নিয়োগ করেছিল। তারও আগে এক বাবরি চুলওলা কালো চশমা আমার আপিসে খোঁজ নিতে এসেছিল আমি কেমন গোয়েন্দা।'

'যাই হোক আমি মৌখিক ভাবে আমার রিপোর্ট দিয়ে দিলাম যার সারমর্ম মন্দাকিনীকে কেউ খুন করতে চাইছে এই সম্ভাবনা মোটেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মন্দাকিনী উইল না করে মারা গেলে অনেকেরই লাভ। মন্দাকিনী বললেন, শুধু মুখে বললে হবে না, বিস্তারিত রিপোর্ট লিখিতভাবে দিতে হবে। কিছুদিন পরে আমি সেটাও দিলাম, মন্দাকিনী অতি সত্বর আমার পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দিলেন, চৌধুরি প্যালেসের সঙ্গে আমার আর কোনও সম্পর্ক রইল না। আমার কিন্তু কয়েকটা খটকা রয়ে গেল।'

'আর এক রাউণ্ড চা হলে মন্দ হতো না।' গৌতম শুদ্ধশীল ব্যানার্জির দিকে তাকিয়ে বলল। শুদ্ধশীল বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডেকে চা আনতে বললেন, চা এল, সঙ্গে প্লাম কেক, কিছুক্ষণ খাওয়া-দাওয়া চলল এবং এইসব করতে মিনিট দশেক ব্যয় হল। আদিত্য এই সময়টা চুপ করেই ছিল।

চা পর্ব শেষ হবার পর আদিত্য আবার বলতে শুরু করল। 'আমার প্রথম খটকা, পরপর তিনবার অ্যাকসিডেন্ট যেমন কাকতালীয় হতে পারে না, তেমনি পরপর তিনবার অ্যাকসিডেন্ট থেকে অক্ষত দেহে

বেরিয়ে আসাটাও কি কাকতালীয় হতে পারে? যে মন্দাকিনীকে খুন করতে চাইছে সে কি এতটাই অপদার্থ? অর্থাৎ প্রশ্ন উঠছে, অ্যাকসিডেন্টগুলো সাজানো নয় তো?

'দ্বিতীয় খটকা, সোহিনীর কাছে জানলাম মন্দাকিনীর বাঁ পায়ের হাঁটুতে বাত ছিল বলে তিনি বাঁ হাঁটুটা বেশিক্ষণ ভাঁজ করে থাকতে পারতেন না। তাই গাড়িতে উঠলে সব সময় তিনি পেছনের আসনে বসে বাঁ পাটা বাঁ দিকে ছড়িয়ে দিতেন। সোহিনী গাড়ি চালালে অবশ্য সামনে বসতেন। সামনে বসলে পা-টা ছড়িয়ে দেবার সব থেকে বেশি সুবিধে। কিন্তু ড্রাইভার গাড়ি চালালে তার পাশে বসতে মন্দাকিনীর অস্বস্তি হত। তখন তিনি পেছনেই বসতেন। বলাই বাহুল্য, বাঁ পাটা ছড়াতে গেলে ড্রাইভারের ঠিক পেছন দিকে বসতে হয় যাতে বাঁ দিকে পা ছড়ানোর মতো জায়গা থাকে। কিন্তু শৈলেন ড্রাইভারের কাছে জানতে পারলাম ডায়মন্ডহারবার রোডের ওপর অ্যাকসিডেন্টের দিন তিনি ড্রাইভারের ঠিক পেছনে না বসে বাঁ দিকের জানলার ধারে বসেছিলেন। শৈলেন বলল, উনি সেদিন ড্রাইভারের ঠিক পেছনের সিটে অর্থাৎ ডানদিকের জানলার ধারে বসলে গুরুতর জখম হতেন। উনি সেদিন বাঁ দিকের জানলার ধারে বসলেন কেন? উনি কি আগে থেকেই জানতেন সেদিন একটা অ্যাকসিডেন্ট হতে চলেছে? এর সঙ্গে আরেকটা জিনিস যোগ করা যায়। ডায়মন্ডহারবার রোডে অ্যাক্সিডেন্টের দিন মন্দাকিনী তাঁর পুরোনো হন্ডা অ্যাকর্ড নিয়ে বেরিয়েছিলেন, নতুন কেনা মার্সিডিজটা নেননি। এর থেকেও মনে হতে পারে তিনি আগে থেকে জানতেন গাড়িটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছে।'

'আমার তৃতীয় খটকা, লিখিত রিপোর্ট জমা দেওয়া নিয়ে মন্দাকিনীর দিক থেকে একটা অহেতুক চাপ ছিল। যতদিন রিপোর্টটা জমা দিইনি ততদিন তাগাদা দিয়ে মন্দাকিনীর সেক্রেটারি আমাকে ক্রমাগত ফোন করে যাচ্ছিল, বলাই বাহুল্য, মন্দাকিনীর নির্দেশে। আমার মনে হচ্ছিল, একজন পেশাদার গোয়েন্দার লিখিত একটা রিপোর্ট মন্দাকিনীর দরকার ছিল যেখানে লেখা থাকবে সম্ভবত মন্দাকিনীকে কেউ খুন করার চেষ্টা করছে। অর্থাৎ তদন্তের থেকেও যেন লিখিত রিপোর্টটা মন্দাকিনীর দরকার ছিল বেশি, যেটা পরে আমরা দেখেছি কীভাবে উইল তৈরি করার সময় ব্যবহার করা হয়েছে।'

'আমার চতুর্থ খটকা, আমি রিপোর্ট দেওয়া সত্ত্বেও মন্দাকিনী সাবধান হলো না কেন? কেন সে শুধুমাত্র ড্রাইভারের ওপর ভরসা করে দুর্গম রাস্তায় যেতে গেল? যদিও তার ড্রাইভারের সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র থাকত, তবু আমি বলব এ তো যেচে বিপদকে ডেকে আনা।'

'মন্দাকিনীর শেষ উইলে বলা হল, যেহেতু তার নিকট আত্মীয়দের কেউ তাকে খুন করার চেষ্টা করছে তাই তার অপঘাত মৃত্যু হলে সমস্ত সম্পত্তি পিস ইন্টারন্যাশানাল বলে একটা অজানা, অনামা সংস্থার হাতে চলে যাবে। এবং কেউ যে তাকে সত্যিই খুন করার চেষ্টা করছে তার সমর্থনে আমার রিপোর্টটা পেশ করা হল। আমার রিপোর্টটা যাতে জোরদার হয় তার জন্য গুন্ডা লাগিয়ে আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা হল। সুবিধেমতো উইলটা মন্দাকিনী অন্তর্ধানের আগে গোপন রাখা হল, আগে জানাজানি হয়ে গেলে মন্দাকিনীর নিকট আত্মীয়দের ওপর খুনের সন্দেহ চাপানো যেত না। অর্থাৎ মন্দাকিনীর মূল উদ্দেশ্য ছিল উধাও হয়ে যাওয়া, উধাও হয়ে যাবার আগে চৌধুরিদের যথাসর্বস্ব পিস ইন্টারন্যাশানাল নামক একটি অজানা সংস্থাকে দিয়ে যাওয়া এবং পৃথিবীকে বিশ্বাস করানো যে সে সত্যিই খুন হয়ে গেছে। তার জন্য বানানো অ্যাকসিডেন্ট, গোয়েন্দা-নিয়োগ, ভাড়াটে গুন্ডা দিয়ে গোয়েন্দাকে ভয় দেখানো যাতে গোয়েন্দার মনে হয় সত্যি সত্যি কেউ মন্দাকিনীকে খুন করার চেষ্টা করছে, এবং সব শেষে গোয়েন্দার কাছ থেকে লিখিত রিপোর্ট নেওয়া, সবটাই পূর্ব পরিকল্পিত ছিল। অবশ্য পিস ইন্টারন্যাশানালের মাধ্যমে বেশ কিছুদিন ধরেই মন্দাকিনী কোম্পানির টাকা সাইফন অফ করছিলেন। ফলে কোম্পানির স্বাস্থ্য উত্তরোত্তর খারাপ হচ্ছিল।'

আদিত্য কিছুক্ষণের জন্য থামল। ঘরে অখণ্ড নীরবতা। একটা সিগারেট ধরাতে খুব ইচ্ছে করছে। কিন্তু এখানে তার উপায় নেই। পিস ইন্টারন্যাশানালের সৌরাশিস ঘোষ হঠাৎ বলে উঠল, 'আপনি কিন্তু ভুল

করছেন আদিত্যবাবু। পিস ইন্টারন্যাশানাল কোনও হেঁজিপেঁজি সংস্থা নয়, বিদেশে আমাদের রেজিস্ট্রেশন, আমরা সারা পৃথিবী জুড়ে কাজ করি।'

'আপনাদের প্রসঙ্গে পরে বিস্তারিতভাবে আসা হবে। এখন দয়া করে আদিত্যকে বলতে দিন।' গৌতম কড়া গলায় বলল। সৌরাশিস কী একটা বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল।

আদিত্য আবার বলতে লাগল। 'একটা প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে উঠে আসছে কেন মন্দাকিনী উধাও হয়ে যেতে চাইলেন? বেশ তো চলছিল। চৌধুরিদের বিশাল ঐশ্বর্য তাঁর দখলে। যা চাইছেন তাই পাচ্ছেন। হঠাৎ তাঁর অসুবিধেটা কী হল? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের সুবীর চৌধুরির মৃত্যুর ঠিক পরে একটা ছোট্ট ঘটনার দিকে তাকাতে হবে। আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাটা তুচ্ছ, কিন্তু মন্দাকিনীর নির্ঝঞ্ঝাট জীবনকে এই একটা ঘটনা আমূল নাড়িয়ে দিল।

'সুবীর চৌধুরির মৃত্যুর কিছুদিন পরে একটা সকালে চৌধুরি প্যালেসে এসে শঙ্খমালা তাঁর বাবার পড়ার ঘরের একটা ক্লজেটে একটা পুরোনো স্যুটকেস দেখতে পান। স্যুটকেসে শঙ্খমালার মায়ের কিছু পুরোনো জিনিসপত্র ছিল। শঙ্খমালা স্যুটকেসটা নিয়ে যেতে চাইলে মন্দাকিনী রাজি হয়ে যান। শঙ্খমালা তার মায়ের পুরোনো জিনিস নিয়ে যাবে এটা তো স্বাভাবিক, রাজি না হবার কোনও কারণ মন্দাকিনীর ছিল না। স্যুটকেসটা ওপর ওপর তিনি দেখলেন, কিছু পুরোনো শাড়ি-ব্লাউজ, কার্পেটের আসনে শঙ্খমালার মায়ের কিছু হাতের কাজ, সুবীর চৌধুরির প্রথম বিয়ের অ্যালবাম, একটা পুরোনো খাতায় শঙ্খমালার মায়ের হাতের লেখায় কিছু রান্নার রেসিপি, এইসব টুকিটাকি। স্যুটকেসে কী কী ছিল আমরা পরে শঙ্খমালার কাছ থেকেই জানতে পেরেছি। কিন্তু এইসব টুকিটাকি ছাড়াও স্যুটকেসের তলায় সুবীর চৌধুরির একটা ডায়েরি ছিল যেটা দেখতে পেলে মন্দাকিনী কখনই সেটা কারোর হাতে পড়তে দিতেন না। ডায়েরিটা লিখে সুবীর চৌধুরিই সম্ভবত সেটা তাঁর প্রথম স্ত্রীর জিনিসপত্রের মধ্যে লুকিয়ে রাখতেন। জিনিসপত্রের ভেতর থেকে শঙ্খমালা সেই ডায়েরিটা আবিষ্কার করেন।'

'আমি এখানে একটা কথা বলতে চাই।' গৌতম পুলিশি গাম্ভীর্য নিয়ে বলে উঠল, 'সুবীর চৌধুরির ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে দু'একটা অপ্রিয় কথা আমাদের বলতে হবে। এটা বলতে হবে সত্য উ[illegible]ঘাটনের স্বার্থে, আইনের স্বার্থে। আমরা এর জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।'

উত্তরে কেউ কোনও কথা বলল না।

আদিত্য আবার বলতে লাগল। 'সুবীর চৌধুরির ডায়েরি থেকে এটা স্পষ্ট যে, দ্বিতীয়বার বিয়ে করে তিনি সুখী হননি। এর বড় কারণ বিয়ের পর তিনি টের পান তিনি আর যথেষ্ট পুরুষ নন। দ্বিতীয়বার বিয়ে করার সময় তাঁর বয়েস ছিল তেষট্টি, তিনি তার আগে দীর্ঘদিন হার্টের অসুখে ভুগছিলেন, তাছাড়া ব্যবসা নিয়ে উৎকণ্ঠা তো তাঁর চিরসঙ্গী ছিল। অনুমান করা যায়, সব মিলিয়ে তাঁর এই অক্ষমতা। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী মন্দাকিনীর কিন্তু এই অক্ষমতা নিয়ে কোনও মাথাব্যথা ছিল না। মন্দাকিনী সুবীর চৌধুরিকে তাঁর বিত্তের জন্য বিয়ে করেছিলেন, ভালবেসে নয়। তাই সুবীর চৌধুরি পুরুষ না কিম্পুরুষ তা নিয়ে মন্দাকিনীর কেন মাথা ব্যথা থাকবে? মন্দাকিনীর অন্য এক ভালবাসার মানুষ ছিল, কিন্তু সে প্রসঙ্গে পরে আসব।'

'মন্দাকিনী অবশ্য সুবীর চৌধুরির অক্ষমতাকে অন্যভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। তিনি নানাভাবে সুবীর চৌধুরিকে বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, লালসার বশবর্তী হয়ে দ্বিতীয়বার বিয়ে করাটা সুবীর চৌধুরির ঠিক হয়নি। চৌধুরি বংশে একটা পুরোনো অভিশাপের গল্প ছিল। অভিশাপটা এই যে, চৌধুরিদের কোনও পুরুষ লালসার বশবর্তী হয়ে কিছু করলে তার পৌরুষ চলে যাবে। ইতিহাসটা মন্দাকিনী পড়েছিলেন। এবং এই বংশে যে একটা পুরোনো অভিশাপ আছে সেটার কথা তিনি তাঁর স্বামীকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ পুরোনো অভিশাপের গল্পটা মন্দাকিনী নিপুণভাবে নিজের কাজে লাগিয়েছিলেন। সুবীর চৌধুরি এমনিতে যুক্তিবাদী মানুষ ছিলেন, কিন্তু অবস্থার চাপে পড়ে তিনিও ওই পুরোনো অভিশাপের ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে শুরু করেন।'

'সুবীর চৌধুরির মনে করতেন মন্দাকিনী এক অসহায় দুর্ভাগিনী যাকে তিনি টাকার জোরে তার প্রথম স্বামীর হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছেন। যার জীবনটা তিনি নষ্ট করে দিয়েছেন। এই নিয়ে সুবীর চৌধুরি তীব্র পাপবোধে ভুগতেন। সুবীর চৌধুরির মধ্যে এই পাপবোধ সৃষ্টি করার পেছনে মন্দাকিনীর অভিনয় প্রতিভার একটা বিরাট ভূমিকা ছিল। পাপের প্রায়শ্চিত্য করতে গিয়ে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনি দ্বিতীয় স্ত্রীকে দিয়ে যান। এর ফলে অবশ্য তাঁর প্রথম পক্ষের সন্তানদের তিনি সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করলেন, কিন্তু প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল না।'

'স্বাভাবিক দাম্পত্য ছাড়াও সুবীর চৌধুরি একটা পুত্রসন্তান চেয়েছিলেন যে তাঁর অবর্তমানে চৌধুরি এন্টারপ্রাইজেস-এর হাল ধরতে পারবে। শঙ্খদীপ তাঁকে হতাশ করেছিল। মন্দাকিনীর তখন যা বয়েস আর আজকাল চিকিৎসা শাস্ত্র যতটা এগিয়েছে তাতে মনে হয় তাঁর পক্ষে সন্তানধারণ অসম্ভব ছিল না। সমস্যাটা ছিল সুবীর চৌধুরির দিক থেকে। আমার ধারণা, সুবীর চৌধুরি নিজের পুরুষত্বহীনতার কিছু কিছু চিকিৎসা করাতে শুরু করেছিলেন। কিছু মেডিকাল টেস্টও করিয়েছিলেন। ঠিক এই সময়ে মন্দাকিনী তাঁর স্বামীকে একটা আয়ুর্বেদিক ওষুধের কথা বলেন যেটা নাকি অব্যর্থ। ওষুধের কথা মন্দাকিনী তার একদা পরিচারিকা লীলারানির কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন। তিনি এটাও জানতেন হার্টের অসুখ থাকলে এই ওষুধ খাওয়া আত্মহত্যার সমান। অবশ্য সুবীর চৌধুরিকে তিনি বললেন, এই ওষুধের কোনও পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নেই। সুবীর চৌধুরিকে মন্দাকিনী খুনই করতে চেয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস, কবিরাজি ওষুধ কাজ না করলে অন্য কোনও উপায়ে তাঁকে খুন করা হতো।'

'ওষুধটা জোগাড় করার জন্য আগে চিঠি লিখতে হয়েছিল এবং পরে অবিনাশ কবিরাজের কাছে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে দুজনকে যেতে হয়েছিল। স্বামীকে ভালভাবে পরীক্ষা না করে কবিরাজ মশাই ওষুধ দিতেন না। মন্দাকিনী এবং তার ভালবাসার মানুষ গ্রাম্য স্বামী-স্ত্রী সেজে কবিরাজ মশায়ের কাছে যান। দুজনেই পাকা অভিনেতা, তাই কবিরাজ মশায় তাদের ছদ্মবেশ টের পাননি। মন্দাকিনীদের সঙ্গে ছিল সুবীর চৌধুরির কিছু রিপোর্ট, যার ওপর নাম-ঠিকানা-বয়েস পাল্টানোর জন্য কিছু জালিয়াতি করতে হয়েছিল। মন্দাকিনীর ভালবাসার মানুষটির হার্ট অত্যন্ত শক্তপোক্ত তাই তাকে পরীক্ষা করে ওষুধ দিতে কবিরাজ মশায়ের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয়নি। ওষুধ পাবার পর মন্দাকিনী সেটা সুবীর চৌধুরিকে খেতে দেন। কিছুদিন ধরে এই ওষুধ খাবার পর সুবীর চৌধুরির ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয় এবং তিনি মারা যান। এটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, পরিষ্কার খুন। মন্দাকিনী ও তার দোসর মিলে সুবীর চৌধুরিকে খুন করে।'

## (৩)

সোহিনী দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। নন্দন তার মাথায় হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে। এই ভুমিকায় নন্দনকে আদিত্য আগে দেখেনি। দেখে ভাল লাগল। আদিত্য লক্ষ করল শঙ্খমালা উত্তেজনায় হাতের মুঠি বন্ধ করে রেখেছে। শুদ্ধশীল ব্যানার্জি হতবাক। পিস ইন্টারন্যাশানালের সৌরাশিস ঘোষ মাথা নিচু করে গভীর চিন্তামগ্ন।

আদিত্য আবার শুরু করল। 'শঙ্খমালা ওই ডায়েরিটা পড়ে কিন্তু এত কিছু বুঝতে পারেনি। সে শুধু এইটুকু বুঝেছিল যে মন্দাকিনী সুবীর চৌধুরিকে তার টাকার জন্য বিয়ে করেছিল, কিন্তু তাকে এক দিনের জন্যেও ভালবাসেনি। তার মনে হয়েছিল, দীর্ঘদিনের হার্ট পেশেন্ট সুবীর চৌধুরি আত্মগ্লানিতে ভুগতে ভুগতেই মারা যান। মন্দাকিনী তাঁকে এক ফোঁটা মানসিক শান্তি দিতে পারেনি বা দেবার চেষ্টাও করেনি। বরং ঠান্ডাভাবে একটু একটু করে মরতে দিয়েছে।'

'ডায়েরিটা পড়ে আমি এতটাই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম যে সোজা গিয়ে মামকে চার্জ করি।' শঙ্খমালা বলে উঠল। 'মাম প্রথমে সব ডিনাই করে। আমি এর জন্য প্রিপেয়ার্ড ছিলাম। আই হ্যাড টেকেন আ

ফটোকপি অফ দ্য ডায়েরি উইথ মি। আমি মামকে ফটোকপিটা দেখালাম। বললাম অরিজিনালটা একটা সেফ কাস্টডিতে আছে যেটা মামের রিচের বাইরে। সো গ্র্যাজুয়ালি শি অ্যাডমিটেড এভরিথিং। শি ডিডন্ট হ্যাভ এনি চয়েস। আমার এত রাগ হয়েছিল যে আমি মামকে বলেছিলাম আই উইল মেক দিস পাবলিক। মাম খুব কান্নাকাটি করল। বলল, এটা করলে বিরাট স্ক্যান্ডেল হবে। চৌধুরি বাড়ির সুনাম উইল গো দাউন দ্য ড্রেন। আমি শেষ পর্যন্ত মামের কথা শুনে আর কিছু করিনি। তবে ডায়েরিটা নিয়ে মাঝে মাঝে ভাবতাম। সুব্রতকে দিয়ে উপাধ্যায়ের লেখা বইটা আনিয়ে পড়লাম। জানতে পারলাম চৌধুরিদের ওপর একটা পুরোনো কার্স আছে। মনে হল মাম সেটা ইউজ করেছে। ডায়েরিটা নিয়ে যত ভেবেছি, তত মনে হয়েছে বাবার মৃত্যুর পেছনে মামের একটা ইন্ডিরেক্ট রোল আছে। তবে আয়ুর্বেদিক ওষুধের ইমপ্লিকেশনটা আমি ধরতে পারিনি।'

'ডায়েরিটা আপনি খুবই ইন্টেলিজেন্টলি লুকিয়ে রেখেছেলেন। মন্দাকিনী তার হদিশ পাননি। তাই মন্দাকিনী চিন্তায় ছিলেন আপনি হয়ত কোনদিন সত্যি সত্যি ডায়েরিটা পাবলিক করে দেবেন। তাছাড়া কবিরাজি ওষুধের তাৎপর্যটা তখন ধরতে পারেননি বলে কোনোদিন ধরতে পারবেন না, এমন তো নয়। মন্দাকিনী জানতেন, কবিরাজি ওষুধটার তাৎপর্য যেদিন আপনি বুঝতে পারবেন সেদিন থেকে মন্দাকিনীর জীবনের দাম কানাকড়িও থাকবে না। তাই মন্দাকিনী ঠিক করলেন উধাও হয়ে যেতে হবে। মন্দাকিনী তার ভালবাসার মানুষটির সঙ্গে অন্তর্ধানের প্ল্যান করতে শুরু করলেন। শঙ্খমালা অবশ্য ডায়েরিটার কথা সুব্রত ছাড়াও আর একজনকে বলেছিল।' উত্তরের অপেক্ষায় আদিত্য শঙ্খমালার দিকে তাকিয়ে রইল।

'হ্যাঁ, বলেছিলাম তো। অবশ্যই বলেছিলাম। আই হ্যাড টু শেয়ার ইট উইথ সামওয়ান।' শঙ্খমালা কিছুটা আক্রমণাত্মক সুরে বলল। 'কিছুদিন আগে আমার দাদা শঙ্খদীপ চৌধুরি আমাকে ফোন করে। দাদার হোয়্যার অ্যাবাউটস আমি কিছুই জানতাম না। দাদার সঙ্গে দীর্ঘদিন কোনও যোগাযোগও ছিল না। তাই দাদার ফোন পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। হি সাউন্ডেড মিসারেবল। দাদা বলল, ওর অনেক টাকার দরকার। বাজারে ধার হয়ে গেছে। পাওনাদার পেছনে লেগেছে। টাকা না দিতে পারলে প্রচণ্ড মারধর করবে। একবার মেরেওছে। আমি কি ওকে কিছু টাকা দিতে পারি? দাদার জন্য খুব খারাপ লাগল। আমি কিছু টাকা ওকে দিলাম। একবারে নয়, কয়েকবারে। তারপর একদিন একটু ইমোশানাল হয়ে গিয়ে ওকে ডায়েরিটা দেখালাম। ও ভাল করে পড়তে চায় বলে একটা কপি করে নিল। তারপর কী হলো আমি জানি না।'

'শঙ্খদীপের অনেক টাকার প্রয়োজন ছিল। তাই শেষ অব্দি সে আর নিজেকে সামলাতে না পেরে মন্দাকিনীকে ব্ল্যাকমেল করতে যায়। ব্ল্যাকমেল করে বেশ কিছু টাকাও সে মন্দাকিনীর কাছ থেকে পায়।' আদিত্য বলল। 'শঙ্খদীপের কাছে ডায়েরির যে কপিটা ছিল সেটা পুলিশ ব্যাঙ্কের লকার থেকে উদ্ধার করেছে।'

'কিন্তু শঙ্খদীপকে খুন হল কেন? মন্দাকিনী চৌধুরি তো তখন উধাও হয়ে গেছে। আর তো তাকে ব্ল্যাকমেল করা যাবে না। সে নিশ্চয় শঙ্খদীপকে মারেনি।' সুব্রত প্রশ্ন করল।

'শঙ্খদীপকে খুন করেছিল মাইকেল ও তার দলবল। তার জন্যে তারা মন্দাকিনীর দোসরের কাছ থেকে টাকা পেয়েছিল।' আদিত্য বলল। 'শঙ্খদীপকে খুন করা কেন দরকার হয়ে পড়েছিল, বলছি। মন্দাকিনীর উইল শুনে শঙ্খদীপ কী বলেছিল মনে আছে? বলেছিল, সব ফাঁস করে দেব। সে কী ফাঁস করে দেবার কথা বলেছিল? সম্ভবত সে ডায়েরিটা পাবলিক করে দিয়ে মন্দাকিনীর দুর্নাম করতে চেয়েছিল। কিন্তু ডায়েরিটা পাবলিক হয়ে গেলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ার সম্ভাবনা। জানাজানি হয়ে যেতে পারে মন্দাকিনী আর তার ভালবাসার মানুষ মিলে সুবীর চৌধুরিকে কবিরাজি ওষুধ খাইয়ে মেরেছে।'

'তখন মরগ্যান ব্যানার্জীর মিটিং রুমে কেউ একজন উপস্থিত ছিল যে মন্দাকিনীর দোসরকে খবরটা দিয়েছিল। মরগ্যান ব্যানার্জীর আপিসে যা ঘটবে দোসরকে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেবার দায়িত্ব ছিল তার। দোসর জানত শঙ্খদীপ কতটা ইমোশানালি আনস্টেবল। সে যদি ক্ষেপে গিয়ে সত্যি সত্যি ডায়েরিটা পাবলিক

করে দেয় তাহলে মন্দাকিনীর উইলটাই যে বাতিল হয়ে যাবে। তাই দোসর আর রিস্কে যায়নি। সেই রাত্তিরেই লোক লাগিয়ে শঙ্খদীপকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছিল।'

'তার মানে সেদিন এই অফিসে কেউ একজন ছিল যে জানত মাম মারা যায়নি?' শঙ্খমালা জিজ্ঞেস করল।

'না, মনে হয় না সে জানত মন্দাকিনী বেঁচে আছে। মন্দাকিনীর বেঁচে থাকাটা টপ সিক্রেট, সেটা যত কম লোককে জানানো যায় ততই ভাল। সেই ব্যক্তির কাজ ছিল মরগ্যান ব্যানার্জির আপিসে কী ঘটছে সেটা মন্দাকিনীর দোসরকে জানানো।'

'কিন্তু কে সেই ব্যক্তি?' শঙ্খমালা উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'তার প্রসঙ্গে একটু পরে আসছি' আদিত্য বলল। 'আগে পিস ইন্টারন্যাশানালের প্রসঙ্গে আসি, মন্দাকিনী যাদের সমস্ত টাকাপয়সা দান করে গিয়েছিলেন। পুলিশ খোঁজ নিয়ে দেখেছে এই সংস্থাটির হেড অফিস সুইৎজারল্যান্ডে হলেও এর রেজিস্ট্রেশন মরিশাসে। ক্রিস ও কেলভিনা যাদব বলে মরিশাসের এক দম্পতি এই এনজিওর মালিক। গত ছ'সাত বছর আফ্রিকা এবং এশিয়ার বেশ কিছু দেশে এরা সুনামের সঙ্গে কাজ করছে। অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে এই সংস্থাটি সম্ভ্রান্ত, কোথাও এদের নামে আপত্তিকর কিছু শোনা যায়নি। আমাদের পুলিশ মরিশাসের পুলিশের কাছে ক্রিস ও কেলভিনা যাদব সম্পর্কে বিশদ জানতে চেয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত, এদের সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু মরিশাসের পুলিশ জানাতে পারেনি। শুধু মরিশাসের ন্যাশানাল আই ডি কার্ডে এই দম্পতির যে ছবি দুটো আছে তার প্রতিলিপি তারা পাঠিয়ে দিয়েছে। আমাদের অবশ্য তাতেই কাজ হয়ে গেছে। আমরা জানতে পেরেছি কেলভিনা যাদব এবং মন্দাকিনী চৌধুরি একই ব্যক্তি। ক্রিস যাদবকেও আমরা চিনতে পেরেছি, কিন্তু তার প্রসঙ্গে পরে আসব। আপাতত এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, মন্দাকিনী আর তার দোসর মরিশাসের জাল পাসপোর্ট জোগাড় করেছিল। কাজটা তেমন একটা কঠিন নয়। তারপর সেই জাল পরিচয় দিয়ে তারা মরিশাসে পিস ইন্টারন্যাশানাল প্রতিষ্ঠা করে।'

'দিস ইস আ কন্সপিরেসি। আই প্রোটেস্ট।' সৌরাশিস ঘোষ দাঁড়িয়ে উঠে বলল।

'জাস্ট কিপ কোয়াএট। পরে আপনি কথা বলার অনেক সুযোগ পাবেন। আমরা জানি আপনি কখনও আপনার মরিশাসের বসদের দেখেননি, শুধু টেলিফোনে তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। কিন্তু সেদিন এখানে কী কী কথা হয়েছিল, বিশেষ করে শঙ্খদীপ এখানে কী বলেছিল তার বিশদ বর্ণনা আপনিই তো আপনার বস ক্রিস যাদবকে ফোনে জানিয়েছিলেন। বস্তুত আমাদের ধারণা সেদিন আপনি মোবাইলের অডিও রেকর্ডারটা পকেটের মধ্যে অন করে রেখে এখানকার পুরো কথাবার্তাটাই রেকর্ড করেছিলেন। পরে অডিও ক্লিপটাও ক্রিস যাদবের কাছে পাঠিয়ে দেন। ক্রিস যাদব অবশ্য তখন কলকাতাতেই ছিল, কিন্তু সেটা আপনার জানার কথা নয়। ক্রিস যাদবের হোয়াটসআপ নম্বরে আপনি ফোন করেন, যেটা ছিল তার মরিশাসের নম্বর। আপনার তাই ধারণা হয়েছিল সে মরিশাসেই আছে। মোবাইলটা দীননাথ যোশির জিনিসপত্র থেকে আমরা উদ্ধার করেছি। হোয়াটসআপের কল লিস্ট থেকে আপনার নামটাও পাওয়া গেছে। যাইহোক, সমাদ্দার, একে আপাতত অ্যারেস্ট করে নীচে পুলিশের গাড়িতে বসিয়ে রাখো। নইলে নুইসেন্স ক্রিয়েট করবে।' গৌতম শেষের কথাগুলো একজন অফিসারের উদ্দেশে বলল।

সমাদ্দার ও দুজন কনস্টেবল সৌরাশিসকে নিয়ে চলে যাবার পর গৌতম শুদ্ধশীল ব্যানার্জির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি শুদ্ধশীলবাবু, মর্গ্যান ব্যানার্জি কিন্তু এক্ষেত্রে তার সুনাম অনুযায়ী কাজ করতে পারেনি। পিস ইন্টারন্যাশানালের ব্যাপারে আপনাদের আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।'

শুদ্ধশীল ব্যানার্জি মাথা নিচু করে নিরুত্তর রইলেন। গৌতম আবার বলল, 'আপনার পারসোনাল ইন্টিগ্রিটি নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই, কিন্তু আপনার জুনিয়ার সাত্যকি রায়ের গতিবিধি নিয়ে কিছু সন্দেহ দেখা দিয়েছে। আপনি পিস ইন্টারন্যাশানাল সম্বন্ধে খোঁজখবর নেবার ভার পুরোপুরি সাত্যকিবাবুর ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। সাত্যকিবাবু পিস ইন্টারন্যাশানালকে ক্লিন চিট দেবার পর আপনি আর ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাননি। আপনি আপনার জুনিয়ারকে একটু বেশি বিশ্বাস করেছিলেন, এটাই আপনার দোষ। আপনি যদি

আর একটু খতিয়ে দেখতেন তাহলে পিস ইন্টারন্যাশানালের মালিকদের সম্বন্ধে জানতে পারতেন। আর সেটা জানলেই ওদের আসল পরিচয়টা বেরিয়ে পড়ত।'

শুদ্ধশীল ব্যানার্জির চোখদু'টো ক্রমশই বিস্ফারিত হচ্ছিল। গৌতম বলল, 'আমাদের সন্দেহ, মন্দাকিনী সাত্যকি রায়কে মোটা টাকা ঘুষ দিয়েছিল যাতে সে পিস ইন্টারন্যাশানালকে ক্লিন চিট দেয়। এটা আমরা এখনও সরাসরি প্রমাণ করতে পারিনি, তবে পুলিশ ইনভেস্টিগেট করে দেখেছে সাত্যকিবাবুর কয়েকটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট হঠাৎ অসম্ভব ফুলেফেঁপে উঠেছে, আপাতদৃষ্টিতে যার কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা ব্যাপারটা আরও ভাল করে খতিয়ে দেখছি।'

সাত্যকি রায় কী একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেল। আদিত্য বলল, 'মন্দাকিনী জানত আসল ডায়েরিটা শঙ্খমালার কাছে রয়ে গেছে। কিন্তু শঙ্খমালা তার দাদার মতো মেনটালি আনস্টেবল নয়, হঠাৎ করে ডায়েরির কথা সে মিডিয়াকে বলবে না, পরিবারের সুনাম রক্ষা করাটা সে নিজের দায়িত্ব মনে করবে। তাই হাতে কিছুটা সময় আছে। কিন্তু ভবিষ্যতে সে যদি সুবীর চৌধুরির মৃত্যুর রহস্যটা আবিষ্কার করে ফেলে তাহলে কী হবে বলা যায় না। তাই আমার মনে হয়, মন্দাকিনী আর তার দোসর আসল ডায়েরিটা পাবার চেষ্টা করছিল। আর ঠিক এই কাজটা করার জন্যেই তারা কলকাতার কাছে কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বিদেশে পালিয়ে যায়নি। ডায়েরি পেয়ে গেলে তারা শঙ্খমালা আর সুব্রতকেও পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিত।'

'একটা জিনিস বুঝতে পারছি না। যদি মাম আমাদের খুন করারই প্ল্যান করবে তাহলে নিজে খুন হবার ভান করে গা ঢাকা দিল কেন? আমাদের খুন করে দিব্যি এখানেই তো থাকতে পারত।' শঙ্খমালা জিজ্ঞেস করল।

'খুবই পারটিনেন্ট প্রশ্ন। উত্তরটা দিচ্ছি। ধরুন, মন্দাকিনীরা সেটাই করল। এমন তো হতেই পারত আপনি কাউকে ইন্সট্রাকশান দিয়ে গিয়েছেন আপনার কিছু হলে ডায়েরিটা যেন মিডিয়ার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। সেরকম ঘটলে মন্দাকিনীরা সরাসরি বিপদে পড়ে যেত। তাই ডায়েরি হাতে পাবার আগে আপনাদের খুন করার প্রশ্নই উঠছে না। তার থেকে পালিয়ে যাওয়া ভাল। এমনভাবে পালিয়ে যাওয়া যাতে মন্দাকিনীকে আর কেউ খুঁজবে না, কারণ সকলে জানবে সে মারা গেছে। অর্থাৎ ডায়েরির অস্তিত্বটা জানার পর থেকে মন্দাকিনী ও তার দোসর ঠিক করেছিল এবার তাদের পালাতেই হবে। নাহলে তারা খুনের দায়ে পড়ে যেতে পারে। আজ না হলেও হয়তো ভবিষ্যতে কখনও। তারা পালিয়ে যাবার পর যদি সব কথা জানাজানি হয়েও যায় তাহলে বড়জোর মন্দাকিনীর উইলটা বাতিল হয়ে গিয়ে তাদের একটা আর্থিক ক্ষতি হবে। কিন্তু পুলিশ তাদের ধরার চেষ্টাও করবে না, কারণ পুলিশের কাছে তারা মৃত। ইতিমধ্যে কোম্পানি থেকে মন্দাকিনী যে টাকা সরিয়ে ফেলেছে তা দিয়ে তাদের সারা জীবন বিদেশে হেসে খেলে কেটে যাবে। সব থেকে বড় কথা, এখানে থাকলে মন্দাকিনী আর তার ভালবাসার মানুষ একমাত্র লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে চুরিয়ে পরস্পরের কাছে আসতে পারত। খোলাখুলিভাবে নয়। এইভাবে মেলামেশা করতে করতে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। একদিন না একদিন এখান থেকে তাদের পালিয়ে যেতেই হত। কিন্তু এমনভাবে পালাতে হত যাতে সম্পত্তিটা হাতছাড়া না হয়।'

'মন্দাকিনী কীভাবে আসল ডায়েরিটা পাবার চেষ্টা করছিল?' সুব্রত নিরীহভাবে জিজ্ঞেস করল।

'সেটা তো আপনার থেকে ভালো আর কেউ জনে না, সুব্রতবাবু।' আদিত্য বলল, 'আমাদের কাছে খবর আছে, এক ব্যক্তি, সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে, আপনাকে অ্যাপ্রোচ করেছিল। বলেছিল, আসল ডায়েরিটা তার হাতে তুলে দিলে সে একটা বিপুল অঙ্কের টাকা আপনাকে দেবে। আপনি তার প্রস্তাবে রাজিও হয়েছিলেন। শুধু আপনার স্ত্রী ডায়েরিটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন সেটা আপনি খুঁজে বার করতে পারেননি। আপনার স্ত্রী আপনাকে ভালই চিনতেন তাই ডায়েরিটা তিনি কোথায় রেখেছেন সেটা আপনাকে বলেননি। আপনি জানতেন না পুলিশ আপনার প্রত্যেকটি গতিবিধির ওপর নজর রাখছে। যাইহোক, সেই ভুয়ো সাংবাদিক

পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। সে বলেছে, বাবরি চুল, কালো রোদ চশমা পরা একটি লোকের হয়ে সে কাজ করছিল। আপনি বুঝতে পারেননি, ডায়েরি একবার হাত থেকে বেরিয়ে গেলে আপনার এবং আপনার স্ত্রীর জীবনের আর কোনও দাম থাকত না।'

সুব্রত সেন কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'হ্যাঁ, আমি লোভে পড়ে গিয়েছিলাম। টাকার অঙ্কটা অবিশ্বাস্য রকমের বেশি ছিল। পরে আমি সব কথা মালার কাছে স্বীকার করেছি। মালা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে।'

কিছুক্ষণ থেমে আদিত্য বলতে লাগল, 'মন্দাকিনীর ছকটা নিশ্চয় আপনাদের কাছে এখন পরিষ্কার হয়েছে। প্রথমে মন্দাকিনী দেখাল তাকে খুন করার চেষ্টা হচ্ছে। তারপর সেই অজুহাতে সে একটা উইল করল যাতে বলা হল তার যদি অপঘাতে মৃত্যু হয় তাহলে সব সম্পত্তি পিস ইন্টারন্যাশানালের হাতে চলে যাবে। এর কিছুদিন পরে একটা সাজানো অ্যাক্সিডেন্টে দেখানো হল মন্দাকিনী মারা গেছে। এর জন্য তার দোসর কাছাকাছি গ্রাম থেকে একটা মৃতদেহ যোগাড় করে সেই মৃতদেহ সুদ্ধু গাড়ি ধাক্কা দিয়ে পাহাড়ের খাদে ফেলে দিল এবং গ্রামের মোড়লকে কিছু টাকাপয়সা খাইয়ে পুলিশ আসার আগেই মৃতদেহ সৎকার করে ফেলল। মন্দাকিনীর ব্যবহার করা কিছু জিনিস বডি আইডেন্টিফিকেশনের জন্য রেখে দেওয়া হল। পিস ইন্টারন্যাশানালের হাতে চৌধুরিদের আয় চলে গেলে সেটা তো মন্দাকিনীর হাতেই আবার গিয়ে পড়া।'

'মন্দাকিনীর সাজানো মৃত্যুর পর দুটো প্রশ্নের আমি উত্তর খুঁজছিলাম। এক, মন্দাকিনীর হাতের অত বড় হিরের আংটিটা গ্রামবাসীদের কেউ চুরি করে নেবার চেষ্টা করল না কেন? দুই, মন্দাকিনী না হয় তার সৎ ছেলেমেয়েদের উইলে বঞ্চিত করল। কিন্তু নিজের মেয়ের প্রতিও কি তার কোনও টান ছিল না? প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা সহজেই পাওয়া যাবে যদি ধরে নিই মন্দাকিনীর অ্যাকসিডেন্টটা সাজানো। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর পেলাম কিছুদিন পর। মন্দাকিনী নিজের মেয়ের জন্য অন্যরকম ব্যবস্থা করে গিয়েছিল। মরিশাসের আর একটি ট্রাস্টের মাধ্যমে সোহিনীকে একটা মোটা স্কলারশিপ পাইয়ে দিয়েছিল যাতে শুধু তার লেখাপড়া নয়, জীবনযাপনটাও আরামে চলে যায়। বস্তুত, বিদেশ যাবার আগের কয়েক মাসও যাতে মেয়ের কোনও অসুবিধে না হয় তার জন্য অন্তর্ধানের আগে মন্দাকিনী মেয়েকে একটা মোটা টাকা দিয়ে গিয়েছিল। মন্দাকিনী এটাও জানত, নন্দনের কোনও ব্যবস্থা না হলে সোহিনী কলকাতা ছেড়ে নড়বে না। তাই সে পুনের সঙ্গীতাশ্রমে একটা মোটা টাকা ডোনেশন দিয়ে নন্দনের জন্যেও একটা স্কলারশিপের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। এর ফলে নন্দনের থেকে সোহিনীকে আলাদা করারও ব্যবস্থা হল। নন্দন চক্রবর্তীকে মন্দাকিনী দুচক্ষে দেখতে পারত না।'

'এসবের কি কোনও প্রমাণ আছে?' শুদ্ধশীল ব্যানার্জি জিজ্ঞেস করলেন।

'কিছু সারকমস্টানশিয়াল এভিডেন্স পাওয়া গেছে। যেমন পুলিশ খোঁজ নিয়ে জেনেছে মন্দাকিনী পুনের ওই সঙ্গীত আশ্রমটিকে একটা মোটা টাকা ডোনেশন দিয়েছিলেন এই শর্তে যে তারা নন্দনকে ওই অফারটা দেবে। পুলিশ এটাও জানতে পেরেছে যে মরিশাসের সেই ট্রাস্টটি ম্যানেজ করে পিস ইন্টারন্যাশানাল। সব থেকে বড় কথা, কোনও চ্যারিটেবল ট্রাস্ট কাউকে পিএইচডি করার জন্য এত টাকা স্কলারশিপ দিচ্ছে এটা ভীষণ আনইউসুয়াল তাই সন্দেহজনক।'

আদিত্য থামল। নন্দন সোহিনীকে কী যেন ফিসফিস করে বলছে। শিশির চ্যাটার্জি ঘড়ি দেখছেন। একটানা বসে থাকার ফলে অনেকেই উসখুস করছে। শুধু মার্থা একেবারে স্থির হয়ে বসে আছে।

আদিত্য বলল, দু'একটা জিনিস পরে আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে। শঙ্খমালা মন্দাকিনী সম্পর্কে বলেছিল 'কুল অ্যান্ড ক্যালকুলেটিং' কারণ সে তার কিছুদিন আগে সুবীর চৌধুরির ডায়েরিটা দেখেছে। শঙ্খদীপ তার বাবার সম্বন্ধে বলেছিল 'ড্যামনা'। এই অশ্লীল শব্দটা ব্যবহার করার জন্য আমাকে মাফ করবেন। আমি ডিক্সনারিতে দেখেছি শব্দটার একটা অর্থ 'পুরুষত্বহীন'। তার মানে, শঙ্খদীপকে আমি যখন প্রথম দেখি, তখন সে ডায়েরিটা পড়েছে।'

আদিত্য বলে চলল, 'এখনও গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া বাকি আছে। এক, মন্দাকিনীর ভালবাসার মানুষটির পরিচয় কী যার সঙ্গে বসে সে এত কিছু প্ল্যান করেছিল? তাকে কি আমরা চিনি? দুই, মন্দাকিনী এবং তার ড্রাইভার কাম বডিগার্ড দীননাথ যোশিকে কে খুন করল? কেন খুন করল? আমি প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা আগে দিচ্ছি।'

ঘরের চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে প্রায় ঘোষণা করার ভঙ্গিতে আদিত্য বলল, 'মন্দাকিনীর ভালবাসার মানুষ ও পাপ কাজের দোসর ছিল তার প্রথম স্বামী নীলাঞ্জন মৈত্র। নীলাঞ্জনের সঙ্গে প্ল্যান করেই মন্দাকিনী সুবীর চৌধুরিকে প্রেমের জালে ফাঁসায় এবং পরে তাকে বিয়ে করে। আমার ধারণা, সব প্ল্যান নীলাঞ্জনের, মন্দাকিনী সেইসব প্ল্যান এক্সিকিউট করেছিল মাত্র। কবিরাজ অবিনাশ সেনের রেজিস্টারে বিজয় মাকাল সই করেছিল। আমাদের হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্ট মত দিয়েছেন সেই হাতের লেখা নীলাঞ্জন মৈত্রের।'

আদিত্য দেখল সোহিনী অবাক হতেও ভুলে গেছে। ঘরে অখণ্ড নিস্তব্ধতা।

আদিত্য বলতে লাগল, 'নীলাঞ্জন-মন্দাকিনীর মধ্যে একটা আশ্চর্য রকমের প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল, যে ভালবাসা শেষদিন পর্যন্ত একফোঁটাও টোল খায়নি। রান্নার মাসি যখন শুনেছিল নীলাঞ্জনের সঙ্গে মন্দাকিনীর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে তখন সে সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিল। অবাক হবারই কথা। এত গভীর প্রেম সচরাচর দেখা যায় না। সেই প্রেম ভেঙে গেল? সোহিনীও তার বাবা-মার বিচ্ছেদের ব্যাপারে কিছুই টের পায়নি। ঝগড়াঝাঁটি নয়, মনান্তর নয়, হঠাৎ যেন একদিন প্ল্যান করে তারা আলাদা হয়ে গেল।

'মন্দাকিনীর দ্বিতীয় বিয়ের পর কিছুদিন নীলাঞ্জনকে একা একা থাকতে হয়েছিল। তারপর সুবীর চৌধুরি মারা যাবার পর নীলাঞ্জন দীননাথ ড্রাইভার সেজে মন্দাকিনীর সঙ্গে সঙ্গে থাকত। আবার মন্দাকিনী যখন কেলভিনা যাদব সেজে মরিশাসে কী অন্য কোথাও পিস ইন্টারন্যাশানালের কাজে যেত, তখন ক্রিস যাদব সেজে নীলাঞ্জন তার সঙ্গ নিত। মন্দাকিনীকে ছেড়ে বেশি দিন থাকা নীলাঞ্জনের পক্ষে সম্ভব ছিল না।'

'দীননাথ যোশি বলে একজন সত্যিকারের লোক অবশ্য ছিল। চরিত্রহীনা স্ত্রীর ওপর অভিমান করে সে সম্ভবত পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। তার বডি আর কখনও পাওয়া যায়নি। নীলাঞ্জন তাকে চিনত। কী করে আসল দীননাথের সঙ্গে নীলাঞ্জনের পরিচয় হয়েছিল সেটা অনুমানসাপেক্ষ, এবং জানাটা জরুরিও নয়। এমন হতেই পারে নীলাঞ্জনই দীননাথকে পাহাড় থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। সে যাইহোক, নীলাঞ্জন মাথা কামিয়ে দীননাথের পরিচয় গ্রহণ করল। দীননাথ বেঁচে আছে প্রমাণ করার জন্য সে দীননাথের বউকে নিয়মিত টাকা পাঠাত। মাথা কামিয়ে টিকি রাখলে মানুষের চেহারা আশ্চর্য রকম পালটে যায়। নীলাঞ্জন তারই সুযোগ নিয়েছিল। তাছাড়া নাটকের লোক বলে ছদ্মবেশ ধরা তার সহজাত ছিল। মাথা কামিয়েও যে ছদ্মবেশ নেওয়া যায় সেটা গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের নিচে এক ইসকনের মাথা-কামানো সাহেবকে দেখে আমার প্রথম মনে হয়েছিল।'

'একটা ব্যাপারে অবশ্য দীননাথবেশী নীলাঞ্জনকে সাবধান থাকতে হয়েছিল। যতই ছদ্মবেশ ধরুক, তাকে দেখলে তার মেয়ে সোহিনী ঠিকই চিনতে পারত। তাই সে কলকাতায় মন্দাকিনীর গাড়ি চালাত না। পাছে সোহিনীর সামনে পড়ে যায়। তাই সোহিনী বলেছিল, দীননাথকে সে কখনও দেখেনি। কলকাতায় এলে নীলাঞ্জন নীলাঞ্জন মৈত্র সেজেই থাকত। তার মধ্যে যে ক্রিমিনালটা বাস করত, তাকে লুকিয়ে রাখার জন্য নীলাঞ্জন রাগী-রাগী ভাব করে একটা অতি বাম ইন্টেলেকচুয়ালের খোলস গায়ে জড়িয়ে রাখত। তাকে আমি একবারই দেখেছিলাম। মনে হয়েছিল যেন ঠিক বাস্তব নয়, যেন ছাঁচে ফেলা কোনও নাটক, উপন্যাস বা সিনেমার চরিত্র।

'মন্দাকিনী আর নীলাঞ্জন পরস্পরকে ভালবেসে যদি সাধারণ একটা জীবনে তুষ্ট থাকতে পারত, তাহলে তারা সত্যিই সুখী হতে পারত। বড়লোক হবার লোভ তাদের, এবং শুধু তাদের নয়, তাদের ছাড়াও আরও কয়েকটা জীবনকে অকালে ঝরিয়ে দিল। এটা একটা ভয়ানক ট্র্যাজেডি। কিন্তু বিধাতার ন্যায়দণ্ডও কখনো

কখনো কাজ করে। নাহলে তারা হয়ত পৃথিবীর এমন কোথাও হারিয়ে যেত যেখান থেকে তাদের খুঁজে বার করাটা সম্ভব হত না।' আদিত্য চুপ করল।

'কিন্তু মন্দাকিনী আর নীলাঞ্জনকে খুন করল কে?' শিশির চ্যাটার্জি একটু কুণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'ও �হ্যাঁ, সেটাই তো বলা হয়নি। মন্দাকিনী আর নীলাঞ্জনকে যে খুন করেছে সে এই ঘরের মধ্যেই আছে।' বলতে বলতে আদিত্য মার্থার দিকে তাকাল, 'নীলাঞ্জন আর মন্দাকিনীকে খুন করেছে মার্থা স্যাভিও।'

'হোয়াই শুড আই কিল দেম? আই ডিড নট ইভন নো দেম'। মার্থা তারস্বরে প্রতিবাদ করে উঠল।

'ইউ কিলড দেম টু অ্যাভেঞ্জ ইয়োর সুইটহার্টস মার্ডার।' আদিত্য ঠান্ডা গলায় বলল। 'মার্থা জানত শঙ্খদীপ মন্দাকিনীকে ব্ল্যাকমেল করছে। যখন শঙ্খদীপ খুন হল মার্থার মনে হল এর পেছনে মন্দাকিনীর হাত আছে। তার মানে মন্দাকিনী মরেনি। এর পরের ঘটনাগুলো আমি অনুমান করছি, কিছু কিছু ভুল থাকতেই পারে। শঙ্খদীপ মার্থাকে একটা ফোন নম্বর দিয়েছিল, যে নম্বরে ফোন করলে মন্দাকিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। মার্থা সেই নম্বরে ফোন করেছিল এবং খুব সম্ভবত নীলাঞ্জন ফোনটা ধরেছিল। মার্থা নীলাঞ্জনকে বলল তার কাছে ডায়েরির একটা কপি আছে যেটা তাকে শঙ্খদীপ দিয়ে গেছে। ভাল দাম পেলে সে সেটা মন্দাকিনীর হাতে তুলে দিতে রাজি আছে। মনের মতো দাম না পেলে অবশ্য সে ডায়েরিটা পাবলিক করে দেবে। বলাই বাহুল্য মার্থা মিথ্যে কথা বলেছিল। ডায়েরির কোনও কপি মার্থার কাছে ছিল না। কপি ছিল ব্যাঙ্কের লকারে, যার চাবি আমরা সিজ করে নিয়েছিলাম। আমার ধারণা সে ইনসিস্ট করেছিল মন্দাকিনীর হাতেই ডায়েরিটা তুলে দেবে। আসলে সে মন্দাকিনীকে সামনা সামনি দেখতে চেয়েছিল। যাইহোক, মন্দাকিনী মার্থাকে নরেন্দ্রপুরের রিসর্টে আসতে বলে। হয়ত নীলাঞ্জনও ঠিক করেছিল ডায়েরির কপিটা পেয়ে গেলে মার্থাকে মেরে ফেলবে, কিন্তু রিসর্টে নয়, নিজের হাতেও নয়। অন্য কোথাও অন্য কাউকে দিয়ে। যেমনভাবে শঙ্খদীপকে মারা হয়েছিল।'

'এদিকে মার্থাও ঠিক করে গিয়েছিল সে মন্দাকিনীকে দেখতে পেলে একেবারে প্রাণে মেরে ফেলবে। নাহলে শঙ্খদীপের আত্মা শান্তি পাবে না। সে এই কাজের জন্য একটা পিস্তলও ভাড়া করেছিল। পিস্তলে সাইলেন্সার লাগানো ছিল। কারণ মার্থা তো আর আগে থেকে জানতো না সেই রাত্তিরে তুমুল বৃষ্টি নামবে।'

'মার্থা কি পিস্তল ছুঁড়তে জানত?' শঙ্খমালা জিজ্ঞেস করল।

'জানত। মার্থার বাবা এক সময় পুলিশে কাজ করত। দুর্দান্ত শুটার ছিল। একেবারে যাকে বলে ক্র্যাকশট। পুলিশদের স্পোর্টস-এ অনেকবার প্রাইজ পেয়েছে। মার্থার বাবাই মার্থা আর তার বোনকে আগ্নেয়াস্ত্র চালাতে শিখিয়েছিল। পরে দুর্নীতির জন্য মার্থার বাবার চাকরি যায়। সে তখন অতিরিক্ত মদ্যপান শুরু করে। মার্থার মা তার বাবা এবং তাদের দু'বোনকে ছেড়ে আরেক জনের সঙ্গে চলে যায়। ফলে পরিবারটা একেবারে ভেসে গেল। মার্থার বোনের ভাগ্যটা অবশ্য ভাল, তার একটা ঠিকঠাক বিয়ে হয়েছে, একটা পরিবার আছে। কিন্তু মার্থার ভাগ্যটা ততটা ভাল নয়। তার একটা খারাপ বিয়ে হয়েছিল, বিয়েটা ভেঙে যায় এবং শেষ পর্যন্ত তাকে নাইটক্লাবে নর্তকীর কাজ নিতে হয়। পুলিস খোঁজখবর করে এসব জানতে পেরেছে।' গৌতম বলল।

আদিত্য বলল, 'মার্থার মধ্যে যে পর্তুগিজ রক্তটা আছে সেটা অতিশয় প্রতিশোধ প্রবণ। তাছাড়া শঙ্খদীপকে সে পাগলের মতো ভালবাসত। তাই শঙ্খদীপের হত্যাকারীকে সে ক্ষমা করতে পারেনি। আমি ঠিক বলছি মার্থা?'

মার্থা কোনও কথা বলল না। আদিত্য আবার বলতে শুরু করল। 'রিসর্টের ভেতরে ঠিক কী হয়েছিল আমার পক্ষে বলা শক্ত। সবটাই অনুমান করছি। রিসর্টের মেন গেটে পৌঁছে মার্থা নীলাঞ্জনকে ফোন করে বলেছিল সে এসে গেছে। নীলাঞ্জন নিজে গিয়ে দরজা খুলে মার্থাকে রিসর্টের ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়েছিল, তাকে মন্দাকিনীর ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। ডায়েরি নিয়ে টাকা দেওয়ার ব্যাপারটা, বলাই বাহুল্য সে খোলা

যায়গায় করতে চায়নি। সেই সময় প্রবল বৃষ্টি পড়ছিল, তাই গেটে কোনও সিকিউরিটি ছিল না। ফলে কেউ তাদের দেখতে পায়নি।'

'মার্থা যে কতটা ক্ষিপ্র হতে পারে আমি সেটা নিজের চোখে দেখেছি। আমার সামনে শঙ্খদীপকে সে যখন আঘাত করেছিল, শঙ্খদীপ নড়ার সময় পায়নি। আমার মনে হয় নীলাঞ্জনকেও মার্থা নড়ার সুযোগ দেয়নি। তবে মার্থা যেগুলি করতে পারে এটা নীলাঞ্জনের কল্পনাতেও ছিল না। হি ওয়াজ টেকেন বাই সারপ্রাইজ। তাই সঙ্গে বন্দুক থাকা সত্ত্বেও সে সেটা বার করার সুযোগ পায়নি। মার্থা ধরে নিয়েছিল নীলাঞ্জন মন্দাকিনীর বডিগার্ড। তাই তাকে আগে মারতে হবে। মনে হয় নীলাঞ্জনের আর্তনাদ শুনে বেডরুম থেকে মন্দাকিনী বেরিয়ে আসে। মার্থা তাকেও তখন গুলি করে। বন্দুকে সাইলেন্সার লাগানো ছিল। তার ওপর বৃষ্টির শব্দ। তাই গুলির শব্দ বাইরের কেউ শুনতে পায়নি। অত বৃষ্টির মধ্যে তখনও সিকিউরিটি গার্ড মেন গেটে ছিল না। মার্থা সহজেই দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল।'

'ইজ ইট অল ইয়োর ইম্যাজিনেশন অর ডু ইউ হ্যাভ এনি প্রুফ?' মার্থা চিবিয়ে চিবিয়ে বলল।

'আমার কাছে দুটো প্রমাণ আছে। এক, যার কাছ থেকে তুমি পিস্তলটা ভাড়া করেছিলে সে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে স্বীকার করেছে যে সে তোমাকে একদিনের জন্য একটা সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল ভাড়া দিয়েছিল। দুই, তোমার বাড়ি সার্চ করে একটা কালো ব্যাগ পাওয়া গেছে যার গায়ে কয়েকটা ফুটো রয়েছে। ব্যাগের ভেতরে তোমার বন্দুকটা ছিল। ডায়েরির কপি বার করছ এই অছিলায় তুমি ব্যাগের ভেতর হাত ঢোকাও এবং প্রথম কয়েকটা গুলি ব্যাগের ভেতর থেকেই কর। তাছাড়া মৃতদেহগুলোর শরীরে যে গুলিগুলো পাওয়া গেছে তার সঙ্গে তোমার ভাড়া নেওয়া বন্দুকের ক্যালিবার মিলে যাচ্ছে।'

মার্থা আর বলার মতো কথা খুঁজে পেল না। তিনজন মহিলা পুলিশ তাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মার্থা বাধা দিল না।

শঙ্খমালা বলল, আচ্ছা, ড্রাইভার দীননাথ যোশিই যে নীলাঞ্জন মৈত্র এটা কী করে বোঝা গেল?'

আদিত্যই উত্তরটা দিল। 'মন্দাকিনীর মৃতদেহের সঙ্গে কয়েকটা পরচুলা পাওয়া গেছিল। তার মধ্যে একটা পুরুষদের দাড়ি এবং পরচুলাও ছিল। ভাগ্যক্রমে বডি তখনও মর্গে। মিউটিলেটেড মুখটা আমাদের সার্জন একটু মেরামত করলেন। তারপর আমরা নেড়া মাথার ওপরে উইগটা আর গালে দাড়িটা চাপিয়ে দেখলাম। আমার মনে হল এটা নীলাঞ্জন। সেই পরচুলা ও দাড়িসুদ্ধ বডি আরও দুজনকে দিয়ে আইডেন্টিফাই করালাম। তার মধ্যে একজন আমার পুরোনো বন্ধু স্যমন্তক, আর একজন স্যমন্তকদের নাটকের দলের সুদীপ্ত। দুজনেই নীলাঞ্জনকে চিনত। দুজনেই বডিটা নীলাঞ্জনের বডি বলে আইডেন্টিফাই করল। তাছাড়া নীলাঞ্জন হাই পাওয়ারের চশমা পরত। আমরা দেখেছি, মৃত্যুর সময় দীননাথের চোখে হাই পাওয়ারের কনট্যাক্ট লেন্স লাগানো ছিল। সব থেকে বড় কথা, দীননাথের জিনিসপত্রের সঙ্গে নীলাঞ্জন মৈত্রের প্যান কার্ড, আধার কার্ড, ব্যাঙ্কের পাশবই সবই পাওয়া গেছে। একজোড়া চশমাও পাওয়া গেছে যেটা নীলাঞ্জন ব্যবহার করত।'

'আর একটা একটা প্রশ্ন আছে। নীলাঞ্জন বাবরি চুল লাগিয়ে আপনার অফিসে আপনাকে খোঁজ করতে গিয়েছিল কেন?' শঙ্খমালা জিজ্ঞেস করল।

'এই প্রশ্নটা আমিও নিজেকে করেছি। আমার মনে হয় এর উত্তর পেতে গেলে আর একটু পিছিয়ে গিয়ে অন্য একটা প্রশ্ন করতে হবে। এত লোক থাকতে মন্দাকিনী তার গোয়েন্দা হিসেবে আমাকে কেন নিয়োগ করল? সে তো চাইলে দেশের শ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভ এজেন্সি থেকে শ্রেষ্ঠতম কাউকে নিয়োগ করতে পারত। আসলে, মন্দাকিনী এমন একজনকে নিয়োগ করতে চেয়েছিল যে গোয়েন্দা হিসেবে অতি নিম্নমানের। তার ভয় ছিল, ভালো কেউ তার কেসটা নিলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে যেতে পারে। তার দরকার ছিল একজন হাবাগোবা গোয়েন্দার যে আর কিছু করবে না, শুধু তার মনের মতো একটা রিপোর্ট দেবে। আমার এবং আমার পরিবারের কথা মন্দাকিনী জানত। সে ধরে নিয়েছিল, জমিদারের ছেলে অবস্থা গতিকে গোয়েন্দা হয়েছে, এ কখনও ভাল গোয়েন্দা হতেই পারে না। অর্থাৎ মন্দাকিনীর বিবেচনায় আমি ছিলাম একজন

অলস, হাঁদা গঙ্গারাম ডিটেকটিভ। তাই আমাকে নিয়োগ করা হল। কিন্তু আরও নিশ্চিত হবার জন্য নীলাঞ্জন আমার আপিসে দেখতে এল আমার আদৌ মক্কেল-টক্কেল হয় কিনা। সত্যিই আমার মক্কেল-টক্কেল কম, তার ওপর আমার প্রতিবেশি আগরওয়াল, যার সঙ্গে আমার কদিন আগেই কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে, নীলাঞ্জনকে আশ্বস্ত করল, আমি একদম বেকার কা আদমি। আমার মক্কেল-টক্কেল কিছুই হয় না। নীলাঞ্জন যেন অন্য কারো কাছে যায়। নীলাঞ্জন খুশি হয়ে চলে গেল।'

'মন্দাকিনীর মতো নীলাঞ্জনও ধরে নিয়েছিল তাদের নিয়োগ করা গোয়েন্দাটি একটি ঢ্যাঁড়স। তাই সে কল্পনাও করেনি তার গুন্ডারা আমার হাতে মার খেতে পারে এবং পরে পুলিশের হাতে ধরা পড়তে পারে। এই সম্ভবনাগুলো মাথায় থাকলে সে হয়ত যে ছদ্মবেশে আমার আপিসে এসেছিল সেই একই ছদ্মবেশে গুন্ডাদের সামনে আসত না। আর একটু কম কনফিডেন্ট হলে সে হয়তো সম্পূর্ণ অন্য একটা ছদ্মবেশে সুব্রতবাবুর সঙ্গে নেগোশিয়েট করার লোকটিকে নিয়োগ করত। যাই হোক সব মানুষই তো ভুল করে। আর কোনও প্রশ্ন আছে?'

'একটা প্রশ্ন আছে, ' শঙ্খমালা বলল। 'মন্দাকিনী চৌধুরি তো একজন সেলিব্রিটি। তার মুখটা অনেক বাঙালিরই পরিচিত। সেক্ষেত্রে সে মরিশাসে থাকুক আর যেখানেই থাকুক, কোনও না কোনও বাঙালির তাকে চিনে ফেলার একটা সম্ভাবনা কিন্তু থেকেই যাচ্ছিল।'

'সেই সম্ভাবনাটা তো গত সাত বছর ধরে, অর্থাৎ যবে থেকে পিস ইন্টারন্যাশানাল তৈরি হয়েছে তবে থেকেই, ছিল। ফলে মন্দাকিনীকে তার আসল চেহারাটা খানিকটা বদলাতে হয়েছিল। এজন্য তাকে একটা উইগ পরতে হয়েছিল। নকল দাঁতেরও সাহায্য নিতে হয়েছিল। মরিশাসের পাশপোর্ট এবং ন্যাশানাল আই ডি কার্ডে সেই পরচুলা এবং নকল দাঁত পরা ছবিটাই আছে। ক্যাজুয়ালি দেখলে বোঝা যাবে না ওটা মন্দাকিনী। কিন্তু ভাল করে খুঁটিয়ে দেখলে অবশ্যই বোঝা যাবে। আর প্রশ্ন?'

'আর প্রশ্ন নেই, তবে বক্তব্য আছে। ধন্য আদিত্য মজুমদার, ধন্য তোমার বুদ্ধি।' গৌতম গলা তুলে বলল।

(৪)

সোহিনী তার বাড়িতে নেমন্তন্ন করেছে। প্রথমে নন্দন গান গাইবে, তারপর ডিনার। অমিতাভ-রত্না তো যাবেই, গৌতমদেরও নেমন্তন্ন। গৌতম অবশ্য বলেছে অ্যা অ্যা গান শেষ হলে তারপর যাবে। নন্দনের গানের ভক্ত আরো কয়েকজনের আসার কথা। সোহিনী আদিত্যকে একটু আগে আগে পৌঁছতে বলেছিল। আদিত্য যখন পৌঁছল তখনও কেউ আসেনি। সোহিনী একা বসার ঘরে বসে আছে। নন্দন পাশের ঘরে তানপুরা ছাড়ছে।

'শুদ্ধশীল ব্যানার্জি বললেন, চৌধুরি এন্টারপ্রাইজেসের মালিকানা রত্নাবলী আর আমার মধ্যে সমান ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। শঙ্খদীপ যে উইলটা করেছিল সেটা আইনসিদ্ধ নয়, কারণ তাতে দুজন সাক্ষীর সই নেই, মাত্র একজনের আছে। তার ওপর মার্থা এখন জেলে। শঙ্খদীপের অংশটা তাই বোধহয় আমরাই পাব। বিরাট দায়িত্ব। এত বড় একটা ব্যবসা আমাদের চালাতে হবে। আমার আর কলম্বিয়া যাওয়া হল না।' সোহিনী বলল।

'ভাল হল। সুবীর চৌধুরির পরে আবার কম্পানির দায়িত্ব যোগ্য হাতে পড়ল। দুই বোন মিলে কম্পানি চালাবেন। এর থেকে ভাল আর কী হতে পারে? তাছাড়া আপনি কলকাতায় থেকে যাওয়া মানে নন্দনও পুনে যাচ্ছে না। অমিতাভ বলছিল এটা নন্দনের গানের পক্ষে খুব ভাল হবে। অমিতাভর মতে পুনে গেলে নন্দনের গানের খুব ক্ষতি হয়ে যেত।'

সোহিনী আদিত্যকে একটা সিগারেট দিয়ে নিজে একটা সিগারেট ধরাল। কিছুটা ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারবেন আমি এখনও একটা ট্রমার মধ্যে আছি। হাজার হলেও নীলাঞ্জন মৈত্র,

মন্দাকিনী চৌধুরি তো আমার নিজের বাবা-মা। তাদের কুকীর্তির কথা সারা পৃথিবী জেনে গেছে। সাংবাদিকদের ফোনের জ্বালায় ফোনটা বন্ধ করে রেখেছি। ল্যাণ্ডলাইনের নম্বরটা ভাগ্যিস কেউ জানে না। সেসব নয় সাময়িক প্রবলেম। কিন্তু যতদিন বাঁচব ততদিন বাবা-মার এই কলঙ্কের ভার আমাকে বহন করতে হবে। লোকে আমার দিকে আঙুল তুলে দেখাবে। এই অবস্থায় নন্দনই আমার একমাত্র অবলম্বন। ভাল দিকটা হলো আমার এই অবস্থা দেখে নন্দন অনেকটা রেসপনসিবল হয়ে গেছে। আমাকে খুব সাপোর্ট দিচ্ছে। নেশা করাটাও প্রায় ছেড়ে দিয়েছে।'

সোহিনী খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর খুব আস্তে আস্তে বলল, 'বাবার মধ্যে ছোটবেলা থেকেই একটা ভায়োলেন্স লক্ষ করেছিলাম। একবার একটা বেড়াল আমাদের খুব জ্বালাচ্ছিল। আজ মাছ খেয়ে নেয়, কাল দুধে মুখ দেয়, আমাদের নাজেহাল অবস্থা। বাবা একদিন বেড়ালটাকে ধরে একটা লাঠি দিয়ে এত জোরে মাথায় মারল যে সেটার একটা চোখ সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু বেড়ালটা সঙ্গে সঙ্গে মরেনি। প্রায় এক সপ্তাহ আমাদের বাড়ির বাইরে বসে করুণভাবে বেড়ালটা কাঁদত। তারপর একদিন দেখলাম ওটা মরে পড়ে আছে। আমি তখন খুবই ছোট। ঘটনাটা আমাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। তারপর যত দিন গেছে, বাবার ভেতর একটা চাপা রাগ দানা বেঁধেছে। আমার মনে হয়, ইচ ফেলিওর মেড হিম মোর অ্যান্ড মোর অ্যাংরি অ্যান্ড ভায়োলেন্ট।'

'আর আপনার মা?'

'মাকে কোনদিন বাবার কথার ওপর কথা বলতে দেখিনি। বাবা যা বলত মা সব মেনে নিত। যেমন একজন বাধ্য অভিনেত্রী ডিরেক্টরের সব কথা মেনে নেয়। সেই মা যখন বাবাকে ছেড়ে সুবীর চৌধুরিকে বিয়ে করল, আমি ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তখন মনে হয়েছিল, ডমিনেটেড হতে হতে মা বোধহয় হাঁপিয়ে উঠেছে, তাই বাবার কর্তৃত্ব থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। এখন বুঝতে পারছি মা ওই কাজটাও বাবার নির্দেশেই করেছিল। মা সারা জীবন ডমিনেটেড হতেই চেয়েছিল।'

আদিত্য কী বলবে ভেবে পেল না। খানিকক্ষণ নীরবতার পর সোহিনী বলল, 'জানেন, আমার ছোটবেলার খুব সুন্দর কিছু স্মৃতিও আছে। যেমন সব বাচ্চারই থাকে। বাবা-মার সঙ্গে চিড়িয়াখানা বেড়াতে যাচ্ছি, পুরী গেছি, রবিবার বাড়িতে মা মাংস রান্না করেছে, এইসব। মা খুব ভাল রান্না করত। সেই মাংসের স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে। আমরা তো খুব সুখী একটা পরিবারই ছিলাম। কী যে হয়ে গেল।'

আদিত্য কথা বলছে না। ইচ্ছে করেই সোহিনীকে কথা বলতে দিচ্ছে। সোহিনীর হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে গেল। সে বলল, 'ওঃ হো, ভুলেই গেছিলাম। আপনাকে একটা জিনিস দেবার ছিল।' তারপর উঠে গিয়ে সে ড্রয়ার থেকে একটা কাগজের টুকরো বার করে নিয়ে এল। আদিত্য দেখল একটা চেক।

চেকটা আদিত্যর হাতে দিয়ে সোহিনী বলল, এটা পারিশ্রমিক নয়, চৌধুরি এন্টারপ্রাইজেসের পক্ষ থেকে অতি সামান্য একটা টোকেন অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন। আপনি আমাদের জন্য যা করেছেন তার তুলনায় কিছুই নয়। আপনি এটা নিলে আমরা বাধিত হব।'

টাকার অঙ্কটা দেখে আদিত্যর চোখ ঝলসে গেল। সে প্রসঙ্গ পালটে বলল, নন্দন আজ কী গাইছে?'

'সম্ভবত মিয়াঁ মল্লার। কদিন ধরে ওটাই তো রেওয়াজ করছে।'

আদিত্যর মনে পড়ে গেল মিয়াঁ মল্লার সম্বন্ধে তার বাবা কী বলেছিল। বাবা বলেছিল, ধর, খুব ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে, মিয়াঁ মল্লারের মুড কিন্তু সেটা নয়। বরং কল্পনা কর, খুব জোরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। খাল-বিল নদী-নালাগুলো সব জলে টইটুম্বুর। মাঠগুলো সবুজ হয়ে আছে। আর আকাশে প্রচুর মেঘ রয়েছে। একটু পরেই আবার বৃষ্টি নামবে। অর্থাৎ চারদিকে একটা শান্তি, একটা ফুলফিলমেন্ট। এটাই মিয়াঁ মল্লারের আসল মুড।

ভাবতে ভাবতে আদিত্য শুনতে পেল নন্দন সুর লাগিয়েছে। মিয়াঁ মল্লার। অতি ঢিমা বন্দিশ, করিম নাম তেরো। দয়াময় তোমার নাম। খাদের শুদ্ধ নিষাদ লেগেছে। তারপর ষড়জ ছুঁয়ে খাদের কোমল নিষাদটা

একেবারে নাভির গভীর থেকে উঠে এল। সোফায় হেলান দিয়ে আদিত্য চোখ বন্ধ করে ফেলেছে।

রচনাকাল জানুয়ারি, ২০১৮ — জুলাই, ২০১৮

# ভূতুড়ে টেলিফোন

## প্রথম পরিচ্ছেদ

(১)

রাস্তায় নেমে আদিত্য দেখল পুবদিকের আকাশে আবার মেঘ জমছে। একটু আগে, দুপুরবেলায়, বেশ কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বউবাজার স্ট্রিটের খানাখন্দগুলো এখনও বৃষ্টির জলে টইটুম্বুর। ফুটপাথ কাদায় কাদা। আদিত্য ঘড়ির দিকে তাকাল। বিকেল সাড়ে চারটে। আপিসের ভিড় এখনও শুরু হয়নি। বিবাদী বাগের মিনিবাস গুমটি প্রায় ফাঁকা। কিছু একটা খেতে হবে। সেই সকালে চা-বিস্কুট খেয়ে বেরিয়েছিল তারপর সারাদিন আর কিছু পেটে পড়েনি। আদিত্য রাস্তা পার হয়ে বিবাদী বাগের দিকে যেতে যাবে এমন সময় কে যেন তার নাম ধরে ডাকল।

বউবাজারের এই অঞ্চলটা আপিস পাড়ার ঠিক গায়ে। একটু এগোলেই রাধাবাজারের ঘড়িপট্টি। এজরা স্ট্রিট। সারি সারি ইলেকট্রিকাল গুডস-এর দোকান। রাস্তায় অবিশ্রাম লোক চলছে। রাত নটা-সাড়ে নটা অব্দি এরকমই চলবে। ভিড়ের মধ্যে আদিত্য পেছন ফিরল। তাদের আপিস বিল্ডিং-এর সিকিউরিটির নতুন ছেলেটা তাকে ডাকছে। কী যেন নাম ওর? বোধহয় শ্যামল।

'আরে আদিত্যবাবু কতক্ষণ থেকে চ্যাঁচাচ্ছি শুনতে পাচ্ছেন না?' শ্যামল ভিড় ঠেলে এগোতে এগোতে বলল।

'কী ব্যাপার, তাড়াতাড়ি বল। সারাদিন খাওয়া হয়নি। ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

আদিত্যর ভয় হল বিল্ডিং-এর মালিক গোকুলচাঁদ বুঝি শ্যামলকে দিয়ে আবার ভাড়ার টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে। গত তিনমাস আদিত্য আপিস ঘরের ভাড়া দিতে পারেনি। মুখে একরাশ নকল বিরক্তি নিয়ে সে শ্যামলের সামনে দাঁড়াল।

'আপনাকে একজন বাবু খোঁজাখুঁজি করছেন। ভাবসাব দেখে মনে হল মক্কেল। তাই ভাবলাম দেখি, আপনাকে কাছে-পিঠে খুঁজে পাই কিনা।'

শ্যামলও এই ক'দিনে জেনে গেছে মক্কেল বস্তুটা আদিত্যর জীবনে কী ভীষণ দুর্লভ। আশায়-আশঙ্কায় আদিত্যর বুকটা ধক করে উঠল। ধুর, মক্কেল হয়তো নয়। হয়ত তাদের মেসের চুনীবাবু। চুনীবাবুর কাছ থেকে সে গতমাসে কিছু টাকা ধার করেছিল। এখনও শোধ দেওয়া হয়নি। কিন্তু চুনীবাবু টাকার তাগাদা করতে এখানে আসবেন কেন?

মুখে নির্বিকার ভাব এনে আদিত্য বলল, 'কোথায় বাবু?'

'তাকে আপিসের মেন গেটে দাঁড় করিয়ে এসেছি।'

আরও কয়েক পা হেঁটে আপিসের মেন গেটের কাছে এসে আদিত্য দেখল কড়া ইস্ত্রি করা সাদা-বুশশার্ট-সাদা-প্যান্ট পরনে কালো মতো ফিটফাট এক মাঝবয়সি ভদ্রলোক গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আর অস্থিরভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। এক ঝলক দেখলেই বোঝা যায় ভদ্রলোকচুলে কলপ করেছেন। মুখের চামড়া আর চুলের রঙের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। আদিত্য অনুমান করল, চুলের রঙ কুচকুচে কালো হলেও ভদ্রলোকের বয়েস পঞ্চাশে-র এদিকে হবে না। আরও খানিকটা এগিয়ে ভদ্রলোকের সামনে পৌঁছে সে বলল,

'আমাকে খুঁজছিলেন? আমার নাম আদিত্য মজুমদার।'

ভদ্রলোক চমকে উঠে আদিত্যর দিকে তাকালেন। মুখে হুলো বেড়ালের সতর্কতা।

'ও আপনিই আদিত্য মজুমদার? তা, মানে, একটু দরকার ছিল আপনার সঙ্গে।'

'আসুন আমার সঙ্গে। দোতলায় আমার আপিস। আসুন।'

মেন গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকলেই সারি সারি লেটার বক্স। ওপরে বহুদিনের জমা ঝুল। একপাশ দিয়ে পুরোনো আমলের সিঁড়ি উঠে গেছে। বাড়িটা পাঁচতলা হলেও কোনও লিফট-এর ব্যবস্থা নেই। আদিত্যর

ভাগ্য ভাল সে দোতলায় একটা ঘর পেয়েছে। যাও বা এখন কালেভদ্রে দু'একটা মক্কেল আসে, এই পাহাড়ের মত সিঁড়ি ভেঙে পাঁচতলায় উঠতে হলে তাও আসত না। আদিত্য ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করল। দেয়ালের পলেস্তারা খসে পড়েছে। জায়গায় জায়গায় পানের পিকের লাল লাল ছোপ। দেখলে গা ঘিন ঘিন করে। দোতলায় উঠে ডানদিকে বেঁকল আদিত্য। লম্বা করিডোর। প্রথমে একটা জাল সিডির গুদোম। আদিত্য এখানে আসার পর দু'বার পুলিশ রেড হয়ে গেছে। তারপর একটা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির আপিস। সর্বদা লরি ড্রাইভারদের ভিড় লেগে থাকে। হট্টগোলে কান পাতা যায় না। সেসব পেরিয়ে করিডোরের একেবারে শেষপ্রান্তে আদিত্যর দরজা। দরজার গায়ে কাঠের নতুন নেমপ্লেট। তাতে ইংরেজিতে লেখা—আদিত্যবর্ণ মজুমদার, প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর।

পকেট থেকে চাবি বার করে দরজা খুলে আদিত্য ভদ্রলোককে বলল, 'আসুন।'

ঘরটা ছোট, কিন্তু বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। একটা বড় টেবিল, তার একদিকে একটা রিভলভিং চেয়ার, উল্টোদিকে দু'টো গদি-আঁটা আরাম কেদারা। ঘরের একদিকে একটা আলমারি, অন্যদিকে একটা সোফাও আছে। আসবাবগুলো বেশ পুরোনো, কিন্তু একটু দেখলেই বোঝা যায়, রীতিমত দামি। এগুলো আদিত্যর পারিবারিক সম্পত্তি। উত্তরাধিকারসূত্রে, বলতে গেলে, সে ওইটুকুই পেয়েছে। ঘরের একদিকের দেয়ালে একটা জানলা। জানলা দিয়ে বউবাজার স্ট্রিটের চলমান জনস্রোত দেখা যায়। এখানে আসার পরে আদিত্য জানলায় নতুন কাচ লাগিয়ে নিয়েছে। দরজা-জানলা বন্ধ করে দিলে ঘরটা বেশ নিরিবিলি হয়ে যায়।

আদিত্য ভদ্রলোককে বসতে বলে নিজেও বসল।

'বলুন, কী ব্যাপার।'

'একটা গোপনীয় ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি। মানে, ব্যাপারটা খুবই গোপনীয়।' ভদ্রলোক পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছলেন।

'বুঝলাম। তা আমার কথা জানলেন কী করে? খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছেন?'

'না, না। উকিলবাবু, মানে আপনার বন্ধু সুনন্দ মিত্র, আপনার কাছে আসতে বললেন। আমি আমার সমস্যা নিয়ে ওঁর কাছে গিয়েছিলাম। উনি বললেন, উনি কিছু করতে পারবেন না, আপনার ঠিকানা দিয়ে বললেন, আমার বন্ধুর কাছে যান, ও আপনাকে সাহায্য করতে পারবে। আপনার, মানে ফিসটা কত যদি একটু বলেন।'

'টাকা-পয়সার কথা পরে হবে। আপনি আগে আপনার সমস্যাটা বলুন।'

'বলছি। তার আগে একটা কথা। শুনলেই বুঝতে পারবেন, আমার সমস্যাটা গোপনীয়। এটা গোপনীয় রাখাটা খুব দরকার। আমার কথাগুলো পাঁচকান হলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কেউ কিচ্ছু জানতে পারবে না। মক্কেলদের গোপনীয়তা রক্ষা না করতে পারলে আমার ব্যবসা দু'দিনে লাটে উঠে যাবে। আপনার সমস্যাটা এবার বলুন। আচ্ছা দাঁড়ান, আগে একটু চা বলে আসি।'

ভদ্রলোককে বসিয়ে রেখে আদিত্য নীচে এসে দেখল শ্যামল দরজার কাছে টুলের ওপর বসে বসে ঝিমোচ্ছে।

'শ্যামল, একটু চা আনতে হবে ভাই। একটু তাড়াতাড়ি, মক্কেল বসে আছে। আর দেখো, কাপটা যেন পরিষ্কার হয়। চারটে বিস্কুটও এনো। এই নাও। ফেরতটা তুমি রেখে দিও।'

আদিত্য একটা কুড়ি টাকার নোট এগিয়ে দিল।

'আমার ভালো নাম জিতেন্দ্রনাথ দত্ত। তবে মন্টু দত্ত বলেই লোকে আমাকে বেশি চেনে। মেডিকেল কলেজের উল্টোদিকে আরপুলি লেনে আমার একটা ছোটখাট প্রেস আছে। ওখানে গিয়ে মন্টুবাবুর প্রেস বললে যে কেউ দেখিয়ে দেবে। আমার প্রথম স্ত্রী চিররুগ্না ছিলেন। দশ বছরেরও বেশি হয়ে গেল মারা গিয়েছেন। আমার মেয়ে তখনও ইশকুলে পড়ে। ওই মেয়ে ছাড়া আমার আর কোনও সন্তান নেই। আমি

সাবধানী মানুষ মশাই, মেয়ে মাধ্যমিক পাশ করতে না করতে বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। ২০০৯-এর নভেম্বর, হ্যাঁ, তাও প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর হতে চলল। জামাই ভিলাইতে কাজ করে। বয়েসে আমার মেয়ের থেকে প্রায় পনেরো বছরের বড়, কিন্তু স্বভাবচরিত্র ভাল। তবে কলকাতায় আসার সুযোগও নেই, ইচ্ছেও নেই। বলতে কি, বিয়ের পরে মেয়ে একেবারে পর হয়ে গেছে। দূরে থাকে, খুব একটা খোঁজ-খবরও নেয় না। নাতিটাকেও দু'একবারের বেশি চোখে দেখিনি। বুঝতেই পারছেন, মেয়ের বিয়ের পর খুবই একা হয়ে পড়েছিলুম। কিছুই ভাল লাগে না, কাজে-কম্মেও মন বসে না। শেষে বছর তিনেক আগে আবার একটা বিয়ে করেছি। আমার দ্বিতীয় স্ত্রী বকুল আমাদের পাড়ারই মেয়ে। বাপ-মা নেই। ভাইদের গলগ্রহ হয়ে ছিল। কিছুতেই বিয়ে হচ্ছিল না, নইলে দোজবরকে কে বিয়ে করবে বলুন? যাইহোক, আমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে বকুলও বাঁচল, মানে তার ভবিষ্যতের একটা উপায় হল, আর আমিও একটা সঙ্গী পেলুম। মোট কথা, বিয়ের পর বছর দুয়েক বেশ ভালোই কাটল। আর তারপরেই শুরু হল ঝামেলা।'

'একটু দাঁড়ান। আপনার এখন বয়েস কত চলছে?'

মন্টুবাবু একটু থতমত খেলেন। 'তিপ্পান্ন চলছে, সামনের নভেম্বর মাসে তিপ্পান্ন কমপ্লিট করে চুয়ান্নতে পড়ব।'

'আর আপনার দ্বিতীয় স্ত্রীর বয়েস?' আদিত্য একটা ডায়রিতে নোট নিচ্ছিল।

'মেয়েদের বয়েস তো মশাই বোঝা মুস্কিল। জিজ্ঞেস করলেও সত্যি কথা বলে না। তবে আমার মনে হয় বকুলের বয়েস সাঁইত্রিশ-আটত্রিশের কম হবে না। অনেকদিন বিয়ের জন্য বসে ছিল।'

'আপনাদের বিয়ে কবে হয়েছে?'

'২০১১ সালে, নভেম্বর মাসে।'

'হুঁ, তারপর কী হল বলে যান।'

শ্যামল দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকল। হাতে চায়ের কেটলি, দুটো খালি কাপ, খবর কাগজে মোড়া চারটে থিন-এরারুট বিস্কুট। চা কাপে ঢেলে কেটলি নিয়ে শ্যামল চলে গেল।

'আসুন, চা খান।'

'শুধু চা। বিস্কুট খাব না।'

মন্টুবাবু শব্দ করে চায়ের কাপে চুমুক লাগালেন। আদিত্য চায়ে চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরাল। মন্টুবাবুর দিকে সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিতে তিনি মাথা নাড়লেন, তাঁর সিগারেট চলে না। তিন-চার চুমুকে চা শেষ করে মন্টুবাবু আবার বলতে লাগলেন—

'আমার নিজের সমস্যাটার কথা বলার আগে আমাদের পাড়াটার কথা একটু বলে নিই। আমার বাড়ি শহরের পুবদিকে, গোবরা কবরস্থান অঞ্চলে। চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের পেছন দিয়ে একটা রাস্তা এঁকেবেঁকে আমাদের ওইদিকটায় গিয়ে পড়েছে। রাস্তাটা ধরে চলতে থাকলে দুবার রেল লাইন পেরোতে হয়। প্রথমটা পার্ক সার্কাস-শেয়ালদার মেন রেললাইন। ওটার ওপর দিয়ে ঘন ঘন ট্রেন যায়। লেবেল ক্রসিং-এ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এর পরে আর একটা রেল লাইন আছে যেটা শেয়ালদা স্টেশনের পেছন দিক দিয়ে অর্থাৎ স্টেশনটাকে পশ্চিমে রেখে পার্ক সার্কাস স্টেশন থেকে সোজা স্যার গুরুদাস হল্ট বলে একটা ছোট্ট স্টেশন ছুঁয়ে একেবারে বিধাননগর স্টেশনে গিয়ে ঠেকেছে। আমাদের পাড়াটা এই দ্বিতীয় রেললাইনটার গা ঘেঁষে। এই লাইনটার ওপর দিয়ে খুব বেশি ট্রেন চলে না। কিছু মালগাড়ি যায় আর সারাদিনে মেরে কেটে দু-তিনটে লোকাল ট্রেন। আপনি ওদিকটায় কখনও গেছেন কিনা জানি না, তবে হয়তো শুনে থাকবেন ওই অঞ্চলটা খুব একটা ভাল নয়। নেহাত বাবা ওখানে বাড়ি করেছিলেন বলে ছেড়ে যেতে পারি না। পাড়াটা রেল লাইনের ধারে বলে ওয়াগন ব্রেকার, সমাজবিরোধীদের ঝামেলা লেগেই আছে। প্রতি মাসেই একটা-দুটো লাস পড়ে। প্রায় রোজই রাত্তিরের দিকে বোমা, গুলিগোলার শব্দ শোনা যায়। মাঝে মাঝে পাড়ায় পুলিশ আসে, হম্বিতম্বি করে, দু-একজনকে ধরেও নিয়ে যায়, তারপর আবার যে কে সেই। আমার বাড়ি এবং

শ্বশুরবাড়ি, মানে বকুলের বাপের বাড়ি, দুটোই রেললাইনের একেবারে গা ঘেঁষে। বকুলের বাবা-মা বহুদিন গত হয়েছেন, নিকটজন বলতে দুই দাদা। বড়দা রজনী বসাক অতিশয় সজ্জন, পিএনটি-তে চাকরি করত, বদখেয়াল কিছু নেই, পান-বিড়ি পর্যন্ত খায় না, নেশা বলতে শুধু দেশ-বিদেশ বেড়ানো। আপিস থেকে প্রিম্যাচিওর রিটায়ারমেন্ট নিয়ে একটা ট্র্যাভেল এজেন্সি খুলেছে। বয়েসে রজনী আমার থেকে কয়েক বছরের ছোট। তার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয়। তার কাছ থেকেই বকুলকে বিয়ে করার ব্যাপারে প্রস্তাবটা এসেছিল। তো সে যাই হোক, রজনীর ছোট ভাই দেবীটা কিন্তু এক নম্বরের বদমাশ। ক্লাস ফোর ফাইভের পর আর ইশকুলমুখো হল না। কুসঙ্গে পড়ে মদ-গাঁজা ধরল, তারপর একটু বয়েস বাড়তে স্মাগলারদের দলে ভিড়ল। মানে সেইরকমই শুনতে পাই আর কি। তাকে পুলিশ দু'চারবার ধরে নিয়ে গেছে, তারপর দলের লোকেরা টাকা-পয়সা দিয়ে ছাড়িয়ে এনেছে। শেষবার সে কী কুকর্ম করেছিল জানি না, দলের লোকেরা তাকে আর ছাড়াতে পারল না। প্রায় দু-বছরের জেল হয়ে গেল। তার সঙ্গে তার স্যাঙাত এবং সব অপকর্মের গুরুমশাই সুশান্ত হালদারেরও জেল হল। এই সুশান্তটাই দেবীকে খারাপ পথে নিয়ে এসেছিল। তাছাড়া আমার স্ত্রী বকুলের ওপরেও সুশান্তর কুনজর ছিল।'

বলতে বলতে মন্টুবাবু মাথা নিচু করলেন। আদিত্য বুঝতে পারল অচেনা মানুষের কাছে পারিবারিক কলঙ্কের কথা বলতে ভদ্রলোকের মোটেই ভাল লাগছে না। আস্তে আস্তে এই মন্টুবাবু লোকটাকে আদিত্যর ভাল লেগে যাচ্ছিল। এমনিতে কলপ করা লোক সে মোটেই পছন্দ করে না। কিন্তু মন্টুবাবুর বাইরেটা কলপ করা হলেও ভেতরটা মনে হয় খাঁটি। সে মন্টুবাবুকে কিছুটা তৈরি হবার সময় দিল। তারপর নিচু গলায় বলল,

'শুনুন, আমার কাছে কিছু লুকোবেন না। আমার কাছে কথা লুকোলে আপনারই কাজ পেতে অসুবিধে হবে।'

'না, না। আপনার কাছে কিছু লুকোব না। আপনাকে তো সব কথাই বলতে এসেছি। এক গেলাস জল হবে?'

আদিত্য ডায়েরি বন্ধ করে জানলার কাছে কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল এনে ভদ্রলোকের সামনে রাখতে না রাখতেই ভদ্রলোক ঢকঢক করে জলটা খেয়ে ফেললেন। বোঝা গেল, যেকোনও পানীয়ই ভদ্রলোক চট করে গিলে ফেলায় বিশ্বাসী, তা সে চা-ই হোক, কি জল। জল খেয়ে, পকেট থেকে রমাল বার করে মুখ মুছে, ভদ্রলোক আবার শুরু করলেন,

'দেবী আর সুশান্ত জেলে যেতে আমাদের পাড়াটাও যেন কিছুদিনের জন্য হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এরই কিছুদিন পরে রজনীর কাছ থেকে বকুলকে বিয়ে করার প্রস্তাবটা আসে। দেবী আর সুশান্ত জেলের বাইরে থাকলে কিছুতেই এই বিয়ে হতে দিত না। বছরখানেক আগে জেলের মেয়াদ শেষ করে দেবী আর সুশান্ত বাইরে বেরোল। আগে সুশান্ত, তার মাস তিনেক পরে দেবী। পাড়ায় এসে তারা শুনল বকুলের বিয়ে হয়ে গেছে।'

এদিকে রজনী তার ছোট ভাইকে সাফ সাফ জানিয়ে দিল তার বাড়িতে জেল-ফেরত কয়েদির কোনও জায়গা হবে না। সে ভদ্র সমাজে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে বাস করে, সরকারি চাকরি করত, এখন সৎ ভাবে ব্যবসা করছে। এই বয়সে সে মান-সম্মান খুইয়ে পরিবার সুদ্ধু পথে বসতে রাজি নয়। বাড়িটা রজনীর নিজের টাকায় করা। তাই সেখানে কে থাকবে আর কে থাকবে না সেটা ঠিক করার পুরো অধিকার তার আছে। দাদার কথা শুনে দেবী খুব একচোট হম্বিতম্বি করল। তারপর বলল, দুএকদিনের মধ্যেই সে ফিরে এসে বদলা নেবে। সে চলে যেতেই রজনী পাড়ার পাঁচজনকে ডেকে তার সমস্যার কথা বলল। সকলেই তার পক্ষে। আমাদের ওদিকটা কলকাতার একটু বাইরে বলে এখনও একটা গ্রাম-গ্রাম ভাব আছে। বিপদে-আপদে পাড়ার লোক বুক দিয়ে করে। সবাই মিলে পরামর্শ করে সেইদিনই আমাদের এম এল এ সাহেবের কাছে যাওয়া হল। আমাদের এম এল এ মানুষটি অতি ভদ্রলোক। তিনি অভয় দিলেন। তাঁর কথায় পার্টির ছেলেরা

পরদিন দেবী আর সুশান্তকে রেল লাইনের ধারে দেখতে পেয়ে প্রচণ্ড ধমকাল। তাদের বলা হল, ফের যদি তারা পাড়ায় ঢোকে তাহলে তাদের ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া হবে। দেবী আর সুশান্ত একটু ভড়কাল। তারা পাড়ায় আর ঢুকল না বটে কিন্তু পুরোপুরি পাড়া ছেড়ে চলেও গেল না। পাড়ার ঠিক বাইরে একটা সাইবার কাফে খুলে বসল। দোকান ঘরের পেছনের ঢাকা জায়গাটাতে তারা রাত্তিরে থাকে। কোনও রকম ঝামেলায় আর তারা যায় না। ধীরে ধীরে পাড়ার লোক ওদের অতীতের কথা ভুলতে শুরু করল। কেউ কেউ এটাও বলতে লাগল যে, জেলের ঘানি টেনে ছেলে দুটো একেবারে শুধরে গেছে। এখনও সেইভাবেই চলছে। ওদের দোকানে আজকাল বেশ ভিড় হয়। আমাদের পাড়ায় আর কোনও কম্পিউটারের দোকান নেই তো। আমার কিন্তু স্থির বিশ্বাস ছেলেদু'টো ঠিক আগের মতোই বদমায়েশ আছে। শুধু জেলের ভাত খেয়ে আরও সেয়ানা হয়েছে।'

(২)

মন্টুবাবু দম নেবার জন্য খানিকটা থামলেন। আদিত্য আবার সিগারেট ধরাল। টেরিয়ে দেখল তার হাতঘড়িতে সোয়া পাঁচটা বেজে গেছে। বাইরে আবার বৃষ্টি নেমেছে। খুব জোরে নয়, আবার খুব আস্তেও নয়। ভিজিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। আপিসগুলো ছুটি হচ্ছে। রাস্তায় শুধু ছাতা আর ছাতা। একটা ট্র্যাম বেলাইন হয়ে ভয়ানক যানজট সৃষ্টি করেছে। বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সি সকলে একসঙ্গে হর্ন বাজাচ্ছে। সেই ভয়ঙ্কর গোলমাল জানলার মোটা কাচ ভেদ করে কিছুটা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ছে।

'জানলাটা একটু খুলে দেওয়া যাবে?' মন্টুবাবু কিন্তু কিন্তু গলায় বললেন।

আদিত্য বুঝল সিগারেটের ধোঁয়ায় ভদ্রলোকের কষ্ট হচ্ছে। সে উঠে গিয়ে জানলাটা খুলে দিতেই এক ঝলক ভিজে হাওয়া ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সেই সঙ্গে রাস্তার হট্টগোল আর উল্টোদিকে নয়নতারা কেবিন থেকে ভেসে আসা মোগলাই পরোটা, কোবরেজি ভাজার হালকা গন্ধ। আদিত্য-র হঠাৎ মনে পড়ে গেল আজ সারাদিন তার কিছুই খাওয়া হয়নি। তার ভীষণ খিদে পেয়ে গেল। খিদেটাকে চাপা দেবার জন্য সে হাতের সিগারেটটাতে একটা লম্বা টান দিয়ে অবশিষ্টাংশ অ্যাশট্রেতে গুঁজে আবার নিজের জায়গায় এসে বসল।

'তারপর?'

'হ্যাঁ, তারপর আসল কথায় আসি। আগেই বলেছি, জেলে যাবার আগে থেকেই বকুলের দিকে সুশান্তর কুনজর ছিল। রজনীও অনেকবার আমাকে বলেছে ওই সুশান্ত ছোকরা মাঝে মাঝেই তার বোনকে বিরক্ত করে। জেল থেকে বেরিয়ে সুশান্ত আবার বকুলের দিকে দৃষ্টি দিল। তবে আগেকার মতো খোলাখুলি নয়, লুকিয়ে চুরিয়ে।'

'কেন আপনার এরকম মনে হল?'

'বকুল নিজেই আমাকে দু-একবার বলেছে রাস্তাঘাটে দেখা হলে সুশান্ত তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে।'

'শুধু কথা বলার চেষ্টা করে?'

'না, শুধু কথা বলার চেষ্টা করলে সমস্যা ছিল না। দেবী আর সুশান্ত জেল থেকে ছাড়া পাবার কয়েক মাসের মধ্যে আমাদের বাড়িতে ভূতুড়ে টেলিফোন আসতে শুরু করল। প্রত্যেকদিন অন্তত দশ-পনেরোবার টেলিফোন আসে। ফোন তুলে হ্যালো বললে সঙ্গে সঙ্গে কেটে দেয়। কোনও কথা বলে না। এতদিন আমাদের বাড়ির টেলিফোনটা মোটামুটি বোবা হয়েই বসে থাকত। কে আর ফোন করবে? আমার তো তিনকুলে কেউ নেই, মেয়েও খোঁজখবর নেয় না। আর বকুলেরবাপের বাড়ি দু'পা দূরে। তার দাদা, বৌদি, ভাইঝি দু'বেলা আসা-যাওয়া করছে। তাছাড়া বকুল আর আমার দুজনেরই একটা করে মোবাইল আছে। কথা বলার থাকলে তাতেই কথা হয়। বলতে পারেন টেলিফোনটা এতদিন অকেজো হয়েই পড়ে থাকত।

নেহাত বাবার আমলের টেলিফোন তাই মায়া করে কানেকশনটা কাটিয়ে দিতে পারিনি। দু'মাস অন্তর ভাড়া গুনে গেছি। কিন্তু দেবী-সুশান্ত ফিরে আসার পর থেকে ঘনঘন টেলিফোন বাজতে শুরু করল। আমি রিসিভার তুলে হ্যালো বললেই কুট করে কেটে দেয়।'

'শুধু আপনি কথা বললেই কেটে দেয়, নাকি ...'

'না, বকুল হ্যালো বললেও একই রকম হয়। অন্তত বকুল তাই বলছে।'

'টেলিফোনটা কোথা থেকে আসছে কখনও ট্রেস করার চেষ্টা করেছেন?'

'করেছি। টেলিফোন ভবনে আমার চেনাশোনা একজন কাজ করে। সে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে জানতে পেরেছে যে টেলিফোনটা একই নম্বর থেকে আসে। নম্বরটা চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের উল্টোদিকের একটা টেলিফোন বুথের। বুথটা দিনের অনেকটা সময় খোলা থাকে আর সারাক্ষণ সেখানে ভিড় লেগেই আছে। রুগিদের বাড়ির লোকের ভিড় আর কি। তাও আমি সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলুম। তারা বলল রোজ তাদের দোকান থেকে এত লোক ফোন করে যে একটা বিশেষ নম্বরে কে বারবার ফোন করছে তাদের পক্ষে খেয়াল রাখা সম্ভব নয়।

'দেখুন মন্টুবাবু, আপনি যদি ভূতুড়ে টেলিফোন সমস্যার সমাধান করতে আমার কাছে এসে থাকেন, তাহলে কিন্তু ভুল করেছেন। এর জন্য টেলিফোন আপিস আছে, পুলিশ আছে। দরকার হলে আপনার টেলিফোন নম্বরটা পাল্টেও নিতে পারেন। টেলিফোন আপিসে তার জন্য শুধু একটা দরখাস্ত করতে হবে।'

'না, না আমি সেজন্য আসিনি। দেখুন তেমন বুঝলে আমি তো টেলিফোন লাইনটাই কাটিয়ে দিতে পারি। বাড়িতে টেলিফোন রাখার কোনও প্রয়োজনই আমার নেই। আমি এসেছি অন্য একটা কারণে। এবার সেই কথাটা বলি।'

মন্টুবাবু একটু নড়েচড়ে বসে আবার শুরু করলেন।

'সুশান্তর যে বকুলের প্রতি দুর্বলতা ছিল সে তো আগেই বলেছি। কিন্তু বকুলের দিক থেকে কোনও প্রশ্রয় ছিল কিনা, কে বলতে পারে? দেখুন, নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে এসব নোংরা কথা ভাবতে আমার নিজেরই ঘেন্না করছে। কিন্তু মাথা ঠান্ডা করে ভেবে দেখলে সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে একটা কথা মনে হয়। বিয়ের আগে যদি সুশান্তর প্রতি বকুলের কোনও দুর্বলতা থেকেও থাকে, বিয়ের পরে সেসব কিছু আর অবশিষ্ট নেই। তবে মেয়েদের চরিত্র, বুঝলেন কিনা।'

'এটাই কি সমস্যা?'

'না, না। আসল সমস্যাটা অন্য জায়গায়। আমার ধারণা, বিয়ের আগে বকুলের সঙ্গে সুশান্তর বেশ খানিকটা মাখামাখি হয়েছিল। ফলে বকুলের জীবনের কোনও গোপন কথা সুশান্ত জানে আর এখন সেই কথাটা ফাঁস করে দেবার ভয় দেখিয়ে সে বকুলকে ব্ল্যাকমেল করছে। কথা হচ্ছে, সেই গোপন কথাটা যত ভয়ঙ্করই হোক, আমি কিন্তু আমার স্ত্রীকে ছাড়ছি না। মুস্কিল হল, কথাটা বকুলের কাছে পাড়তেই পারছি না। এসব কথা বলতে গেলেই সে এমন গম্ভীর হয়ে যায় যে বেশি দূর আর এগুনো যায় না।'

'সুশান্ত বকুলকে ব্ল্যাকমেল করছে এমন ধারণা আপনার হল কেন?

কারণ প্রথমত ওই ভূতুড়ে টেলিফোন। আমার মনে হয় ভূতুড়ে টেলিফোন করে সে বকুলের ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে। হয়তো আমার অনুপস্থিতিতে বকুলকে ফোন করে সে ভয়ও দেখায়। আমি লক্ষ করে দেখেছি আজকাল টেলিফোন এলেই বকুল কেমন যেন ভয় পেয়ে যায়। তাছাড়া একদিনের ঘটনা বলি। সাধারণত সারা দিনটা আমি প্রেসেই কাটাই। বাড়ি ফিরতে সাড়ে আটটা নটা বেজে যায়। সেদিন শরীরটা ভালো লাগছিল না বলে দুপুরবেলায় বাড়ি ফিরে আসছিলুম। তাড়াতাড়ি ফিরব বলে বাড়ির পেছন দিকের রাস্তাটা দিয়ে শটকাট করছি এমন সময় দেখি আমাদের বাড়ির পেছন দিকের গলিতে বকুল দাঁড়িয়ে আছে আর তার কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আছে সুশান্ত। সুশান্তর হাতে একগোছা পাঁচশো টাকার নোট। আমাকে দেখে বকুলের মুখটা ভয়ে সাদা হয়ে গেল আর সুশান্ত চট করে পাশের গলিটায় গা ঢাকা দিল। ওই

ভরদুপুরে ওখানে কী করছিল জিজ্ঞেস করতে বকুল আমতা আমতা করতে লাগল। মনে হল আরও চেপে ধরলে কেঁদেই ফেলবে। আমি আর তাকে খুব একটা ঘাঁটাতে সাহস পেলুম না।'

'আচ্ছা, আপনার স্ত্রী তো চাকরি করেন না। ব্ল্যাকমেলের টাকা তিনি পাবেন কোথায়?'

'দেখুন, টাকা-পয়সার ব্যাপারে আমি আমার স্ত্রীকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। সংসার খরচের পুরো টাকাটাই তো তার হাতে। তার থেকে দশ-বিশ হাজার এদিক ওদিক হয়ে গেলেও টের পাব না। আপনাকে বললুম বটে আমার প্রেসটা ছোটখাট, কিন্তু আসলে প্রেসটা খুব একটা ছোট নয়। পাকা এবং ঠিকে মিলিয়ে ষাট-সত্তরজন কাজ করে আমার প্রেসে। মাসে তিন-চার লাখ টাকার কম আয় হয় না। যা আয় করি, স্ত্রীর হাতে তুলে দিই। ব্যাঙ্কট্যাঙ্ক-এর কাজগুলো বকুলই দেখে। প্রেসের কাজ সামলে আমি আর টাকাপয়সার ব্যাপারটা দেখে উঠতে পারি না। তাছাড়া টাকাপয়সা বাদ দিয়েও বকুলকে সুশান্ত অন্য কোনও ব্যাপারে বাধ্য করতে পারে।'

'ভয় দেখিয়ে কোনও নোংরা শারীরিক দাবি সুশান্ত করতে পারে এটাই বলছেন কি?'

মন্টুবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর চোয়াল শক্ত করে রুদ্ধস্বরে বললেন,

'সেটাই বলছি। ব্যাপারটা আমি অনেক ভেবে দেখেছি। আমার মনে হয়েছে সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে আমি নিশ্চিত যে, সেরকম কিছু ঘটে থাকলে বকুলের অনিচ্ছাতে তার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে সুশান্ত ঘটিয়েছে।'

'আপনি আমাকে ঠিক কী করতে বলছেন?'

আপনার কাছে আমার দুটো অনুরোধ। একনম্বর, আপনাকে জানতে হবে বকুলকে সত্যি-সত্যি কেউ ব্ল্যাকমেল করছে কিনা। আর দু'নম্বর, করে থাকলে কীসের জোরে করছে? বলাই বাহুল্য, দু'টোরই প্রমাণ আপনাকে জোগাড় করতে হবে।'

জানলার দিকে তাকিয়ে আদিত্য খানিকক্ষণ চিন্তা করল। তারপর বলল,

'আপনার কেসটা আমি নিলাম। আপনার ঠিকানাটা আমাকে দিয়ে যান।'

'এই যে আমার কার্ড। এতে আমার আপিস এবং বাড়ির ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, টেলিফোন নম্বর সবই আছে। বাড়ির যে টেলিফোন নম্বরটা কার্ডে দেওয়া আছে ওই নম্বরেই ফোনগুলো আসে। আপনার ফী-এর ব্যাপারটা তো বললেন না?'

'এখন হাজার দশেক অ্যাডভান্স দিয়ে যান। পরে আরও হাজার চল্লিশ লাগবে। তবে আপনার কাজ যদি না করে দিতে পারি, তাহলে গাড়িভাড়া এবং একটা সামান্য পারিশ্রমিক কেটে নিয়ে বাকিটা ফেরত দেব। চলবে তো?'

'খুব চলবে মশাই, খুব চলবে। টাকার ব্যাপারটা খোলাখুলি বলে নিলাম বলে কিছু মনে করবেন না। ব্যবসাদার মানুষ তো, টাকাকে ঠিক খোলামকুচি মনে করতে পারি না।'

মন্টুবাবু পকেট থেকে একটা পাঁচশো টাকার নোটের বান্ডিল বার করে গুনে গুনে দশ হাজার টাকা টেবিলের ওপর রাখলেন। আদিত্য টাকাটা ড্রয়ারে রেখে একটা রসিদ কেটে দিল।

'আচ্ছা, আজ আসি তাহলে?'

'আসুন। ও হ্যাঁ, আমার মোবাইল নম্বরটা নিয়ে যান। কিছু জানাবার থাকলে ফোন করবেন।'

'আপনার মোবাইল নম্বর আছে আমার কাছে। সুনন্দবাবুর কাছ থেকে পেয়েছি। ভেবেছিলুম ফোন করে আসব। কিছুতেই ফোনে পেলুম না। বলছে, আউট অফ সার্ভিস।'

'এবার পাবেন। নমস্কার।'

'নমস্কার।'

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(১)

আপিস বন্ধ করে রাস্তায় এসে আদিত্য দেখল বৃষ্টি থেমে গেছে। বাড়ি ফেরার পথে যেসব আপিসযাত্রী বৃষ্টির জন্য আটকা পড়েছিল, তারা একটু একটু করে রাস্তায় নামছে। ফুটপাথে মানুষের ট্র্যাফিক জ্যাম। আদিত্য একবার ভাবল কোনও রেস্তোরাঁতে ঢুকে কিছু খেয়ে নেবে। পকেটে আজ টাকা আছে। কিন্তু সারাদিন কিছু না খেয়ে খিদেটা যেন মরে গেছে। তাছাড়া আপিস থেকে বেরোবার আগে শ্যামলের আনা চারটে বিস্কুট সে খেয়ে বেরিয়েছে। আদিত্য বউবাজার স্ট্রিটের ভিড় ঠেলে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বিবাদী বাগে মিনিবাসের লাইনে দাঁড়াল। একডালিয়া রোডের মিনিবাস। সর্পিল লাইন এঁকেবেঁকে বহুদূর অব্দি চলে গেছে। একঘন্টার আগে বাস পাবার আশা নেই। আদিত্যর মেস হ্যারিসন রোড আমহার্স্ট স্ট্রিট মোড় থেকে মিনিট দুয়েক। এখন সে উল্টোদিকে যাবে। কাজ সেরে ফিরতে ফিরতে দশটা তো বাজবেই। তার মানে রাত্তিরের মিল বন্ধ হয়ে যাবে। অতএব মেসে ঢোকার আগে বাইরে কিছু খেয়ে নিতে হবে। সারাদিন না খেয়ে থাকলে শরীর টিকবে না। অবশ্য যেখানে যাচ্ছে সেখানেও খাবার জুটে যেতে পারে।

আজ মনটা খুব হালকা লাগছে। মনে হচ্ছে কাজটা ইন্টারেস্টিং হবে। প্রথমে যখন এই লাইনে এল তখন পেটের তাগিদে যা করতে হত সেগুলো ছিল নেহাতই ছোটখাট কাজ। করতে ভালোও লাগত না। তারপর তার একটু নাম হল। কয়েকটা বড় কাজ জুটল। তবে এবারে অনেক দিন বসে থাকতে হয়েছিল তাকে। সেদিক থেকে দেখলে এখন কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত। আদিত্য ভাবল, বাবা বেঁচে থাকলে কী বলত। নিশ্চয় তার এই কাজকে খুব একটা ভালো চোখে দেখত না। গোয়েন্দাগিরি দূরে থাক তার সাতপুরুষে কেউ পুলিশেও চাকরি করেনি। শুধু পুলিশে কেন, কোনও চাকরিই তার সাতপুরুষ করেনি। হয়তো সেই জন্যই তার আজ এই অবস্থা। পুরোনো জমিদারির জমা টাকায় কতদিন চলবে?

মাকে আদিত্যর মনেই পড়ে না। কিন্তু মায়ের অভাব বাবা তাকে কোনোদিন বুঝতে দেয়নি। ছোটবেলায় তার জীবনের সবটুকু জুড়ে ছিল তার বাবা। আর তার বাবার জীবনেও সে ছাড়া আর কেউ ছিল না। ছোটবেলায় আদিত্য জানত তারা খুব বড়লোক। বাড়িতে ঠাকুর-চাকর-দরোয়ান গিজ গিজ করত। বাড়ির গ্যারেজে দু'দু'টো বিদেশি গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকত। ইস্কুলের ছুটি পড়লে ফার্স্টক্লাশ কামরা রিজার্ভ করে বেড়াতে যাওয়া হত। প্রত্যেকবার একই জায়গায়। মধুপুরে। মধুপুরে তখন তাদের একটা মস্ত বড় বাড়ি ছিল। বাইরের ঠাটবাট বজায় থাকলেও ভেতরটা যে ক্রমশ ঝাঁঝরা হয়ে আসছে সেটা সেই বয়সে তার বোঝার কথা নয়।

বাবা তাকে কলকাতার দামি সাহেবি ইস্কুলে পড়িয়েছিল। তবে ইস্কুলের থেকেও ইস্কুলের বাইরে অনেক বেশি শিখেছিল সে। গানবাজনা, সাঁতার, শরীরচর্চা, সাহিত্যপাঠ কিছুই বাদ যায়নি। দেশ স্বাধীন হবার আগে আলোকপ্রাপ্ত জমিদার-পুত্ররা যেভাবে বড় হত ঠিক সেভাবেই সে বড় হচ্ছিল। পড়াশোনায় সে কোনোদিনই খারাপ ছিল না। ইস্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে অঙ্ক অনার্স পড়তে ঢুকেছিল। অঙ্ক নিয়ে কলেজে ভর্তি হবার পেছনেও বাবা। অঙ্কের বাজার খারাপ, অঙ্ক নিয়ে পাশ করলে চাকরি পাওয়া যায় না, এসব কথা তার বন্ধুরা বলাবলি করত। কিন্তু বাবা বলত, যেটা ভালো লাগে সেটাই পড়। আসলে বিদ্যে বেচে পেট চালানোর কথা তাদের পরিবারে কেউ কখনো ভাবেনি। আর ছোটবেলা থেকেই অঙ্ক জিনিসটা আদিত্যর বেশ ভালো লাগত। কলেজে পড়ার সময় সে স্বপ্ন দেখত বড় হয়ে গাউস বা অয়লারের মত মস্ত ম্যাথামেটিশিয়ান হবে।

বি এসসি পাশ করার পর যখন তার কেম্ব্রিজে পড়াশোনা করতে যাওয়া প্রায় পাকা তখন হঠাৎ বাবা মারা গেল। বাবার মৃত্যুর মাস খানেকের মধ্যেই আদিত্য তাদের আসল অবস্থাটা বুঝতে পারল। ধার, ধার, চারদিকে শুধু ধার। কলকাতার বাড়ি তিনটে, মধুপুরের বাড়িটা সবই দেনার দায়ে বাঁধা পড়েছে। বাড়িগুলো

গেল, গাড়িদুটোও, স্থাবর অস্থাবর যা কিছু ছিল প্রায় সবই গেল। ছ'মাসের মধ্যে আদিত্য পথে বসল। ঈশ্বর জানেন, এ নিয়ে তার মনে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই। হয়ত ছোটবেলা থেকে প্রাচুর্যের মধ্যে বড় হয়েছিল বলে বিত্তের ব্যাপারে তার একটা নিরাসক্তি এসে গিয়েছিল। শুধু বিলেত যাওয়াটা হল না বলে তার মনের কোণে এখনও কিছুটা দুঃখ রয়ে গেছে।

দারিদ্রের সঙ্গে মানিয়ে নিতে তার যে প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হয়নি তা নয়। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর বছর দুয়েক বাবার অভাবটা এমন তীব্রভাবে তার মন জুড়ে থাকত যে শারীরিক কোনও অস্বাচ্ছন্দ সে তেমন টের পেত না। যখন বাবার মৃত্যুর আঘাতটা একটু একটু করে সয়ে এল ততদিনে দারিদ্রটাও মোটামুটি অভ্যেস হয়ে গেছে। তবে মেসবাড়ির বাথরুমটা অনেকদিন পর্যন্ত তার ভীষণ নোংরা লাগত। বহুদিন পর্যন্ত বন্ধুবান্ধবের বাড়ি গিয়ে বাথরুম সেরেছে সে। এখন অবশ্য সেটাও অভ্যেস হয়ে গেছে।

আদিত্য যে কী করে এই অদ্ভুত গোয়েন্দাগিরির লাইনে এল সেটা তার নিজেরও ভালো করে মনে পড়ে না। বাবার মৃত্যুর পর তার জীবনটা একেবারে ছন্নছাড়া হয়ে গিয়েছিল। গত দশ-পনেরো বছর সে নানা ঘাটের জল খেয়েছে। পয়সার অভাবে এম এসসি-টা পড়া হয়নি। পেট চালানোর জন্য বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ছাত্র পড়িয়েছে, একটা ইস্কুলেও বদলি হিসেবে কাজ করেছে। কিছুদিন, তা প্রায় বছর দেড়েক হবে, এক জাদুকরের সাকরেদি করেছে, এক বছর ঝাড়গ্রামের কাছে এক জঙ্গলে ফরেস্ট গার্ডের কাজ করেছে। কয়েক বছর একটা বেসরকারি আপিসে কেরানিগিরিও করেছে। কোনও কাজই তার ভালো লাগেনি। আসলে দশটা-পাঁচটা চাকরির ব্যাপারটা তার রক্তে নেই। চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় বসে আছে, এমন সময় একদিন তার সঙ্গে সুনন্দ সরকারের দেখা। সুনন্দ সরকার আদিত্যর সঙ্গে ইস্কুলে পড়ত। ওরা তিন পুরুষের ক্রিমিনাল লইয়ার। সুনন্দই তাকে একটু একটু করে এই লাইনে নিয়ে এসেছে। প্রথমে ছোটখাট কাজ। বেশির ভাগই ডিভোর্স কেস সংক্রান্ত। স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর জন্য, স্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বামীর জন্য প্রমাণ সংগ্রহ করার কাজ। করতে যে খুব একটা ভালো লাগত তা নয়। কিন্তু টুকটাক রোজগার হত। পেট চলে যেত। ইদানীং কয়েকটা জটিল সমস্যার সমাধানে পুলিশকে সাহায্য করার পর তার কিছুটা সুনাম হয়েছে। তবে টাকাপয়সার সমস্যাটা রয়েই গেছে। সুনন্দর পরামর্শমতো বছরখানেক হল এই আপিসটা ভাড়া নিয়েছে আদিত্য। সুনন্দরই এক ক্লায়েন্ট পুরোনো ভাড়ায় ঘরটা সাবলেট করেছে আদিত্যকে। মোটে দু'হাজার টাকা ভাড়া। তাও সে মাঝে মাঝে সময়মতো দিয়ে উঠতে পারে না।

(২)

একডালিয়া রোডের মিনিবাসটা যখন আদিত্যকে বালিগঞ্জ ফাঁড়ির মোড়ে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল তখন সোয়া আটটা বেজে গেছে। কোয়ালিটির পাশের গলিটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে আদিত্য বালিগঞ্জ প্লেসে এসে পড়ল। বৃষ্টির জন্য রাস্তাঘাট ফাঁকা। শুধু একটা ক্যারি আউট চিনে খাবারের দোকানের সামনে দু-একজন অপেক্ষা করছে। আর একটু এগিয়ে একটা মনিহারি দোকান। আদিত্য সেখান থেকে একটা বড় চকোলেট বার কিনল। তারপর রাস্তা পেরিয়ে ঢুকে পড়ল উল্টোদিকে একটা সাততলা বাড়ির ভেতর। লিফটে উঠে ছ'নম্বর বোতামটা টিপতে যাবে তার আগেই ভীষণ মোটা একজন মহিলা অসম্ভব ছোট একটা কুকুর কোলে নিয়ে হাঁসফাঁস করতে করতে লিফটে এসে উঠলেন। তিনজন কিশোরীও কলকল করে কথা বলতে বলতে লিফটে উঠল। লিফটে এত কম জায়গা যে কুকুরের মুখটা আদিত্যের গায়ে ঠেকছে। কুকুর নিয়ে আদিখ্যেতা আদিত্য একদম পছন্দ করে না। পাঁচতলায় কুকুরসহ ভদ্রমহিলা নেমে যাওয়া অব্দি আদিত্য ভয়ে সিটিয়ে রইল। কুকুরটা যদি চেটে দেয়। ছ'তলায় আদিত্যর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েগুলোও নামল। নেমে বাঁদিকে বেঁকে গেল। আদিত্য ডানদিকে বেঁকে করিডোর ধরে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ৬০২ নম্বর ফ্ল্যাটে বেল বাজাল।

যে দশ বছরের শ্যামলা ছেলেটা কিছুক্ষণ বাদে দরজা খুলে দিল তার হাতে একটা খোলা ডটপেন। বোঝা যায় লেখাপড়া করছিল। আদিত্যকে দেখে তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সে হইহই করে উঠল,

'আদিত্যকাকু এসেছে। বাবা আদিত্যকাকু এসেছে।'

আদিত্য চকোলেট বারটা ছেলেটার হাতে তুলে দিয়ে বলল,

'টুপলুবাবু এটা তোমার। ইস্কুল-টিস্কুল সব ঠিকঠাক চলছে তো?'

চকোলেট পেয়ে টুপলুবাবুর মুখে একরাশ দাঁত বেরিয়ে পড়ল। ওপরের সারির দাঁতের দু'কোণে দু'টো গজদাঁত।

'থ্যাংকিউ আদিত্যকাকু, তুমি এখন অনেকক্ষণ থাকবে তো?'

'অনেকক্ষণ থাকব।'

বাড়ির ভেতর থেকে পুরুষকণ্ঠ শোনা গেল,

'আদিত্য বোস। আমি আসছি। টুপলু তুমি তোমার ঘরে গিয়ে কালকের হোম-ওয়ার্কটা করে নাও। হয়ে গেলে আদিত্যকাকুর সঙ্গে গল্প করবে।'

আদিত্য যে ঘরটায় দাঁড়িয়েছিল সেটা এই ফ্ল্যাটবাড়ির বসার ঘর। একদিকে কয়েকটা বেতের চেয়ার, টেবিল, উল্টোদিকে নিচু একটা ডিভান, তিনদিকের দেয়াল জুড়ে বইয়ের র‍্যাক ছাত পর্যন্ত উঠে গেছে। অসংখ্য বই, কিছু বইয়ের র‍্যাকে জায়গা হয়নি, তারা ডিভানের ওপরে স্থান পেয়েছে। মেঝেতে দাঁড় করানো দু'টো বাঁকুড়ার ঘোড়া, একপাশে একটা জাপানি সাউন্ড সিস্টেম, ক্যাবিনেটের ভেতর প্রচুর রেকর্ড, টেপ, সিডি। আদিত্য পায়ের কাবলি জুতোটা খুলে ডিভানের ওপর জায়গা করে নিয়ে পা তুলে আরাম করে বসল।

'কী ব্যাপার, দশ-পনের দিন তোর খবর নেই, মোবাইল অফ করে রেখেছিলি কেন?' এবার রান্নাঘরের অন্তরাল থেকে নারীকণ্ঠ শোনা গেল।'

'মোবাইলে পয়সা ফুরিয়ে গিয়েছিল। পকেটেও। আজ পয়সা ভরলাম।'

'মক্কেল পেয়েছিস নাকি?' বলতে বলতে যে মহিলা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তাঁকে সুন্দরী বলবার জন্য কষ্ট করতে হয় না। কিন্তু রূপ ছাড়াও তাঁর চেহারায় একটা সহজ ব্যাক্তিত্ব আছে। অচেনা আধচেনা লোক চট করে তার কাছে ঘেঁসতে সাহস পাবে না।

'আজ তুই রান্নাঘরে কেন? বিশেষ কেউ খাবে নাকি? আমি কিন্তু তাহলে কাটব।' আদিত্য শঙ্কিত গলায় বলল।

'কেউ খাবে না। তুই বোস। আমাদের কলেজের শিপ্রাদির বাড়িতে চিকেন বাগদাদি খেয়েছিলাম। রেসিপি নিয়ে আজ রাঁধছি। তুই এসে খুব ভালো হল। রাত্তিরে খেয়ে যাবি।'

'নিশ্চয় খাব। তবে এখন একটা ডিম-টিম কিছু ভেজে দে। ভয়ঙ্কর খিদে পেয়েছে। সারাদিন ভারচুয়ালি কিছু খাওয়াই হয়নি।'

'রত্না বলছিল তুই নাকি সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে চলে গেছিস।' বলতে বলতে এবার বাড়ির কর্তা ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। 'শুনে টুপলুর কী কান্না।'

কর্তা-গিন্নী দুজনেই আদিত্যর সহপাঠী। রত্না, পোশাকি নাম রত্নাবলী মিত্র, প্রেসিডেন্সিতে ইতিহাস পড়ত। গত এগারো বছর কলকাতার একটা নামজাদা মেয়েদের কলেজে মাস্টারি করছে। তার স্বামী অমিতাভ মিত্র, কলেজ থেকে আদিত্যর বুসুম বাডি, অধুনা দেশের প্রথিতযশা ঐতিহাসিকদের অন্যতম। বাংলা করে বলতে গেলে, অল্প বয়সেই বেজায় নাম করেছে। রত্না-অমিতাভ-টুপলুই আদিত্যর একমাত্র পরিবার, যদিও ভবঘুরে স্বভাবের জন্য সে সব সময় এবাড়িতে এসে উঠতে পারে না। রত্না উঠে পড়ল। আদিত্যর জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে গেল।

'শোন একটা দরকার আছে। ভুলে যাবার আগে বলে রাখি। তোদের হাউসিং সোসাইটিতে কাজ করত, সেই যে ছেলেটা, নাম বোধহয় বিমল না কি যেন, একবার আমাকে খুব হেল্প করেছিল। সে কি এখনও

আছে?'

'কে? বিমল গায়েন? না সে আর নেই। নতুন কমিটি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তবে আমার কাছে মাঝে মাঝে আসে। পঞ্চাশ-একশো টাকা নিয়ে যায়। কষ্টে আছে।'

'একটা মোবাইল নম্বর দিয়েছিল না?' রান্নাঘর থেকে রত্নার গলা শোনা গেল।'

'হ্যাঁ, দিয়েছিল বটে। কখনও ফোন করিনি। তুই করে দেখতে পারিস।' অমিতাভ বলল।

'ঠিক আছে।'

'নতুন কাজ পেলি?'

'একটা পেয়েছি। আজই পেলাম। বেশ ইন্টারেস্টিং। বিমলকে লাগবে। ভাবছি ক'টা দিন গা ঢাকা দেব।'

'ছদ্মবেশি গোয়েন্দা? দু'হাতে দু'টি উদ্যত পিস্তল, অপর হাতে টর্চ?'

'বলতে পারিস। তবে পিস্তল-টিস্তল নেই। একটা টর্চ খোঁজাখুঁজি করলে বেরোতেও পারে। নতুন গান-টান শুনলি?'

'এবার বম্বে গিয়ে সায়নি মুধোলকর বলে একটা বাচ্চা মেয়ের গান শুনলাম। আমাদের এক বন্ধুর বাড়িতে গাইল। গোয়ালিয়র, জয়পুর দুটো ঘরেই শিখেছে। বড় করে শুদ্ধ সারং গাইল, তারপর ছোট করে গৌড় সারং, বৃন্দাবনী সারং। বেশ গায়। তুই কিছু শুনলি?'

'আমি আর নতুন কী শুনব? সেই পুরোনো আমীর খাঁ, আলি আকবর, নিখিল। নতুন কিছু শোনার ইচ্ছে থাকলেও হয়ে ওঠে না। তুই বিমলের নম্বরটা দে।'

অমিতাভ নম্বর খুঁজতে ভেতরে গেল। রত্না প্লেটে একটা ডিমের পোচ, দুটো টোস্ট আর কিছু পটেটো চিপস নিয়ে এসেছে।

'এটা খেয়ে নে। চা হচ্ছে। বেশি দিলাম না, তাহলে রাত্তিরে খেতে পারবি না। তুই খা, আমি রান্নাটা দেখে আসি।'

আদিত্য খেতে খেতে বাঁ হাতে পকেট থেকে একটা সস্তার মোবাইল বার করল। তারপর পকেট হাতড়ে মন্টুবাবুর কার্ডটা। মন্টুবাবুর নম্বরটা লাগানোর কিছুক্ষণ পরে ওপাশ থেকে শব্দ শোনা গেল, 'হ্যালুউউউ'?

'আমি আদিত্য মজুমদার বলছি। কথা বলা যাবে? আশেপাশে কেউ আছে?'

'কেউ নেই। আমি আপিসে একা। বলুন।'

'ভেবে দেখলাম আপনার টেলিফোন রহস্য ভেদ করতে গেলে কিছুদিন আপনার বাড়িতে থাকতে হবে। বলাই বাহুল্য, ছদ্ম-পরিচয়ে। আপনার দূর সম্পর্কের ভাই-টাই কেউ আছে? যাকে আপনার স্ত্রী কখনও দেখেননি?'

ওপারে বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। লাইনটা কেটে গেল নাকি? আদিত্য গলা তুলে বলল,

'হ্যালো?'

'হ্যাঁ, একটু ভাবছিলাম। আমার দিকে তেমন কেউ নেই। তবে আমার মেয়ের এক দেওর আছে। ভিলাইতেই থাকে। আমরা কখনও দেখিনি। একবার বলেছিল কী একটা ট্রেনিং নিতে কলকাতায় আসবে। দিনকতক আমাদের বাড়িতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত আর আসেনি।'

'আপনার মেয়ের দেওর সাজতে গেলে মেয়ের শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে একটু জানতে হবে। কোনও ছবির এলবাম থাকলে পাঠিয়ে দেবেন। লোকগুলোকে চিনে নিতে হবে। শুধু আপনার মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকদের নয়। আপনার পাড়াপড়শিদের ছবিও দু'চারটে পাওয়া গেলে ভালো হয়।'

'এলবামগুলো বকুলের জিম্মায় থাকে। বার করে আনা মুস্কিল। দেখি কী করা যায়। কবে থেকে থাকতে চান?'

'সপ্তাহখানেক পর থেকে। হাতে দু'একটা কাজ আছে, সেরে আসতে হবে। আপনাকে দু'তিনদিন আগে জানাব। আপনি এখন থেকেই বাড়িতে একটু আভাস দিয়ে রাখুন।'

'ঠিক আছে। আমি দেখছি ছবির কী করতে পারি।'
'নমস্কার।'
'নমস্কার।'

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(১)

কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেলেও গরমটা কাটছে না। আকাশ এখনও মেঘলা। যেকোনও সময় আবার বৃষ্টি আসতে পারে। আদিত্য চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের সামনে বাস থেকে নেমে হাসপাতালের পাশের রাস্তায় ঢুকে পড়ল। সারি সারি ওষুধের দোকান, রুগিদের বাড়ির লোকজনের জটলা। একটু এগিয়ে একটা টেলিফোন বুথ। এই সাতসকালেই একজন ফোন করছে। আজকাল সকলেরই তো মোবাইল আছে, টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করে কারা? বুথের উল্টোদিকের ফুটপাথে কচুরির দোকান। মস্ত কড়ায় কচুরি ভাজছে। পাশে রসের কড়ায় জিলিপি। দোকানে প্রচণ্ড ভিড়। শালপাতায় কচুরি-তরকারি নিয়ে আদিত্য রাস্তার একধারে দাঁড়াল। চমৎকার বানিয়েছে। তবে অম্বলের সম্ভাবনাও প্রবল। কচুরির পর জিলিপি। তারপর চা। পাশেই চায়ের দোকান। চায়ে চুমুক লাগাতে লাগাতে আদিত্য গুনে দেখল সে এখানে দাঁড়ানোর পর থেকে আরও চারজন লোক টেলিফোন বুথ ব্যবহার করেছে। তবে কেউই খুব বেশি সময়ের জন্য নয়। চা শেষ করে আদিত্য পুবদিকে হাঁটতে লাগল। ঘিঞ্জি রাস্তা সাপের মতো এঁকেবেঁকে রেল লাইন পর্যন্ত পৌঁছেছে। চারদিকে দিন শুরুর ব্যস্ততা। আদিত্যর মনে পড়ল জীবনানন্দের সেই পংক্তি, 'মানুষের ঘন বসতির ভিড় নিরুত্তেজ রোদের ভিতরে/ ছড়ায়ে রয়েছে প্রাচী, অবাচীর, উদীচীর দিকে'। এখন অবশ্য নিরুত্তেজ বা তেজি কোনও রোদই নেই। বরং যেকোনও মুহূর্তে আবার বৃষ্টি নামার সম্ভাবনা।

আর একটু এগোতে সত্যি সত্যিই বৃষ্টি নামল। বেশ বড় বড় ফোঁটা। আদিত্যর সঙ্গে ছাতা নেই। সে দ্রুত পায়ে হেঁটে, খানিকটা দৌড়ে, একটা আধা তৈরি হওয়া বাড়ির ভেতর আশ্রয় নিল। বাড়ির বাইরের কাঠামোটা শুধু উঠেছে, ভেতরটা প্রায় ফাঁকা। মনে হয় বেশ কিছুদিন কাজকর্ম বন্ধ আছে। এখানে ওখানে রাবিশ, জঞ্জাল। একতলার এককোণে একটা ইঁট বার করা ঘর। বোধহয় একসময় ওভারশিয়ারবাবু এই ঘরে বসে কুলিদের মাইনেপত্র দিতেন, কাজের হিসেব রাখতেন। এখন ঘরটা ফাঁকা। বাইরে বৃষ্টিটা আরও জাঁকিয়ে এল। আদিত্য পায়ে পায়ে বাড়ির ভেতরে আর একটু এগিয়ে গিয়ে দেখল, দু'টো অল্পবয়সি ছেলে স্তূপীকৃত জঞ্জালের ওপর জবুথবু হয়ে বসে আছে। আদিত্যকে এগিয়ে আসতে দেখে তাদের একজন ঘোলাটে চোখ তুলে তাকাল। দৃষ্টিতে প্রাণ নেই। অন্যজনের মাথা এখনও নোয়ানো।

হঠাৎ তাদের পেছন থেকে আবির্ভূত হলেন এক বলিষ্ঠ চেহারার মহিলা যাকে মহিলা না বলে মেয়েমানুষ বলাটাই সমীচীন। নিকষ কালো রঙ, বেশ লম্বা-চওড়া, পরনে ক্যাটক্যাটে হলুদ রঙের স্লিভলেস চুড়িদার। বাহুতে শৈশবের টিকে ওঠা দাগের ওপর সোনার মাদুলি। পানের রস ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে গলে থুতনিতে নেমেছে।

'ক্যা কাম হ্যায়? কী চাই?' খ্যানখ্যানে গলায় মেয়েমানুষটি বলল।

'কাম কুছ নেহি হ্যায়। বৃষ্টির জন্য আটকে গেছি।' আদিত্য মিনমিনে গলায় বলল।

'অন্দর কিঁউ ঘুসা? আপনা বাপকা মকান সমঝা ক্যা?'

অপমানে আদিত্যর কানদু'টো ঝাঁঝাঁ করে উঠল। কিন্তু উত্তর দেবার আগেই মেয়েমানুষটা চেঁচিয়ে উঠল, 'আব্দুল, এ আব্দুল। এক সালা জাসুসকা বচ্চা অন্দর ঘুস আয়া। তু আকে দেখ।'

ডাক শুনে বাড়ির পেছন দিক থেকে মাঝারি উচ্চতার এক ব্যক্তি বেরিয়ে এল। সঙ্গে আর একজন। আদিত্য মনে মনে ঠিক করে নিল প্রথমজনই আব্দুল। আব্দুল আদিত্যকে অনেকক্ষণ জরিপ করল। তারপর ঠান্ডা গলায় বলল, 'এখানে কী দরকার?'

'বৃষ্টিতে আটকে পড়েছি ভাই।' আদিত্য নিরীহ গলায় বলল।

'আপনাকে আগে তো পাড়ায় দেখিনি। কোথায় যাবেন?'

'হিঙ্গন জমাদার লেন। লাইনের ওপারে।'

'কত নম্বরে যাবেন? কার বাড়ি?'

'সাতাশ নম্বরে, মন্টুবাবুর বাড়ি। আমি ওর মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোক। ভিলাইতে থাকি।'

আব্দুল কিছুক্ষণ ভাবল। আরও একবার আদিত্যকে জরিপ করে নিল। তারপর বলল, 'সোজা চলে যান। এ পাড়াটা ভালো নয়। যেখানে সেখানে ঢুকবেন না। একটা রেল লাইন পেরিয়ে আর একটা রেল লাইনের গায়েই হিঙ্গন জমাদার লেন।' আব্দুলের গলাটা প্রায় ভদ্র শোনাল।

বৃষ্টি এখনও সমানভাবে ঝরে যাচ্ছে। এখন বেরোলে একেবারে ভিজে যেতে হবে। তবু এই ঝুট-ঝামেলার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে বেরিয়ে পড়াই ভালো। রাস্তার দিকে এগোতে এগোতে আদিত্য আড়চোখে দেখল, পাথরের মতো বসে থাকা ছেলে দু'টোর একজন মেঝেতে শুয়ে পড়েছে। তার মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে। মরে-টরে যাবে না তো? আদিত্য একবার ভাবল দাঁড়িয়ে গিয়ে ছেলেটাকে সাহায্য করে। পরমুহূর্তেই তার মনে হল এখানে দাঁড়িয়ে গেলে বিপদ আছে। এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে ছেলে দু'টো ড্রাগ নিয়েছে। আর যে অর্ধনির্মিত বাড়িটাতে সে ঘটনাচক্রে ঢুকে পড়েছে সেটা ড্রাগ ব্যবসায়ীদের একটা গোপন আস্তানা। খুব গোপন অবশ্য নয়। প্রায় রাস্তার ওপরেই খোলাখুলি ড্রাগের ব্যাবসা চলছে। আশ্চর্য। আদিত্য বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়ল। খানিকটা এগিয়ে পিছন দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল আব্দুল ও তার সাথী সেই বাড়িটার ভেতর থেকে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

(২)

একটু আগে মন্টুবাবুর লোক এসে একটা খাম দিয়ে গেছে। খামের ভেতর দু'টো পুরোনো ছবি আর একটা চিঠি। একটা ছবিতে শিশু কোলে একটি পৃথুলা যুবতী। অন্য ছবিতে জনা কয়েক পুরুষ ও মহিলা একটা নদীর ধারে সার বেঁধে খেতে বসেছে। চিঠিতে মন্টুবাবু লিখেছেন,

মাননীয় আদিত্যবাবু,

আপনার কথামতো দু'টি ছবি পাঠালাম। একটি ছবি চড়ুইভাতির। বিয়ের আগে বকুল পরিবারের সকলের সঙ্গে কোলাঘাটে পিকনিক করতে গেছিল, এটা সেই সময় তোলা। পিকনিকে পাড়ার কয়েকজনও ছিল। এটা একটা পুরোনো ব্যাগের মধ্যে অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে পেলাম। ছবিতে বাঁদিক থেকে তিন নম্বর ব্যক্তি আমার ছোট শ্যালক দেবীরঞ্জন, তার ডান পাশে সুশান্ত এবং সুশান্তর ডানপাশে বকুল। লাইনের একেবারে শেষে বকুলের বড়দা রজনীরঞ্জন। দ্বিতীয় ছবিটা আমার কন্যা সুলতার। কোলে আমার নাতি। ছবিটা নাতির অন্নপ্রাশনের সময় তোলা। আমি গিয়ে উঠতে পারিনি, তাই ছবি তুলে পাঠিয়ে দিয়েছিল। বকুলকে বলেছি আমার মেয়ের দেওর ভিলাই থেকে আসছে। ক'টা দিন থাকবে। বকুল সহজভাবেই নিয়েছে। কুশল জানবেন। কবে আসছেন কয়েকদিন আগে জানালে ভালো হয়।

ইতি

জিতেন্দ্রনাথ দত্ত (মন্টুবাবু)

(৩)

'আমাকে ডেকেছিলেন স্যার?' অফিসের দরজাটা ঈষৎ ফাঁক করে বিমল উঁকি মারল।

'হ্যাঁ, তোমার বন্ধুর মোবাইলে ফোন করেছিলাম। বোসো।'

'বন্ধু নয় স্যার, আমার ইস্ত্রির দাদা। ওকে ফোন করে দিলে আমি খবর পেয়ে যাই।' বিমল বসতে বসতে বলল।

'ইস্ত্রির দাদা? তোমার বিয়ে হয়ে গেছে নাকি?'

'সে কি আজকে স্যার? গোঁফ ওঠার আগেই বাবা বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন।'

'ছেলেপুলে? তাও আছে?'

'তা স্যার বিয়ে হলে তো ছেলেপুলে হওয়াটাই দস্তুর। আমারও হয়েছে পছন্দসই দু'পিস। একটা ছেলে, একটা মেয়ে।'

'তাহলে তো তোমার সুখের সংসার।'

'তা আপনাদের আশীর্বাদে সংসারে সুখের অভাব নেই। তবে কিনা মাঝে মধ্যে ডাল-ভাতের অভাব হয়। এখন যেমন অভাব চলছে। মাস ছ'য়েক হয়ে গেল চাকরিটা চলে গেছে স্যার।'

'চলছে কী করে?'

'এই টুকটাক কাজ করে চালাচ্ছি স্যার। গিন্নিকেও একটু আধটু সেলাই-ফোঁড়াই-এর কাজ করতে হয়।'

'শোনো, তোমার জন্য একটা কাজ আছে। টিকটিকির কাজ। আগে যেমন দু'একবার করে দিয়েছ। পারবে?'

'নিশ্চয় পারব স্যার। ব্যাপারটা বলুন।'

আদিত্য পিকনিকের ছবিটা বিমলের হাতে দিল।

'ছবির বাঁ দিক থেকে তিন এবং চার নম্বরের ওপর নজর রাখতে হবে। তিন নম্বরের নাম দেবীরঞ্জন বসাক, চার নম্বর সুশান্ত হালদার। তারা কোথায় যায়, কী করে সব জানাবে। তবে খুব সাবধানে কাজ করতে হবে। দুজনেই জেল-ফেরত দাগি আসামি। সঙ্গে অস্ত্র-টস্ত্র থাকাও বিচিত্র নয়।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার। শুধু বলুন ওরা থাকে কোথায়।'

'চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের গা দিয়ে যে রাস্তাটা এঁকেবেঁকে রেল লাইন অব্দি চলে গেছে সেটা পেরিয়ে আর একটা রেল লাইন। এই দ্বিতীয় রেল লাইনটার ধারে এদের সাইবার কাফে। চেনা খুব সোজা। আমি একবার গিয়ে দেখে এসেছি। ও-চত্বরে আর কোনও সাইবার কাফে নেই। এই কাগজটা রাখ। এতে নাম ঠিকানা সব লেখা আছে।'

'রাখছি স্যার, তবে ও আমার লাগবে না। একবার শুনলেই সব মনে থাকে।'

'ছবিটার একটা কপি করবে। আজকাল ডিজিটাল ফটোর দোকান হয়েছে। বউবাজারেই দু'চারটে আছে। ওখানে গেলেই কপি করে দেবে। কপিটা নিজের কাছে রেখে আসলটা আমাকে ফেরত দিয়ে যাবে। আর একটা কথা। মেডিকেল কলেজের উল্টোদিকে আরপুলি লেনে মন্টুবাবুর প্রেস। মন্টুবাবু এবং তার প্রেস সম্বন্ধে যাবতীয় খবর জোগাড় করবে।'

'ঠিক আছে স্যার। আজ উঠি?'

'দাঁড়াও। এই টাকাটা নাও। দু'হাজার আছে। তোমার অ্যাডভান্স। আর এই নাও আরও একশো টাকা। ছবি কপি করার খরচ।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। খুব উপকার হল স্যার।'

বিমলের চোখ দু'টো কৃতজ্ঞতায় চিকচিক করে উঠল।

(৪)

আজকাল লালবাজারে ঢোকার নানান হ্যাপা। ঢোকার মুখে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আগে মোবাইল জমা রাখতে হবে। তারপর কম্পিউটারে নাম এন্ট্রি। বলতে হবে কোন ডিপার্টমেন্টে যেতে চাই। কেন যেতে চাই। যার কাছে যেতে চাই তার অনুমতি আছে কিনা। আগে কয়েকবার এইভাবেই আদিত্যকে ঢুকতে হয়েছে, তাই আদিত্য জানে। ইদানীং অবশ্য অত সব কিছু করতে হয় না। আদিত্যর কলেজের সহপাঠী গৌতম

দাশগুপ্ত, জাঁদরেল আইপিএস অফিসার, কয়েক বছর হল জেলা থেকে বদলি হয়ে লালবাজারে এসেছে। আদিত্য মাঝে মাঝেই গৌতমের কাছে সাহায্যের জন্য আসে। গৌতম গেটে বলে রেখেছিল। আদিত্য নাম বলতেই গেটের পুলিশ মহা খাতির করে তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিল। একজন সাদা পোশাকের পুলিশকে বলল, 'স্যারকে দোতলায় পৌঁছে দিয়ে এস।'

দোতলায় ওয়েটিং রুম, এয়ার কন্ডিশন চলছে। কয়েকজন বসে রয়েছে, আদিত্য একপাশে গিয়ে বসল। সেন্টার টেবিলে কয়েকটা ম্যাগাজিন, খবর কাগজ। লালবাজারের ভেতরে এমন একটা ঘর আছে সে-ই কি আগে জানত? বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। মিনিট দু'তিন পরেই একজন লম্বা-চওড়া অবাঙালি লোক, সে-ও নিশ্চয় পুলিশ, দরজার গোড়ায় এসে বলল, আদিত্য মজুমদার কে আছেন, স্যার ডাকছেন।

দরজার বাইরে পেতলের ফলকে লেখা গৌতম দাশগুপ্ত, আইপিএস, জয়েন্ট কমিশনার, ক্রাইম। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে না ঢুকতেই গৌতমের গমগমে গলা শোনা গেল, 'আয়, আয়, কোথায় ডুব মেরেছিলি?'

কলেজে পড়ার সময় গৌতম চোখ বুজে খুব ভাব-টাব দিয়ে জর্জ বিশ্বাসের স্টাইলে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইত। তখন কে ভেবেছিল সে পুলিশ হবে?

মস্ত বড় ঘর। তার সঙ্গে মানানসই টেবিল। টেবিলে গোটা চারেক টেলিফোন। ডানদিকের দেয়ালে সাহেবি আমলের পুলিশ কর্তাদের ছবি। বাঁ দিকের দেয়ালে দিশি কর্তাদের। আদিত্য লক্ষ করেছে, ডানদিকে সাহেবদের ছবিগুলোর মধ্যে একজন দিশি লোকের ছবিও আছে।

'তুই আমাকে না দেখলেও তোকে আমি মাঝেমাঝেই টিভিতে দেখি।' আদিত্য বসতে বসতে বলল। 'তোর চেহারাটা কিন্তু দিন দিন ভারিক্কি হচ্ছে।'

'তুই আগের মতোই রয়ে গেলি। রোগা, টাফ। শরীরচর্চা করিস এখনও?'

'খানিকটা করি। বাকিটা বাসে-ট্রামে যাতায়াত করলেই হয়ে যায়।'

'তোর সমস্যাটা বল। টেলিফোনে বললি বলতে সময় লাগবে। তোর জন্য একঘণ্টা রেখেছি। সাড়ে চারটেয় মিটিং আছে। চা খাবি তো?'

গৌতম বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকল। যখন টি ব্যাগ সহ দু'কাপ গরম জল এসে পৌঁছল, ততক্ষণে আদিত্য তার সমস্যার কথা বলতে শুরু করেছে।

গৌতম আদিত্যর কথাগুলো ভীষণ মন দিয়ে শুনছে। এত মন দিয়ে আগে কখনও শুনেছে কিনা আদিত্যর মনে পড়ছে না। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে ঘড়িতে সোয়া চারটে বেজে গেল।

আদিত্য বলছিল, 'তুই দেবী বসাক আর সুশান্ত হালদারের পুলিশ রেকর্ডটা একটু বার করে দে। কবে জেলে গিয়েছিল, কী দুষ্কর্ম করেছিল সব জানতে হবে। আর ওই আধা তৈরি হওয়া বাড়িটার ওপর নজর রাখতে পারিস। আমি শিওর ওখানে ড্রাগের একটা ঠেক আছে। তবে এখখুনি কাউকে অ্যারেস্ট করলে আমি একটু ঝামেলায় পড়ব। আমাকে ওই পাড়ায় কিছুদিন কাটাতে হবে। আমার মুখ ওরা নিশ্চয় চিনে রেখেছে।'

এতক্ষণ পরে গৌতম মুখ খুলল, 'তোর এই কেসটাতে আমাদের বিশেষ ইন্টারেস্ট আছে। সত্যি বলতে কি, তোর গল্পের অনেকটাই আমাদের আগে থেকে জানা। তবে অন্যদিক থেকে শোনারও একটা দাম আছে। দাঁড়া, আর একবার চা বলি। তারপর আমাদের দিকটা তোকে বলছি।'

গৌতম একটা লাল রঙের ফোন তুলে বলল, 'উপাধ্যায় সাহেব, মিটিংটা আধঘণ্টা পেছাতে হবে। খুব জরুরি কাজে আটকে গেছি। বাইরের কেউ তো আসছে না। আপনি ইন্টারনাল সকলকে জানিয়ে দিন।' বেয়ারা আবার চা দিয়ে গেল। এবার আর টি-ব্যাগ নয়। টিপটে চা, চিনি দুধ আলাদা। চায়ে একটা লম্বা চুমুক লাগিয়ে গৌতম বলতে শুরু করল :

'গোবরার ওই অঞ্চলটার ওপর অনেকদিন পুলিশের নজর আছে। ওখানে যে ড্রাগ পাচারের একটা হাব আছে অনেকদিন ধরেই আমরা সেটা টের পাচ্ছিলাম। কিন্তু ওখানকার লোকাল থানার যিনি কর্তা ছিলেন, তিনি বিশেষ সুবিধের লোক ছিলেন না। আমাদের কাছে পরিষ্কার খবর ছিল ড্রাগ মাফিয়ারা তার জন্য একটা

মোটা মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিয়েছে, ফলে ড্রাগ ট্র্যাফিকিং আটকানোর ব্যাপারে দারোগা সাহেবের খুব একটা উৎসাহ নেই। আমাদের দু'-দু'জন ইনফরমার খুন হল। ওই অঞ্চলে যে ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্কটা তৈরি হয়েছিল সেটাও সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ার উপক্রম হল। এটা বছর ছয়েক আগেকার কথা বলছি। আমি তখনও এই চেয়ারে আসিনি। দারোগা সাহেবের খুঁটির জোর ছিল তাই তাকে অন্য থানায় বদলি করাটা সহজ কাজ ছিল না। শেষ পর্যন্ত আমার পূর্বসূরি অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে একেবারে ওপরমহলে ধরাধরি করে সেই অতি কঠিন কাজটা সম্পন্ন করলেন।'

'তারপর?'

'থানার বড়বাবু হয়ে নতুন যিনি এলেন, সেই বাসুদেব কানুনগো, চমৎকার অফিসার। অ্যাওয়ার্ড পাওয়া। আসার বছরখানেকের মধ্যেই তিনি আবার একটা ইনফর্মেশন নেটওয়ার্ক গড়ে তুললেন, কয়েকটা চুনোপুঁটিকে জেলেও ভরা হল, তারপর রাঘব বোয়ালটিকে ধরার জন্য জাল পাতা হল। তখন আমি এখানে এসে গেছি। আমাদের সব থেকে বড় অসুবিধে ছিল এই যে, দলের পাণ্ডা কে বা কারা সে ব্যাপারে আমাদের কোনও ধারণাই ছিল না। অনেকটাই অন্ধকারে ঢিল ছোড়া। তবে আমরা জানতাম মেঘের আড়ালে মেঘনাদ যিনিই হোন, তিনি কাছেপিঠেই কোথাও থাকেন।'

'ভেরি ইন্টারেস্টিং। তারপর কী হল?'

'আমাদের পাতা জালে দেবী বসাক আর সুশান্ত ধরা পড়ল। আমরা ভাবলাম পেয়ে গেছি আমাদের আসল লোকদের। কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের ভুল ভাঙল। যাদের ধরেছি তারা নেহাতই চুনোপুঁটি। আসল লোক বাইরে রয়ে গেছে। ফলে ড্রাগ পাচার আগের মতই চলছে। লাভের মধ্যে, আবার আমাদের একজন ইনফর্মার খুন হল। তাছাড়া বোঝার ওপর শাকের আঁটি, দেবী এবং সুশান্তর বিরুদ্ধে তেমন জোরাল প্রমাণ জোগাড় করা গেল না। নানান অছিলায় ওদের দু'বছর লক-আপে আটকে রাখলাম, কিন্তু তারপর তারা আদালতে বেল পেয়ে গেল। এখনও বেলেই আছে, কেস উঠলে কী হবে জানি না। আমাদের জুডিশিয়াল সিস্টেমের হাল জানিস তো।'

একটুক্ষণ চুপ করে রইল গৌতম। তারপর বলল, 'দেবী আর সুশান্ত যখন জেলে অথচ ড্রাগের ব্যবসা পুরোদমেই চলছে, সেই সময় আব্দুল আজিজ বলে এক ব্যক্তির কথা আমরা জানতে পারলাম। খবর পেলাম, দেবী-সুশান্তর অনুপস্থিতিতে তার ওপরেই সাম্রাজ্য চালানোর ভার পড়েছে। তবে নানা ঘটনা থেকে এটা স্পষ্ট হল যে সে নিজে পালের গোদা নয়। অন্তরীক্ষ থেকে কেউ তাকে চালাচ্ছে। আব্দুলকে তুই দেখেছিস। যে বাড়িটায় তুই ঘটনাচক্রে ঢুকে পড়েছিলি আব্দুল সেটার কেয়ারটেকার। বাড়িটার ওপর পুলিশের নজর আছে। কিন্তু বার কয়েক রেড করেও তেমন ইনক্রিমিনেটিং কিছু পাওয়া যায়নি। শুধু দু'চারটে ড্রাগ অ্যাডিক্টি ছোকরা ধরা পড়েছে। বাড়ির ভেতরে নেশা করে বসেছিল, ঠিক তুই যেমন দেখেছিলি। বাড়ির মালিক মহম্মদ আসলাম দুবাইতে থাকে, আপাতত আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। তবে তার সম্বন্ধে অনেক কথাই আমরা জানি। এক সময় সে ওই অঞ্চলের ড্রাগ ডিলারদের মাথা ছিল। তারপর চারদিকের হাওয়া খুব গরম হয়ে গেলে সে দুবাই পালিয়ে যায়। আর ফিরে আসেনি। অবশ্য কেন সে বাড়িটা আধখানা তৈরি করে ফেলে রেখেছে সেটা আমাদের জানা নেই। সে যাই হোক, এবার আসল কথায় আসি।'

গৌতম পকেট থেকে একটা কৌটো বার করে একটা লবঙ্গ মুখে ফেলল। আদিত্যকেও একটা দিল। আদিত্যর মনে পড়ল গৌতম সিগারেট ছাড়ার চেষ্টা করছে।

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। দেবী-সুশান্ত লক-আপ থেকে বেরোনোর পর আমাদের স্ট্র্যাটেজি ছিল তাদের ওপর কড়া নজর রাখা। আশা, তাদের মধ্যে দিয়ে আসল লোকের কাছে পৌঁছে যেতে পারব। নজর রাখার কাজটা ইন্সপেক্টর কানুনগো ভালোই করছিলেন। মাঝে মাঝে তাদের এবং আব্দুলকে আলাদা আলাদা করে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হচ্ছিল। এই সময় একদিন ইন্সপেক্টর কানুনগো আমাকে ফোন করলেন। খুব উত্তেজিত।

বললেন, 'একটা খুব দরকারি লিড পেয়েছি স্যার। মনে হচ্ছে কিছুদিনের মধ্যেই পালের গোদাটাকে ধরে ফেলতে পারব। এখনই কিছু বলছি না, কারণ আমার ধারণাটা এখনও খানিকটা অনুমান-নির্ভর'।'

গৌতম খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর থেমে থেমে বলল,

'এর কয়েকদিন পরে ট্রেন লাইনের ধারে ইন্সপেক্টর কানুনগোর গলা কাটা লাসটা পাওয়া যায়।'

ঘরে নিস্তব্ধতা। লালবাজারের এই ভেতর মহলে বহির্বিশ্বের কোলাহল খুব একটা পৌঁছয় না। শুধু একটা দেয়াল ঘড়ি টিকটিক করছে। কিছুটা জিরিয়ে নিয়ে গৌতম আবার বলতে শুরু করল,

'কানুনগো ঠিক কী লিড পেয়েছিল, কতটা এগিয়েছিল, কিছুই আমাদের জানা নেই। তার বাড়ি থেকে একটা পকেট ডায়েরি পাওয়া গেছে। কিন্তু তাতে কাজের কিছু আছে বলে মনে হয় না। শুধু লাল দাগ দেওয়া একটা টেলিফোন নম্বর আছে। আর পুরোনো ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট একটা ছবি ডায়েরির মধ্যে ছিল। আমার মনে হচ্ছিল নম্বরটা থেকে হয়ত কোনও লিড পাওয়া গেলেও যেতে পারে।'

গৌতম ড্রয়ারের ভেতর থেকে একটা খাম নিয়ে তার থেকে একটা ছোট ছবি বার করে আদিত্যর হাতে দিল। বছর পঁচিশেকের এক অচেনা যুবতীর ছবি। একটু মোটার দিকে গড়ন। বারান্দার রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আদিত্য অনেকক্ষণ ধরে ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইল। নিঃসন্দেহে একে আদিত্য কোনোদিন দেখেনি। তবু কোথাও একটা অস্বস্তি থেকে যাচ্ছে। ছবিটা কিছু একটা বার্তা দিচ্ছে যেটা সে ধরতে পারছে না।

'কীরে, ছবি দেখে প্রেমে পড়ে গেলি নাকি?' গৌতম খাম থেকে একটা চিরকুট বার করেছে। চিরকুটটা আদিত্যর হাতে দিয়ে গৌতম বলল, 'এই নম্বরটাই কানুনগোর ডায়েরি থেকে পাওয়া গেছে। নম্বরটা লিখে রাখ। পরে কাজে লাগতে পারে।'

কাগজটার দিকে তাকিয়ে এবার আদিত্যর শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। নম্বরটা মন্টুবাবুর বাড়ির। যে নম্বরে ভূতুড়ে টেলিফোন আসে।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(১)

আমহার্স্ট স্ট্রীট, যার এখন নাম হয়েছে রামমোহন সরণি, যেখানে হ্যারিসন রোড অর্থাৎ অধুনা মহাত্মা গান্ধী রোড-এর সঙ্গে এসে মিশেছে তার খুব কাছে, একটা ছোট গলির মধ্যে শঙ্কর হোটেল। নামে হোটেল হলেও আসলে এটা আধা হোটেল, আধা মেসবাড়ি। তিনতলা বাড়িটার একতলায় বিচিত্র সব বিপণীর সমাহার—জামাকাপড়ের শোরুম, জুতোর আড়ত, ইলেকট্রিকাল গুডস-এর দোকান, সাবেকি মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, এমনকি একটা জ্যোতিষীর আপিসও আছে। দোতলায় হোটেল। মূলত শেয়ালদা স্টেশন দিয়ে মফস্বল থেকে কলকাতায় কাজে আসা মানুষ, যাদের তেমন ট্যাঁকের জোর নেই, দু'চারদিনের জন্য এখানে থেকে যায়। হোটেলটা চলে ভালো, বিশেষ করে এই কারণে যে, হোটেলের পাচক ভানু ঠাকুরের রান্নার খ্যাতি আছে। অল্প তেল-মশলায় চমৎকার ডাল-তরকারি-মাছের ঝোল নাকি ভানু ঠাকুরের মতো কম লোকই রাঁধতে পারে।

তিনতলায় মেসবড়ি। থ্রি-সিটার, টু-সিটার এবং সিঙ্গল রুম তিন রকম ব্যবস্থাই আছে। আদিত্য তিনতলার এক কোনায় একা একটা ঘর নিয়ে থাকে, বাথরুমটাও তার নিজস্ব। এর জন্য তাকে মাসে মাসে কিছু বেশি টাকা গুনতে হয়, এবং সেই টাকা দিতে মাঝেমধ্যে অসুবিধেও হয়, কিন্তু তার খানদানি রক্ত এর নীচে নামতে নারাজ। বারান্দার একদিকে একটা এজমালি খাবার ঘর আছে, সকাল ও রাত্তিরের ভাত সেখানেই পরিবেশিত হয়। খাবার আসে দোতলায় ভানু ঠাকুরের হেঁসেল থেকে। সপ্তাহে একবার খাদ্যতালিকায় মুরগি দেখা যায়, মাসের শেষ রবিবার পাঁঠার মাংস। জলখাবারের ব্যবস্থা যে যার নিজের দায়িত্ব, তবে মেসের চাকর বলরামকে একটা সামান্য মাসোহারা দিলে সে রাস্তার উল্টোদিকের দোকান থেকে ভোরবেলার চা-বিস্কুট ঘরে পৌঁছে দেয় আর রোববারে টোস্ট-মামলেট কিংবা সিঙ্গাড়া-জিলিপি।

সকাল সাড়ে-নটায় বিমলের ফোন এল, 'আপনি কি বাড়িতে আছেন স্যার? কিছু খবর দেবার ছিল। ফোনে অত কথা বলা যাবে না।' আধঘণ্টার মধ্যে বিমল সশরীরে হাজির।

'ব্যাপার কি? এত কাহিল দেখাচ্ছে কেন?'

'সেই ভোরবেলা বেরিয়েছি স্যার। একটু চা খাওয়াবেন?'

আদিত্য ঘর থেকে বেরিয়ে বলরামকে চা-জলখাবারের কথা বলে এল। বাইরে চড়া রোদ্দুর উঠেছে। আদিত্যর ঘরটা তিনতলায় বলে ছাদের গরমে তাড়াতাড়ি তেতে ওঠে। তবু জানলা দু'টো বন্ধ করে দিলে খানিকটা ঠাণ্ডা। আদিত্য জানলা বন্ধ করতে গিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। আকাশে গোটা কয়েক ঘুড়ি উড়ছে। আজকাল শহরের দক্ষিণ বা পুবদিকে ঘুড়ি তো দেখাই যায় না। তবু এই উত্তর-মধ্য কলকাতায় দু'চারজন এখনও ঘুড়ি ওড়ায়। আদিত্য ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে অনেক ঘুড়ি উড়িয়েছে, বাড়িতে মাঞ্জাও দিয়েছে। বিশ্বকর্মা পুজো কতদিন দেরি?

'মন্টুবাবুর প্রেসে গিয়েছিলাম স্যার।' চেয়ারে পা ছড়িয়ে বসে বিমল একটু ধাতস্থ হয়েছে। ঘরে একটাই চেয়ার। আদিত্য দেয়ালে ঠেশ দিয়ে খাটের ওপর আরাম করে বসল।

'মন্টুবাবুর প্রেসে গিয়ে বললাম, একটা স্যুভেনির ছাপাতে চাই। ভাগিয়ে দিচ্ছিল স্যার। বলল, এখানে ওসব ছোটখাট কাজ হয় না। দেখলাম সত্যিই মোটা মোটা টেস্ট পেপার, নোটবই, গল্প-উপন্যাস এইসব ছাপা হচ্ছে। ভাবছি কী করব এমন সময়, কী বলব স্যার, আশ্চর্য কপাল, আমাদের পাড়ার গোপীনাথবাবুর শালার সঙ্গে দেখা। উনি ওই প্রেসেই অ্যাকাউন্টস-এ কাজ করেন। গোপীনাথবাবুর ছেলের বিয়ের সময় আমার সঙ্গে খুব আলাপ জমেছিল। আমাকে দেখে খুব খুশি। বললেন, দু'পা এগিয়ে মোড়ের কাছে একটা ছোট প্রেস আছে, ওরা স্যুভেনির-টুভেনির ছাপে। তারপর বললেন, চলুন চা খেয়ে আসি।'

'শালাবাবু বেজায় গপ্পে লোক। চা খেতে খেতে অনেক কথা বলে গেলেন। সবটা আপনার কাজে লাগবে না। শুধু মন্টুবাবুর সম্বন্ধে যেটুকু বললেন সেটুকু বলছি। শালাবাবু আগেও দু'একটা প্রেসে কাজ করেছেন। কিন্তু তাদের তুলনায় মন্টুবাবুর প্রেসটা অনেক বড়। তাছাড়া, শালাবাবুর মতে মন্টুবাবুর মতো মালিক হয় না। এত বছর চাকরি হল, কখনও মাইনে পেতে দেরি হয়নি। প্রেসের লাইনে কটা প্রেস মন্টুবাবুর মতো নিয়মিত মাইনে দিতে পারে? আসলে, প্রেসের ব্যবসায় বড় বড় পেমেন্ট অনেক সময়েই আটকে যায়। আর পেমেন্ট আটকে গেলে কর্মচারীদের মাইনেও আটকে যায়। কখনও একমাস, কখনও বা তিনমাস। মালিক কি আর ঘরের টাকা থেকে ওয়ার্কারদের মাইনে দেবে? মন্টুবাবুরও যে মাঝেমধ্যে পাওনা টাকা আটকে যায় না তা নয়। অ্যাকাউন্টস-এর লোক হিসেবে শালাবাবু এটা ভালোই জানেন। কিন্তু মন্টুবাবু কখনও এর জন্য কর্মচারীদের মাইনের টাকা ফেলে রাখেন না। এই কারণে কেউ চট করে মন্টুবাবুর কাজ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যায় না। শালাবাবুর মাঝে মাঝে মনে হয়, টাকাপয়সা ম্যানেজ করার ব্যাপারে মন্টুবাবু যেন যাদুকর। ব্যবসায় সাময়িকভাবে টাকার টানাটানি হলে পাকা যাদুকরের মতো কোনও যাদুর থলি থেকে টাকা বার করে সব সামলে দেন।

মন্টুবাবুর প্রেসে নিয়মিত নতুন যন্ত্রপাতি আসে। একেবারে আধুনিক যন্ত্রপাতি। ছাপার লাইনে আজকাল সর্বত্রই কম্পিউটার ঢুকেছে। কিন্তু মন্টুবাবু ছাপার কাজে কম্পিউটার এনেছেন অন্তত পনেরো বছর আগে। কারোর চাকরি যায়নি। যত্ন করে সকলকে কম্পিউটার ট্রেনিং করিয়েছেন। দু'একজন যারা নেহাতই শিখতে পারেনি তাদের প্রেসের মধ্যেই অন্য কাজ দিয়েছেন।

এককথায়, মন্টুবাবুকে তাঁর কর্মচারীরা দেবতার মতো ভক্তি করে, আবার ভালোও বাসে। মন্টুবাবুর প্রথম স্ত্রীকেও কর্মচারীরা খুব ভক্তি করত। তিনি অবশ্য মাত্রই কয়েকবার প্রেসে এসেছেন। তাঁর শরীর ভাল থাকত না। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি অপঘাত মৃত্যুতে তিনি চলে যাবেন কর্মচারীরা কেউ ভাবেনি।'

'কী বললে? মন্টুবাবুর প্রথম স্ত্রীর অপঘাত মৃত্যু হয়েছিল?' আদিত্য এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। মাঝে মাঝে নোটও নিচ্ছিল। প্রশ্নটা অজান্তেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'শালাবাবু তাই তো বললেন। মন্টুবাবু স্ত্রী-কন্যা নিয়ে দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে পাড়ারও কেউ কেউ ছিলেন। মন্টুবাবুর স্ত্রী পাহাড় থেকে পা পিছলে খাদে পড়ে যান এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়া যায়নি। এর কিছুদিন পরেই মন্টুবাবু আবার বিয়ে করেন।'

'হুঁ, ইন্টারেস্টিং। তা মালিকের দ্বিতীয় পক্ষ নিয়ে কী শুনলে?'

'দ্বিতীয় পক্ষকে কর্মচারীরা খুব বেশি চেনে না। একবার মাত্র দেখেছে। মনে হয়, দ্বিতীয় বিয়েটা মন্টুবাবু কিছুটা চুপিসাড়েই করেছিলেন। ফলে খবরটা প্রেসে পৌঁছতে খানিকটা সময় লেগেছিল। খবরটা পেয়ে সকলেই একটু অবাক হয়েছিল। একটু দুঃখও পেয়েছিল। মন্টুবাবুর প্রথম স্ত্রীকে সকলেই ভালবাসত। বুড়োবয়সে আবার বিয়ে করাটা সাহেবদের দেশে চললেও, আমাদের সমাজে এখনও তেমন চালু হয়নি। অন্য কারও সঙ্গে যাক বা না যাক, শালাবাবুর মতে, দ্বিতীয় বার বিয়ে করার ব্যাপারটা মন্টুবাবুর সঙ্গে ঠিক যায় না।'

'বিয়ের পর মন্টুবাবুর কোনও পরিবর্তন দেখা গেছিল?'

'আমি ঠিক এই প্রশ্নটাই শালাবাবুকে করেছিলাম। শালাবাবু বললেন, দ্বিতীয় বার বিয়ে করার পর মন্টুবাবু পোশাক-আসাকে ফিটফাট হয়েছেন, চুলে কলপ পড়েছে। তবে প্রেসের কাজ বা কর্মচারীদের প্রতি ব্যবহারে কোনও তফাত দেখা যায়নি। প্রেস আগের মতোই রমরম করে চলছে।'

বলরাম চা-জলখাবার দিয়ে গেল। বিমলের জন্য চা-জলখাবার, আদিত্যর জন্য শুধু চা। চায়ের কাপে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে আদিত্য বলল, 'সুশান্ত হালদার, দেবী বসাকের সঙ্গে দেখা হয়েছে? তারা কী করছে?'

'এখনও দেখা হয়নি স্যার। গত কয়েকদিন সাইবার কাফে বন্ধ ছিল। আজ আর একবার দেখব। নইলে অন্য রাস্তা ভাবতে হবে। তবে একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করলাম। সাইবার কাফেটা মন্টুবাবুর বাড়ির ঠিক পেছন দিকে। মাঝখানে একটা দেয়াল আছে আর একটা সরু গলি। তাই সোজাসুজি যাওয়া যায় না। পুরোনো দেয়াল। পাড়ার লোকে বলল আগে ওখানে একটা ওষুধের কারখানা ছিল। তারা তুলেছিল। আমি সাইবার কাফের ধারে ঘোরাঘুরি করছিলাম, শুনতে পেলাম মন্টুবাবুর বাড়ি থেকে কথাবার্তা ভেসে আসছে, টেলিফোন বাজছে।'

'শুনতে পেলে টেলিফোন বাজছে?'

'হ্যাঁ স্যার, স্পষ্ট শুনতে পেলাম।'

'শোনো, আজ বিকেল থেকে কয়েকদিন আমি মন্টুবাবুর বাড়িতে থাকব। অবশ্য অন্য নামে। ওই পাড়ায় আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে না চেনার ভান কোরো। ফোন খোলা থাকবে। খুব দরকার পড়লে ফোন করবে, নাহলে নয়।'

'ঠিক আছে স্যার।'

## (২)

অমিতাভ-রত্না দুপুরে খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছিল। বলেছিল সকাল থেকে চলে আসিস। অনেকদিন ভাল আড্ডা হয় না। এখানে ব্রেকফাস্ট খাবি। বিমল এসে পড়ায় দেরি হয়ে গেল। আদিত্য অবশ্য ফোন করে ওর দেরি হবে জানিয়ে দিয়েছে।

দুপুর বারোটা নাগাদ একটা ছোট ব্যাগে কিছু জামাকাপড়, টুথপেস্ট-টুথব্রাস এবং আরও কিছু টুকিটাকি ভরে আদিত্য বেরিয়ে পড়ল। অমিতাভদের ওখান থেকে একেবারে মন্টুবাবুদের বাড়ি চলে যাবে। মন্টুবাবুকে বলা আছে। মেস থেকে বেরিয়ে মহাত্মা গান্ধী রোড অব্দি হেঁটে এসে মেট্রো ধরবে। যতীন দাস রোডে নেমে বালিগঞ্জ ফাঁড়ি অব্দি অটো, তারপর আবার মিনিট পাঁচেক হাঁটা। বেশ কিছু নতুন তথ্য পাওয়া গেছে। এলোমেলো অনেক তথ্য। তার মধ্যে কিছু প্রয়োজনীয়, কিছু ততটা নয়, আবার কিছু মারাত্মক রকমের দরকারি। মুস্কিল হচ্ছে, কোনটা দরকারি, কোনটা অদরকারি আগে থেকে বোঝা যায় না। তিনজনের কাছ থেকে তিন সেট ইনফরমেশন পাওয়া গেছে। এক, মন্টুবাবুর কাছ থেকে, দুই, পুলিশকর্তা গৌতম দাশগুপ্তর কাছ থেকে, এবং তিন, বিমলের মাধ্যমে জনৈক গোপীনাথবাবুর শ্যালকের কাছ থেকে যিনি মন্টুবাবুর প্রেসে বেশ কিছুদিন কাজ করছেন। এই তথ্যগুলোকে একে অপরের সঙ্গে ক্রস চেক করতে হবে।

আদিত্য যখন অমিতাভ-রত্নাদের বাড়ি পৌঁছল তখন ঘড়িতে প্রায় দেড়টা। বেল বাজাতে অমিতাভ নিজেই দরজা খুলে দিল।

'আয়, আয়। এত দেরি করলি কেন?'

'আরে আমি তো অনেক আগেই আসতে চেয়েছিলুম। সকালে বিমল এল। কথা বলতে বলতে দেরি হয়ে গেল। তারপর মেট্রোর জন্য আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে। একে রবিবারে ট্রেন কম, তার ওপর আবার যান্ত্রিক গোলযোগ।'

'রত্না তোর জন্য জম্পেশ ব্রেকফাস্ট বানিয়েছিল। তোর তো সকালে উঠে মুখ ধুয়েই চলে আসার কথা।'

'আমার কপালটা জানিস তো কোনদিনই ভাল নয়। যাই হোক মধ্যাহ্নভোজনে উসুল করে নেব। মাটন হয়েছে মনে হয়। সারা বাড়িতে দারুণ গন্ধ ছড়াচ্ছে। টুপলু কোথায় রে?'

'টুপলু ওপরের তলায় বন্ধুর বাড়িতে ভূগোলের নোট মেলাতে গেছে। একখুনি চলে আসবে। ভেবেছিলাম তুই এলে আজ একসঙ্গে শুধু ভীমপলাশি শুনব। সেই মত অনেকগুলো ভীমপলাশি বেছে রেখেছিলাম। সব

শোনা হবে না। তবে এইটা শোন। সিক্সটিসে আলি আকবর খাঁ সাহেব কারো বাড়িতে বাজিয়েছিলেন। অনেক কষ্টে জোগাড় করেছি।'

'এতক্ষণে আসার সময় হল?' রত্না ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল। কোমরে আঁচল গোঁজা, কপালে ঘাম।

'উপায় ছিল না রে। লোক এসে গেছিল। তার ওপর মেট্রোতে দেরি। তুই খুব লেবার দিয়ে রান্না করেছিস দেখতে পাচ্ছি। যা গন্ধ ছাড়ছে না, মনে হচ্ছে একখুনি খেতে বসে যাই।'

'শুধু আমি লেবার দেবো কেন? একটা মাছ তো অমিতাভ রেঁধেছে। স্যালাডটাও ও-ই বানিয়েছে।' রত্না এবার স্বামীকে ধমক লাগাল,

'অ্যাই, এখন ওসব গান-টান রাখো। আগে আমরা খেয়ে নিই। তারপর যত খুশি গান হবে। আদিত্যর নিশ্চয় নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে যাচ্ছে। তুমি ওপরের ফ্ল্যাটে ফোন করে টুপলুকে চলে আসতে বল। বল, আদিত্যকাকু এসে গেছে।'

'আমি এখনও তো চানই করিনি।'

'করবে কী করে? সকাল থেকেই যে কালোয়াতি গান চলছে। একখুনি চান করতে যাও।'

'ঠিক আছে, তুমি টুপলুকে ডাক, আমি চানটা সেরে আসি। আদিত্য, তুই একা বসে বসে কী করবি? আলি আকবর খাঁ সাহেবের ভীমপলাশিটা শোন।'

রত্না টেবিল সাজাচ্ছে। আদিত্যর সত্যিই খিদে পেয়েছে। খাবার ঘর থেকে নানা সুগন্ধ ভেসে আসছে। আলি আকবর কোমল গান্ধার লাগালেন, একটু মোচড় দিয়ে কোমল নিষাদ হয়ে, ধৈবত হয়ে, খাদের পঞ্চমে থিতু হলেন। ছ'তলার এই ঘরটা থেকে পুবদিকে অনেক দূর অব্দি দেখা যায়। এদিকের আকাশটা নির্মেঘ হলেও পুবদিকের আকাশ কালো হয়ে এসেছে। ওদিকেই তো মন্টুবাবুর বাড়ি, তাকে একটু পরেই যেতে হবে। খাঁ সাহেব গান্ধার-মধ্যম-পঞ্চম নিয়ে খেলা করছেন। কালো মেঘের পোশাকে একটা অজানা অশুভ যেন পুবদিকটা জুড়ে রয়েছে। অমিতাভ-রত্নার এই শান্তির আলয়ের অনেক বাইরে। দু'টো নতুন খবর সে জানতে পেরেছে। এক, মন্টুবাবুর ভূতুড়ে টেলিফোন নম্বরটি পুলিশের খাতায় রয়েছে। পুলিশ মনে করছে নম্বরটার পেছনে কোনও রহস্য আছে। দুই, মন্টুবাবুর প্রথম স্ত্রীর অপঘাত মৃত্যু হয়েছিল। খবরটা মন্টুবাবু চেপে গেলেন কেন? কিন্তু এই দু'টো ছাড়াও আরও কিছু দরকারি খবর কেউ কেউ দিয়েছে। সেগুলো আদিত্যর সামনেই আছে। তার মন বলছে আছে। তবু সে ঠিক ধরতে পারছে না। বিশেষ করে কানুনগোর ডায়েরিতে সযত্নে রেখে দেওয়া ছবিটা তাকে খুব ভাবাচ্ছে। খাঁ সাহেব খাদের নিষাদ থেকে উঠতে উঠতে পঞ্চমে পৌঁছনোর বদলে মধ্যমে দাঁড়িয়ে গেলেন। আর অমনি সারা পৃথিবী জুড়ে একটা মস্ত হাহাকার তৈরি হল। এত দুঃখ কোথায় জমে ছিল এতদিন? আদিত্যর একেবারে ভেতর থেকে একটা 'ও হো হো হো' ধ্বনি বেরিয়ে এল।

'খাবার তৈরি, চলে আয়।' রত্না খেতে ডাকছে।

(৩)

শহরের এই অঞ্চলে এখনও সাইকেল রিক্সা চলে। একে রবিবারের বিকেল, তার ওপর আকাশ কালো করে এসেছে। রাস্তায় খুব বেশি লোকজন নেই। বৃষ্টির আশঙ্কায় আদিত্য একটা রিক্সাতে উঠে পড়ল। হাসপাতালের চৌহদ্দি পেরিয়ে কিছুটা ভেতরে ঢুকলেই মফস্বল। একতলা-দোতলা বাড়িগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, মাঝে-মধ্যে মাঠ, পুকুর, খাপরার ছাউনি দেওয়া চা-বিস্কুটের দোকান। তবু তার মধ্যেই দু'একটা অর্বাচীন ছ'সাততলা বাড়ি এলোপাথাড়িভাবে হঠাৎ গজিয়ে উঠেছে। মনে করিয়ে দিচ্ছে, কিছুদিনের মধ্যেই মহানগর এসে এই নিরভিমান মফস্বলকে গিলে খাবে। কিছুক্ষণ চলার পর লেভেল ক্রসিং, ভাগ্য ভাল খোলা রয়েছে। লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে কিছুক্ষণ চলার পর রিক্সা জরাজীর্ণ পাঁচিল-ঘেরা একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ধারে

এসে পড়ল। জায়গায় জায়গায় ভেঙেও পড়েছে পাঁচিল। অনেকটা জমি ফাঁকা পড়ে রয়েছে। রিক্সাওলার কাছ থেকে জানা গেল এখানে আগে একটা ওষুধের কারখানা ছিল। ঘোড়ার রক্ত থেকে ধনুষ্টঙ্কারের ওষুধ তৈরি হত। ভেতরে ছিল ঘোড়ার আস্তাবল। অনেক ঘোড়া ছিল। ঘোড়াগুলো মরে গেছে। কারখানাও বন্ধ হয়ে গেছে বহুদিন। পরিত্যক্ত কারখানার পেছন দিয়ে চলে গেছে আরেকটা ট্রেনের লাইন।

রিক্সাওলা রাস্তা চেনে। দ্বিতীয় ট্রেন লাইনটা পেরোনোর আগেই আদিত্যকে নিয়ে সে একটা গলিতে ঢুকে পড়ল। দু'-তিনটে বাড়ির পরেই সাতাশ নম্বর। পুরোনো দোতলা বাড়ি, কিন্তু এক ঝলক দেখলেই বোঝা যায়, যত্নে আছে। একতলায় লাল সিমেন্টের বারান্দা। গাছ-গাছালি ঢাকা লাল সুরকির পথ দিয়ে বারান্দায় উঠে আদিত্য কলিংবেল বাজাল। কিছু পরে অন্তরীক্ষে পায়ের শব্দ, দরজা খুলে গেল। একজোড়া দীঘল জিজ্ঞাসু চোখ আদিত্যকে মাপছে।

'নমস্কার। আমার নাম সূর্য, সূর্যশঙ্কর সাহা। আমি ভিলাই থেকে আসছি। এটা কি জিতেন্দ্রনাথ দত্তর বাড়ি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসুন, আসুন। আমার স্বামী আপনার কথা বলেছেন। আপনি সুলতার দেওর তো? উনি একটু বাইরে গেছেন, আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসবেন।'

'আমি আপনাদের খুব অসুবিধে করে দিচ্ছি।' আদিত্য কুণ্ঠিতভাবে বলল।

'অসুবিধে কীসের? আমাদের এখানে কেউ আসে না। ফাঁকা বাড়িটা পড়ে আছে। কেউ এসে থাকলে আমাদের খুব ভাল লাগবে। আপনার থাকার ঘরটা দেখিয়ে দিচ্ছি। আগে একটু চা খান। ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, আমার নাম বকুল।'

বাইরের বারান্দার মতো ভেতরের দালানটাও লাল সিমেন্টের, ধারে কালো বর্ডার। দালানের একপাশে বসার ঘর। বকুল আদিত্যকে নিয়ে বসার ঘরে ঢুকল। একটা পুরোনো সোফাসেট, গোল টেবিলে কয়েকটা সিনেমা পত্রিকা, মেয়েদের ম্যাগাজিন। ঘরের একদিকে একটা কাচের আলমারির ওপরের তাকে একসেট শরৎ গ্রন্থাবলী সমেত কিছু বাংলা উপন্যাস, একটা গীতবিতান। নীচের তলায় দু'একটা কেষ্টনগরের পুতুল, কিছু কাপ-প্লেট, যেগুলো দেখলেই বোঝা যায় তারা কালেভদ্রে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে একটা ডিভান, তার ওপর শাড়ি জড়ানো একটা বাদ্যযন্ত্র শোয়ানো আছে। দেখে মনে হয় তানপুরা। আদিত্য সোফার এককোণে গুটিসুটি মেরে বসল। তাকে খুব একটা অভিনয় করতে হচ্ছে না। সে স্বভাবে ভীষণ মুখচোরা।

'আসলে, আমার ট্রেনিংটা গতকাল শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু কিছুতেই আগামী শুক্রবারের আগে ট্রেনের টিকিট পেলাম না। গত তিন সপ্তাহ ব্যাঙ্কের গেস্ট হাউসেই ছিলাম। ট্রেনিং শেষ হয়ে গেলে তো আর থাকতে দেবে না। তাই ভাবছিলাম কোথায় যাই। তখন আপনাদের কথা মনে পড়ল। খুব সঙ্কোচ হচ্ছিল। খুব একটা সম্পর্ক তো আর রাখা হয় না।'

'আপনি এত কিন্তু কিন্তু করছেন যে আমারই খারাপ লাগছে। আরাম করে ক'টা দিন থাকুন। কলকাতা দেখুন। মালতী, চা বসাও।' শেষের কথাগুলো, বলাই বাহুল্য, নেপথ্যে থাকা কোনও পরিচারিকার উদ্দেশে।

'আপনাদের পাড়াটা কিন্তু বেশ নিরিবিলি। আগেও কয়েকবার কলকাতায় এসেছি কিন্তু এদিকটা কখনও আসা হয়নি। আমরা ছোট শহরের লোক, একটু নিরিবিলি ভাল লাগে।'

'আপনি ভিলাইতে কতদিন আছেন?'

'তা প্রায় কুড়ি বছর। তার আগে রায়পুরে থাকতাম। মধ্যপ্রদেশেই আমাদের জন্ম-কম্ম। বাবা চাকরি করতে গিয়ে আর ফেরেননি। এখন অবশ্য ছত্তিসগড়।'

'সে তুলনায় আপনার বাংলাটা কিন্তু একটুও টোল খায়নি।'

আদিত্য ভেতরে ভেতরে একটু থতমত খেল। পশ্চিমা বাঙালির বাংলা সে শুনেছে। কিন্তু সেটা নকল করা তার পক্ষে অসম্ভব।

'আসলে কি জানেন আমরা দু'ভাই ঠাকুমার কাছে মানুষ। ঠাকুমার বাড়ি ছিল দর্জিপাড়া। সেই ভাষাটাই মুখে বসে গেছে। তাছাড়া বাড়িতেও খানিকটা বাংলার চর্চা ছিল। সব বাড়িতে তো থাকে না।'

মালতী টিপটে চা নিয়ে এসেছে। সঙ্গে ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কুট।

'আপনি চায়ে চিনি দুধ খান তো?'

'না না চিনি দুধ নয়, শুধু লিকার। আগেই আমার বলা উচিত ছিল।'

'কোনও অসুবিধে নেই তো। মালতী আলাদা করে লিকারই এনেছে। চিনি দুধ না মেশালেই হল। আমি আবার দুধ চিনি ছাড়া চা খেতে পারি না। নিন।'

বকুল চায়ের কাপ এগিয়ে দিল। আদিত্য বকুলকে যত দেখছে, তত অবাক হচ্ছে। আধুনিক, সপ্রতিভ, বুদ্ধিমতী। গায়ের রঙ কিছুটা চাপা, সুন্দরীও হয়তো ঠিক বলা যাবে না, কিন্তু চেহারার একটা আশ্চর্য আকর্ষণ আছে। ইংরেজি করে বললে, সেক্স অ্যাপিল। এরকম মেয়ের কপালে মন্টুবাবুর মতো দোজবর জুটল কেন?

'ছত্তিসগড় শুনেছি খুব সুন্দর জায়গা। কখনও যাইনি। দেশের মধ্যে খুব বেশি ঘোরা হয়নি। একবার শুধু দার্জিলিং গিয়েছিলাম। সেখানেই তো সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা ঘটল। নিশ্চয় সুলতা বলেছে। ও তখন ইস্কুলে পড়ে।'

আদিত্য খানিকটা আন্দাজ করতে পারছে কোন ঘটনার কথা বকুল বলছে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে চুপ করে থাকাই ভাল। ভাগ্যবশত, বকুল কথা বলার মেজাজে আছে।

'পাহাড় খুব সুন্দর লেগেছিল। কী বিশাল। হিমালয় বলে কথা। আচ্ছা, আপনাদের ভিলাইতে পাহাড় আছে?'

আদিত্য প্যাঁচে পড়েছে। প্রশ্নটার উত্তর সে সত্যিই জানে না। ভিলাইয়ের যে দু'একটা ছবি সে দেখে এসেছে তার একটাতেও পাহাড় নেই। কিন্তু বলা যায় না, শহরের বাইরে ছোটখাট টিলা থাকতেই পারে। বিন্ধ্যপাহাড়ের রেঞ্জটা তো ওইসব জায়গা দিয়েই গেছে। এত কম জেনারেল নলেজ নিয়ে গোয়েন্দাগিরিতে আসা উচিত নয়। আপিসে একটা ইন্টারনেট সহ কম্পিউটার থাকলে দেখে আসা যেত।

'ঠিক পাহাড় নেই, আশেপাশে কিছু টিলা আছে।' আদিত্য আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল।

আর ঠিক তখনই, যেন তাকে অস্বস্তির হাত থেকে রেহাই দেবার জন্য, ঘরের একটা অদৃশ্য কোণ থেকে তারস্বরে বেজে উঠল টেলিফোন। টেলিফোনটা যে ঘরের ভেতরেই ছিল আদিত্য এতক্ষণ খেয়ালই করেনি।

(৪)

'এই পাড়ায় আমাদের প্রায় পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল। একটা ওষুধের কারখানা ছিল এখানে। টিটেনাসের ওষুধ বানাত। কারখানাটা চলল না। হয়তো আরও আধুনিক ওষুধ বাজারে বেরিয়ে গিয়েছিল। সে যাই হোক, কারখানার কিছু জমি যখন বিক্রি হচ্ছিল আমার বাবা খানিকটা কিনে নেন। বাবারও একটা প্রেস ছিল, তবে আমার বর্তমান প্রেসটা নয়। বউবাজার অঞ্চলে আরও ছোট একটা প্রেস। এই অঞ্চলটা তখন প্রায় গ্রামই ছিল। বাবা জমিটা সস্তাতে পেয়েছিল। তারপর বাড়ি তৈরিটা নেশার মতো পেয়ে বসেছিল বাবাকে। সত্যি বলতে কি, এত বড় বাড়ি বানানোর সামর্থ্য বা প্রয়োজন কোনটাই বাবার ছিল না। শুধু এই বাড়িটা বানিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি। পাশের বাড়িটাও বাবার বানানো। অনেকদিন ফাঁকা পড়েছিল। বছর পাঁচেক হল ভাড়াটে বসিয়েছি।

একটা ব্যাপার, কারখানার বাকি জমিগুলো এই পঞ্চাশ বছরেও বিক্রি হল না। দেখবেন, এখনও ওইভাবেই পড়ে আছে। কীসব মামলা মকদ্দমা এখনও নাকি চলছে শরিকদের মধ্যে। একদিক থেকে আমাদের ভালই হয়েছে, জায়গাটা ঘিঞ্জি হয়ে যায়নি। আবার উলটোদিকে ওই পোড়ো কারখানার ভেতর নানা ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি বাসা বেঁধেছে। লোকে বলে ড্রাগ পেডলারদের আখড়া। দিনের বেলাতেও পাড়ার ভদ্রলোক ওর ভেতরে ঢোকে না। মাঝে মাঝে দেখি পুলিশ আসে। তবে সকলেই জানে পুলিশের সঙ্গে ড্রাগ চালানকারীদের বিশেষ ভালবাসা আছে।'

মন্টুবাবু দম নেবার জন্য থামলেন। আদিত্য সিগারেট ধরাল। রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর দুজনে হাঁটতে বেরিয়েছে। এপাড়ায় রাস্তার আলোগুলো কিছু জ্বলে, বেশিভাগই জ্বলে না। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে আলো-আঁধারি। তার ওপর পরিত্যক্ত কারখানাটা যেন একটা কবরখানার মতো নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তায় গাড়ি খুব কম, শুধু মাঝেমধ্যে কলকাতার দিক থেকে দুএকটা গাড়ি হেডলাইট জ্বালিয়ে বাড়ি ফিরছে।

'বকুলকে কেমন দেখলেন? স্বাভাবিক অবস্থায় আছে মনে হল?'

'বকুলকে অসম্ভব বুদ্ধিমতী মনে হল। যদি অস্বাভাবিকত্ব কিছু থাকেও বাইরে থেকে বোঝা যাবে না।'

'টেলিফোন বাজতে শুনলেন?'

'বকুলের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনবার টেলিফোন বেজেছে। বকুল উঠে ধরার আগেই প্রত্যেকবার কেটে গেল। টেলিফোন ধরার ব্যাপারে বকুলের খুব একটা তাড়াও দেখলাম না। আমি জিজ্ঞেস করতে বলল টেলিফোনে রোজই আট-দশটা রং নাম্বার আসে। বাড়ির সকলের গা সওয়া হয়ে গেছে।'

'টেলিফোন বাজার সময় বকুল কি একটু ভয় পেয়েছে মনে হল?'

'একটু সন্ত্রস্ত মনে হল। হয়তো বা একটু বিরক্তিও ছিল। বকুলকে কেউ ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করছে কিনা বার করতে আরও ক'টা দিন লাগবে। আগামী শুক্রবার অব্দি তো আছি। তার মধ্যে আশা করছি একটা কিছু জানতে পারব।'

'আপনার আর কোনও সাহায্য লাগবে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ বকুলের ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানতে চাই। কতদূর লেখাপড়া করেছে, কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে কিনা, সারাদিন সময় কাটায় কীভাবে?'

'বকুল পাড়ার ইস্কুলে পড়েছে। লেখাপড়ায় নেহাত মন্দ ছিল না। ইস্কুলের পর কাছেই একটা মেয়েদের কলেজে ভর্তি হয়েছিল। ইস্ট মেট্রোপোলিটান গার্লস কলেজ। বছর দু'য়েক পড়ে ছেড়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত বিএ-টা পাশ করেনি। কেন, আমি জানি না। কখনও জিজ্ঞেস করা হয়নি। এক সময় বকুলের অনেক বন্ধুবান্ধব ছিল। বিয়ের পর মনে হয় তাদের সঙ্গে খুব একটা যোগাযোগ নেই। তবে শ্রীলেখা বলে একটা মেয়ে এখনও মাঝে মাঝে বকুলের মোবাইলে ফোন করে। বকুল তার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলে, দেখেছি। এই মেয়েটা রজনীর ট্র্যাভেল এজেন্সিতে কাজ করে। বোধহয় বকুলই কখনও যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিল। এক কথায়, আর পাঁচটা বাঙালি বউ যেভাবে সময় কাটায় বকুলও সেইভাবেই সময় কাটায়। সংসারটা নজরে রাখে, ব্যাঙ্ক-ট্যাঙ্কের কাজগুলো সামলায়, দুপুরবেলা ঘুমোয়, হয়তো সিরিয়ালও দেখে। ছাতে একটা বাগান করেছে।'

'বকুলের মোবাইল নম্বরটা আমার দরকার।'

'আমার তো নম্বর মনে থাকে না। নম্বরটা আমার মোবাইলে সেভ করা আছে। মোবাইলটা আবার বাড়িতে ফেলে এসেছি। বাড়ি ফিরে আপনাকে নম্বরটা দিয়ে দেব।'

'আর একটা কথা। আপনার প্রথম স্ত্রীর অপঘাতে মৃত্যু হয়েছিল বলেননি কেন?'

প্রশ্নটা করে আদিত্য সরাসরি মন্টুবাবুর দিকে তাকাল। মন্টুবাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন। রাস্তার আলোগুলো ঠিকমত জ্বলছে না। সেই আলো-আঁধারিতে দাঁড়িয়ে আদিত্যর মনে হল, নিমেষের মধ্যে একাধিক অভিব্যক্তি খেলে যাচ্ছে মন্টুবাবুর মুখের ওপর দিয়ে। ভয়, সংকোচ, লজ্জা, একটা বেপরোয়া ভাব। বেশ কিছুক্ষণ পরে মন্টুবাবু শান্ত গলায় বললেন,

'আমার প্রথম স্ত্রী দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে পা স্লিপ করে পাহাড় থেকে পড়ে যান। একটা খাদে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়। পাহাড় থেকে পড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক। সচরাচর এরকম ঘটে না। এটা নিয়ে পুলিশও তদন্ত করেছিল। কিছু পাওয়া যায়নি। আপনাকে ঘটনাটা বলিনি কারণ মনে হয়েছিল টেলিফোন কাণ্ডের সঙ্গে এর কোনও যোগ নেই। তাছাড়া এটা একটা পারিবারিক লজ্জার ব্যাপারও বটে। তাই, স্বীকার করছি, নিজের থেকে বলতে সঙ্কোচ হয়েছিল।'

'কারা কারা গিয়েছিলেন দার্জিলিং-এ?'

'আমার পরিবার, মানে স্ত্রী কল্পনা, মেয়ে সুলতা এবং আমি, আমার বন্ধু রজনীর পুরো পরিবার, অর্থাৎ রজনী, রজনীর মেয়ে-বউ, রজনীর বোন বকুল, রজনীর ভাই দেবী আর তার বন্ধু সুশান্ত।'

'তার মানে ঘটনার সময় দেবী বসাক এবং সুশান্ত হালদার আপনাদের সঙ্গেই ছিল।'

'তা তো ছিলই। আসলে এটা ছিল রজনীদের পরিবারের হাওয়াবদল। আমরা ওদের সঙ্গে জুটে গিয়েছিলাম আর কি। যা কিছু ব্যবস্থা রজনীরাই করেছিল। তবে, অস্বীকার করব না, ওই বিপদের সময় দেবী-সুশান্ত খুব করেছিল। খাদে নেমে ওরাই প্রথম আবিষ্কার করে কল্পনা নীচে পড়ে গেছে। অ্যাম্বুলেন্স ওরাই নিয়ে আসে। পরে পুলিশকে ওরাই সামলেছিল।'

'দুর্ঘটনাটা কেমন করে ঘটল?'

'আমরা টাইগার হিলের কাছে একটা পিকনিক স্পটে চড়ুইভাতি করতে গিয়েছিলাম। দুপুরে খাওয়ার আগে গান-বাজনা হচ্ছিল। কেউ-কেউ তাস খেলছিল। কেউ একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। পিকনিকে যেমন হয়। খাওয়ার সময় দেখা গেল সবাই রয়েছে, কল্পনা নেই। কেউ কেউ কল্পনাকে একা-একা ঘুরতে দেখেছিল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেবী-সুশান্ত একটা খাদের নীচে কল্পনার বডিটা দেখতে পায়। ওদের সঙ্গে একটা বাইনোকুলার ছিল, কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখবে বলে নিয়ে এসেছিল, তাই দিয়ে দেখতে পায়।'

কথা বলতে বলতে ওরা আবার মন্টুবাবুদের বাড়ির সামনে ফিরে এসেছে। বাড়ির মধ্যে সিগারেট খাওয়া যাবে না ধরে নিয়ে আদিত্য তাড়াতাড়ি আর একটা সিগারেট ধরাল।

'আমি কাল সকালে সুশান্ত-দেবীরঞ্জনের দোকানে একবার ঢুঁ মারব। দেখি কিছু পাই কিনা।'

'দেখুন। তবে একটু সাবধানে। ছেলে দু'টো একটু রাফ ধরনের। কথাবার্তাও ভাল নয়।'

ওদের গলার আওয়াজ পেয়ে বকুল বেরিয়ে এসেছে।

'আপনার শোবার ঘর তৈরি। সকালে ক'টায় চা দেব?'

'আমি খুব ভোরে উঠে পড়ি। ভোরে উঠে একটু হাঁটার অভ্যেস আছে।'

'মালতী ছ'টায় আপনার ঘরে চা পৌঁছে দেবে। দুপুরে খাবেন তো?'

'সকালে একটু বেরোব, ফিরতে ফিরতে বিকেল হয়ে যাবে। কাল দুপুরে বাইরেই খেয়ে নেব।'

আদিত্য বাড়িতে ঢোকার আগে মরিয়া হয়ে সিগারেটে শেষ কয়েকটা টান দিয়ে নিচ্ছে, এমন সময় পাশের বাড়ি থেকে বিশাল লম্বা-চওড়া এক মাঝবয়সি ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। আদিত্যকে দেখে অত্যন্ত মিহি গলায় বললেন,

'বাড়িতে নতুন অতিথি এল নাকি মন্টুবাবু? এঁকে তো আগে পাড়ায় দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।'

আদিত্য চমকে উঠে তাকাল। ভাবা যায় না, এমন বিশাল চেহারা থেকে এত মিহি আওয়াজ বেরোতে পারে। মন্টুবাবু বললেন,

'আমার মেয়ের দেওর। ভিলাই থেকে কলকাতায় কাজে এসেছে। ক'টা দিন এখানে থাকবে।'

'তবু ভাল। আমি ভাবলাম, টেলিফোন রহস্য ভেদ করার জন্য বুঝি গোয়েন্দা এনেছেন। হাঃ, হাঃ হাঃ।'

ভদ্রলোক নিজের রসিকতায় নিজেই এত জোরে হেসে উঠলেন যে সামনের গাছটা থেকে কয়েকটা কাক উড়ে গেল। বকুলের মুখে পরিষ্কার বিরক্তি। মন্টুবাবু অপ্রতিভ। অস্বস্তি কাটাতে মন্টুবাবুই মুখ খুললেন,

'আলাপ করিয়ে দিই, আমার মেয়ের দেওর সূর্যশঙ্কর সাহা, আর ইনি আমাদের পড়শি ও ভাড়াটে রামানুজ চট্টোপাধ্যায়।'

রাত্তিরে আদিত্য দু'বার বকুলকে স্বপ্নে দেখল। একবার দেখল দার্জিলিং-এ মস্ত পাহাড়ের তলায় বসে সে আর বকুল চা খাচ্ছে। অনেকটা চা-কোম্পানির বিজ্ঞাপনের মতো। সে চায়ের প্রশংসা করাতে বকুল বলছে, চা ভাল তো হবেই, খোদ ভিলাই-এর চা বলে কথা। আর একবার দেখল সে বকুলকে নিয়ে অমিতাভ-

রত্নাদের বাড়ি গিয়েছে, গল্প-টল্প হচ্ছে। তবে সেই গল্পে বিমল, রামানুজ চট্টোপাধ্যায় সকলেই শামিল হয়েছে। দু'বারই তার ঘুম ভেঙে গেল টেলিফোনের শব্দে। ভূতুড়ে টেলিফোন তাহলে রাত্তিরেও বিশ্রাম নেয় না।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(১)

সাইবার কাফেটা ছোট, সব মিলিয়ে তিনটে ডেস্কটপ, একটা প্রিন্টার-স্ক্যানার। তাছাড়া নিশ্চয় ওয়াই-ফাইও আছে। একদিকে সোফার ওপর বসে একটা ছেলে কানে হেডফোন লাগিয়ে মোবাইলে গান শুনছে। অন্যদিকে পার্টিশন দিয়ে মালিকের আপিসঘর। এখন তিনটে কম্পিউটারই ফাঁকা। মন্টুবাবু বলেছিলেন, দোকানটা চলে ভাল। এখন অন্তত তার কোনও প্রমাণ দেখা যাচ্ছে না। হয়তো বিকেলের দিকে ছাত্র-টাত্ররা গেম খেলতে আসে। আদিত্য ভেতরে ঢুকে দেখল আপিসঘরে বছর চল্লিশের একটি লোক বসে আছে। চেহারাটা আদিত্যর চেনা। ছবিতে দেখেছে। সুশান্ত হালদার।

'আপনাদের এখানে ইন্টারনেট করতে গেলে রেট কত?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'ঘণ্টায় পঁচিশ টাকা। বাঁ দিকেরটা খারাপ আছে। অন্য যে কোনোটাতে বসতে পারেন।' সুশান্ত হালদারের গলাটা বেশ ভদ্র শোনাল।

'পাসওয়ার্ড আছে?'

'না না সোজাসুজি লগ ইন করুন।'

আদিত্য ডানদিকের যন্ত্রটাতে গিয়ে বসল। প্রথমে ই-মেল খুলে দেখল, কিছু পুরোনো মেল এসে জমে আছে। উত্তর দেওয়া হয়নি। খুব দরকারি কিছু নয়। তবু সময় নিয়ে আদিত্য মেলগুলোর উত্তর দিল। কিছুটা ইনিয়ে বিনিয়ে। বন্ধুদের মেল। কেউ আমেরিকায় থাকে, কেউ বিলেতে। এখনও মেলে যোগাযোগ রাখে। শীতকালে কলকাতায় এলে দেখা হয়। আদিত্যর এখানে এখন ঘণ্টাখানেক বসে থাকা দরকার। ইমেল সেরে সে ফেসবুকে ঢুকল। দুটো ছেলে দোকানে ঢুকেছে। আদিত্যর পাশের যন্ত্রটায় বসল। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। মনে হল, কোথাও অনলাইনে অ্যাপ্লাই করবে। দূরে টেলিফোন বাজছে। আদিত্য শব্দটা চেনে। এটা মন্টুবাবুর টেলিফোন। বাজলে এখান থেকে হালকা শোনা যায়। যে ছেলেটা মোবাইলে গান শুনছিল সে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর একজন ঢুকল। দুটো কম্পিউটারই আটকা দেখে সেও বেরিয়ে যাচ্ছিল, তাকে আপিস থেকে সুশান্ত হালদার বলল,

'দুটোর পরে এস। ফাঁকা থাকবে।'

নিশ্চয় চেনা খদ্দের। আদিত্যর মনে হল জায়গাটা অনেকটা পাড়ার চুল কাটার সেলুনের মতো। ভিড় থাকলে খদ্দের আবার ঘুরে আসে। ফেসবুকে নানা লোক নানা কথা লিখছে। কথা বলতে পয়সা লাগে না। কারও কারও কাজ এত কম, সারাদিন ফেসবুক নিয়ে বসে থাকে। আদিত্যর এক বন্ধু, আমেরিকাবাসী, সপরিবারে মিশর বেড়াতে গিয়েছিল। অনেক ছবি পোস্ট করেছে। আবার ফোন বাজল? না না সেই ফোন নয়। কারও মোবাইল বাজছে। আদিত্য কতক্ষণ একমনে ফেসবুক দেখছিল সে নিজেই জানে না। সে খেয়ালও করেনি তার পাশের ছেলেদুটো কখন বেরিয়ে গেছে, সাইবার কাফেতে সে একা।

'আদিত্যবাবু, একবার শুনবেন?'

আদিত্য চমকে উঠে পেছনে তাকাল। সুশান্ত হালদার কখন নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। কী সর্বনাশ! সুশান্ত তার নাম জেনে গেছে! নাম যখন জেনেছে তখন এটাও নিশ্চয় জেনেছে যে আদিত্য এখানে আত্মীয়-বাড়ি বেড়াতে আসেনি।

'আদিত্য মজুমদার, আপনার সঙ্গে আমার খুব দরকারি কথা আছে। আমি দোকানের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসি। কথা বলার সময় কেউ এলে অসুবিধে হবে। এমনিতেই একটা থেকে দুটো দোকান বন্ধ থাকে। দু'চার মিনিট আগে বন্ধ হলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না।'

সুশান্তর গলায় এমন একটা ঠাণ্ডা অমোঘ আত্মবিশ্বাস ছিল যে আদিত্যর মনে হল সুশান্তর কাছে পরিচয় নিয়ে মিথ্যে বলে কোনও লাভ নেই। সে চুপ করে রইল।

'ভয় পাবেন না। দরজা বন্ধ করে আমি আপনার কোনও শারীরিক ক্ষতি করব না।'

ভয় অবশ্য আদিত্য পায়নি। বরং সুশান্ত কী বলে তা জানার জন্য আদিত্যর খুব কৌতূহল হচ্ছিল। সুশান্ত দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে একটা চেয়ার নিয়ে আদিত্যর সামনে এসে বসল।

'আমি জানি আপনার নাম আদিত্য মজুমদার। আমি এও জানি, পেশায় আপনি একজন বেসরকারি গোয়েন্দা। আপনার অফিস, আপনার মেস সবই আমি চিনি। অতএব পরিচয় গোপন করলে মিছিমিছি সময় নষ্ট হবে।'

পকেট থেকে সুশান্ত একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করে আদিত্যকে অফার করল। দামি বিদেশি সিগারেট। আদিত্য এবং তার নিজের সিগারেট ধরিয়ে সুশান্ত বলল,

'আপনি নিশ্চয় ভাবছেন কী করে আপনার পরিচয় জানতে পারলাম। আপনার পাঠানো ছেলেটি আমার দোকানের সামনে দু'দিন আগে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিল। দেখে মনে হল ব্যাপারটা বোঝা দরকার। আমার একটা ছেলেকে ওর পেছনে লাগিয়ে দিলাম। সে খবর আনল গতকাল সকালে আপনার ছেলেটি আপনার বাড়ি গিয়েছিল। আপনাদের মেসের দরোয়ানের কাছ থেকে আপনার অফিসের ঠিকানা পাওয়া গেল। তারপর আপনাদের অফিস বিলডিং-এর সিকিউরিটির কাছ থেকে জানা গেল আপনার পরিচয়। এত কিছু জানার জন্য অবশ্য সামান্য টাকা-পয়সা খরচ করতে হয়েছে। কিন্তু সেটা নিয়ে আমার কোনও অভিযোগ নেই।'

আদিত্য একেবারে বোকা বনে গিয়েছে। এই অবস্থায় শুধু শুনে যাওয়া ছাড়া তার আর কিছু করণীয় নেই। সুশান্ত বলে চলেছে, 'আমার ছেলেটি আপনাদের আপিসের সিকিউরিটির কাছ থেকে এটাও জানতে পেরেছে যে আপনার খুব একটা মক্কেল-টক্কেল হয় না। তবে কয়েকদিন আগে এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সম্ভবত মক্কেল। অনেকক্ষণ ছিল। মক্কেল মশায়ের চেহারার যা বর্ণনা শুনলাম তাতে আমি মোটামুটি নিশ্চিত হলাম যে তিনি আমাদের মন্টু দত্ত ছাড়া আর কেউ নন। কাল বিকেলে আমার ছেলেটি এসে খবর দিল আপনি সুলতার দেওর সেজে মন্টুবাবুর বাড়িতে থাকতে এসেছেন। শুনে যেটুকু বা সংশয় ছিল, সেটাও চলে গেল। আমি একশভাগ নিশ্চিন্ত হলাম মন্টুবাবুই আপনার মক্কেল। প্রশ্ন উঠবে, মন্টুবাবু কেন আপনার কাছে গিয়েছিলেন? কেন তাঁর মতো নিরীহ, নির্বিরোধ একজন লোকের গোয়েন্দার সাহায্য নেবার দরকার পড়ল?'

'উত্তরটা অবশ্য আমার জানাই ছিল। মন্টুবাবুর বাড়িতে যে বেশ কিছুদিন ধরে ভূতুড়ে টেলিফোন আসছে সেটা তো আমার থেকে ভালো আর কেউ জানে না। এটা নিয়ে মন্টুবাবু যে বকুলকে সন্দেহ করছেন সেটাও আমার অজানা ছিল না। দুয়ে দুয়ে চার করে বুঝলাম ভূতুড়ে টেলিফোনের রহস্যভেদ করার জন্য মন্টুবাবু আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছেন।'

'কী করে জানলেন মন্টুবাবু বকুলকে সন্দেহ করছে?' এতক্ষণ পরে মুখ খুলল আদিত্য।

'সেটা জানার জন্য আর একটু আগে থেকে শুরু করতে হবে। বকুলকে আমি অনেকদিন ধরে চিনি। বকুলের ছোড়দা দেবী ইশকুলে আমার দু' ক্লাস নীচে পড়ত। এক পাড়ার ছেলে। বলতে পারেন আমার চ্যালা ছিল। সেই সূত্রে ওদের বাড়িতে যাতায়াত। দেবী ইস্কুলের গণ্ডি পেরোতে পারেনি। আমি ইস্কুল পেরিয়ে কলেজে ঢুকলাম। কিন্তু আমাদের বন্ধুত্বটা রয়েই গেল। আমি লেখাপড়ায় খারাপ ছিলাম না। তাছাড়া খেলাধুলো করতাম, লোকের বিপদে-আপদে গিয়ে দাঁড়াতাম। তাই সেই বয়সে আমি ছিলাম পাড়ার হিরো। ওই সময় বকুল বড় হচ্ছিল। বকুল যখন ইস্কুলের গণ্ডি পেরোবে পেরোবে, আমি কলেজে ঢুকেছি, আমাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়।'

'কার সঙ্গে কথা বলছ ওস্তাদ?' আপিসঘরের পিছনের একটা দরজা ঠেলে হোঁতকা চেহারার এক ব্যক্তি সাইবার কাফের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আপিসঘরের পেছনে যে বাইরে যাবার একটা দরজা আছে আদিত্য এতক্ষণ খেয়ালই করেনি।

তার কথার সরাসরি উত্তর না দিয়ে সুশান্ত আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলল,

'ইনি হলেন দেবীরঞ্জন বসাক, বকুলের ছোড়দা।' তারপর হোঁতকা লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইনি সেই আদিত্য মজুমদার, মন্টুবাবুর ভাড়া করা টিকটিকি, আপাতত মন্টুবাবুর বাড়িতেই নাম ভাঁড়িয়ে রয়েছেন।'

'কেলাতে হবে?' দেবী আদিত্যর দিকে দু'পা এগিয়ে এল।

'এখন দরকার নেই। তুই বাইরে থাক। দরকার পড়লে ডাকব।'

দেবী খানিকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

'তারপর যা বলছিলাম' সুশান্ত আবার শুরু করল, 'বকুলের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যতদূর গড়ানো সম্ভব, ততদূরই গড়িয়েছিল। ইতিমধ্যে আমার জীবনে আরও কিছু পরিবর্তন আসে। আমি কিছুটা অভাবের চাপে কিছুটা স্বভাবের দোষে বিপথে চলে গেলাম। প্রথম প্রথম বেশ লাগত। হাতে প্রচুর কাঁচা টাকা, বকুলকে নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছি, দামি হোটেলে খাওয়াচ্ছি। কিছুদিন পরে বুঝলাম পথটা পিচ্ছিল, এতটাই পিচ্ছিল যে একবার নামতে শুরু করলে আর সহজে ওঠা যায় না। পাড়ায় বদনাম হল। বকুল প্রথমে বকাবকি, পরে কান্নাকাটি শুরু করল। শেষে পুলিশের ফাঁদে পা দিয়ে দু'বছরের জন্য জেলে গেলাম।

'জেলে বসে ঠিক করলাম, আর নয়। জেল থেকে বেরিয়ে ভাল হয়ে যাব। বকুলকে বিয়ে করব। সৎপথে থেকে ব্যবসা করব। চাকরি তো আর দাগি আসামীকে কেউ দেবে না। বকুলই ছিল আমার ভাল হবার ইচ্ছের পেছনে মূল শক্তি।'

'অথচ জেল থেকে বেরিয়ে কী দেখলাম? দেখলাম বকুল মন্টুবাবুকে বিয়ে করেছে। বড়লোকের গৃহিণী হয়ে মহা আরামে আছে। মাথায় আগুন জ্বলে গেল। একদিন রাস্তায় ওকে ধরলাম। ও বলল, বাড়ির চাপে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে। ওকে যেন আমি ক্ষমা করে দিই। অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করল। আমি ভাবলাম যা বলছে সেটা সত্যি হতেও পারে। জেলে যাওয়া প্রেমিকের জন্য হিন্দি সিনেমায় ছাড়া আর কে কবে অপেক্ষা করেছে? কিছুদিন আর ওর সঙ্গে কথা হয়নি। ইতিমধ্যে দেবী আর আমি এই সাইবার কাফেটা শুরু করেছি। ব্যবসা একটু একটু করে জমেও উঠছে। ব্যস্ত হয়ে পড়ছি। তবু দূর থেকে বকুলকে লক্ষ করার অভ্যেসটা ছাড়তে পারিনি।

'একসময় খেয়াল করলাম বকুল আসলে গোড়া থেকেই শুধু টাকাপয়সা চেয়েছিল। টাকাপয়সা ছাড়া আর কিছুই ভালবাসেনি। ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা জমে ওঠার পেছনেও ওই টাকাপয়সাই ছিল। এখন বুঝতে পারি, আমার হাতে অত কাঁচা টাকা না থাকলে বকুল আমার দিকে ঘেঁষতই না। ভেবে দেখলাম, আমার কুপথে যাবার পেছনে বকুলের এই টাকাপয়সার প্রতি টানটা বিরাটভাবে কাজ করেছিল। বকুলকে পটাতে হবে তাই টাকা দরকার, তা সেই টাকা যেভাবেই আসুক, এটাই ছিল আমার বিপথে যাবার মন্ত্র। আমি নিশ্চিত হলাম যে বকুল মন্টুবাবুকে যতটা না বাড়ির চাপে বিয়ে করেছে, তার থেকে অনেক বেশি টাকার লোভে করেছে। দূর থেকে বকুলকে দেখতাম, আধবুড়ো স্বামীকে হাতের মুঠোয় রেখে সে দেদার টাকাপয়সা খরচ করছে। দামি গাড়ি, দামি শাড়ি-গয়না, ভালগারিটির চূড়ান্ত। আমার মাথায় আবার আগুন জ্বলতে শুরু করল। আমার জীবনটা ছারখার করে দিয়ে বকুল তো দিব্যি আছে। ঠিক করলাম এইভাবে তাকে থাকতে দেব না।

'আমার কাছে বকুলের কিছু পুরোনো চিঠি এবং ছবি আছে যা তার বর্তমান বিয়েটা নষ্ট করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। একদিন ওকে রাস্তায় পাকড়াও করলাম। চিঠি এবং ছবিগুলোর কথা বললাম। বললাম আমাকে প্রতি সপ্তাহে পনেরো হাজার টাকা দিতে হবে। না দিলে চিঠি এবং ছবিগুলো মন্টুবাবুর কাছে পৌঁছে যাবে। সরাসরি ব্ল্যাকমেল। বকুল আবার কান্নাকাটি করল। আমি অটল রইলাম। সেই থেকে প্রতি সপ্তাহে পনেরো হাজার করে টাকা পেয়ে যাচ্ছি। টাকার কথা মনে করিয়ে দেবার জন্য প্রতি সপ্তাহে বকুলের বাড়ির টেলিফোনে মিসড কল দিই।

'টাকা তো নিয়মিত পেয়ে যাচ্ছেন, তাহলে দিনে এতবার মিসড কল কেন? সপ্তাহে একবার মিসড কল দিলেই তো যথেষ্ট হত।' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'আপনাকে বুঝতে হবে, বকুল আমার জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছে, আমি তাকে সহজে ছাড়ব না।' সুশান্তর গলাটা প্রায় হিস্টিরিক শোনাল। 'আমি তাকে বলেছি এখন সপ্তাহে সপ্তাহে টাকা দিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছ, কিন্তু কতদিন পাবে জানি না। আমি যেকোনও দিন মত বদলে চিঠি-ছবি মন্টুবাবুর হাতে তুলে দিতে পারি। সেই সম্ভাবনাটা মনে করিয়ে দেবার জন্য আমি দিনে বারবার মিসড কল করি। নিজে সব সময় করতে পারি না। আমার ছেলেরা করে। বকুলকে আমি এক মুহূর্তের জন্য শান্তিতে থাকতে দিতে চাইনি। এটা ইর‍্যাকশানাল বলবেন? তা কিন্তু নয়। এটা বকুলকে প্রবল মানসিক চাপে রাখা। তার অতীত পাপ সম্বন্ধে বারবার তাকে মনে করিয়ে দেওয়া। আমি জানি এই ভূতুড়ে টেলিফোন বকুলকে প্রতি মুহূর্তে কুরেকুরে খাচ্ছে। বকুল নিজেই আমাকে কাকুতি-মিনতি করে ভূতুড়ে টেলিফোন থামিয়ে দিতে বলেছে। বলেছে, ওই আওয়াজটা সে আর সহ্য করতে পারছে না। টাকা সে দিয়ে যেতে রাজি, কিন্তু টেলিফোন যেন আর না আসে।'

সুশান্ত কিছুক্ষণ চুপ করে ছিল। আদিত্যও কথা বলছে না। শেষে আদিত্য বলল,

'আপনি বকুলের মোবাইলে ফোন না করে বাড়ির ফোনে করেন কেন?'

'কেন করি জানেন? এটা করে আমি একটা মানসিক পরিতৃপ্তি পাই। বকুলের বাড়িতে ফোন বাজলে আমার এখান থেকে শোনা যায়। শুনে ভাল লাগে। মনে হয়, আরও সাতপাড়া জানুক বকুল আমার সঙ্গে কী অন্যায়টা করেছে।'

আরও কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। সুশান্ত আদিত্যকে সিগারেট দিয়ে নিজেও একটা ধরাল। আদিত্য জানলা দিয়ে দেখল নির্মেঘ আকাশ। চড়া রোদ্দুরে গাছগুলো ঝলমল করছে। সে বলল, 'এত কথা আপনি আমাকে কেন বলছেন?'

'ঠিক প্রশ্নটাই করেছেন। কেন আপনাকে এত কথা বলছি। আপনাকে এত কথা বলার অবশ্যই একটা কারণ আছে। সম্প্রতি আমি আমার এই ব্যবসাটা বাড়ানোর একটা সুযোগ পেয়েছি। ব্যবসা বাড়াতে কিছু টাকা লাগবে। লাখ দশেক পেলেই আপাতত শুরু করা যাবে। অত টাকা আমার নেই। অত টাকা বকুলের পক্ষেও একসঙ্গে দেওয়া সম্ভব নয়। টাকাটা একমাত্র মন্টুবাবুই দিতে পারেন।'

'কিন্তু মন্টুবাবু আপনাকে অত টাকা দেবেন কেন?'

'আপনাকে আমি যে কথাগুলো বললাম, আপনি মন্টুবাবুকে ঠিক সেই কথাগুলোই বলবেন। এই কথাগুলো জানবার জন্যই তো মন্টুবাবু আপনাকে পয়সা দিচ্ছেন। আমার দশ লাখ টাকার প্রস্তাবের কথাটাও বলবেন। বলবেন, টাকাটা পেলে আমি চিঠি এবং ছবি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে চিরতরে তাদের মুক্তি দেব। আর টাকাটা না পেলে চিঠি ও ছবির কথা পাড়ার লোকে সকলে জানতে পারবে। হয়তো তাঁর প্রেসেও জানাজানি হবে। চিঠি ও ছবিগুলো বেশ রগরগে। পাবলিক এনজয় করবে। এখানে একাধিক সম্ভাবনা আছে। একটা হতে পারে, মন্টুবাবু নিজের সম্মান বাঁচানোর জন্য আমাকে টাকাটা দিয়ে দিলেন, কিন্তু বকুলকে তিনি ক্ষমা করলেন না। তাঁদের সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে গেল। এতে আমার ডবল লাভ। টাকাও পেলাম, বকুলের ওপর প্রতিশোধটাও নেওয়া গেল। আরেকটা সম্ভাবনা, পরিবারের সম্মান বাঁচানোর জন্য টাকাটা মন্টুবাবু দিয়ে দিলেন, কিন্তু তিনি বকুলে এতটাই মজে গেছেন যে বকুলকেও ছাড়তে পারলেন না। বকুলকে যদি মন্টুবাবু ক্ষমা করে দেন, আমার কিছু করার নেই। কিন্তু সেক্ষেত্রে অন্তত টাকাটা আমি পেয়ে যাচ্ছি। তৃতীয় সম্ভাবনা, মন্টুবাবু টাকাটা দিলেন না। তাহলে মন্টুবাবু বকুলকে ক্ষমা করুন বা না করুন, চিঠি এবং ছবি পাড়ার লোককে জানিয়ে বকুলকে যেটুকু হেনস্থা করা যাবে সেটুকুই আমার লাভ। ..... আমি ভেবেছিলাম কথাগুলো নিজেই মন্টুবাবুকে বলব। আপনাকে পেয়ে কাজটা সহজ হয়ে গেল। মন্টুবাবুকে বলবেন চটপট একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে সরাসরি আমার সঙ্গে কথা বলতে। দরকার পড়লে আমি নিজেও তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি। তবে, আমি একটু তাড়ায় আছি। আর হ্যাঁ, পুলিশের কাছে গিয়ে খুব লাভ নেই। আমাকে পুলিশে ধরলে

চিঠি-ছবির কথা সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার লোক জেনে যাবে। আমি সে ব্যবস্থা করে রেখেছি। আপনাকে আর কিছু বলার নেই। আশা করি আমার সব কথা বুঝতে পেরেছেন। দেবী, ভেতরে আয়। দোকানের গেট খুলে দে। দু'টো বেজে গেছে।'

(২)

মন্টুবাবুর ফোনটা অনেকক্ষণ বেজে যাচ্ছে। হয়তো রাস্তায় আছেন তাই শুনতে পাচ্ছেন না। আদিত্য একটা মেসেজ করল, 'আমি সন্ধে সাতটা অব্দি আমার আপিসে আছি। একবার আসুন। খুব জরুরি দরকার।' তারপর মোবাইলে অমিতাভর নম্বরটা লাগাল। এই ফোনটা আবার সুইচড অফ। ক্লাসে আছে নাকি? আদিত্য ঘড়ি দেখল। বিকেল সাড়ে পাঁচটা। এতক্ষণ তো ক্লাস হবার কথা নয়। ফোনটা বেজে বেজে থেমে যাবার পর আদিত্য রত্নার নম্বরটা লাগাতেই ওপার থেকে কলকাকলি শোনা গেল, 'একি টেলিপ্যাথি নাকি রে? এইমাত্র তোকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম।'

'আমাকে? কেন?'

'বৃহস্পতিবার রাত্তিরে গৌতম আর ওর বউ মালিনীকে ডিনারে ডেকেছি। অমিতাভকে বললাম তোকে খবর দিতে। তুই না থাকলে ডিনার জমবেই না। তো আমার কর্তার সময়ই হচ্ছে না তোকে জানানোর। আজ সারাদিন ফোন বন্ধ করে গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনে মল্লার ফেস্টিভাল শুনছে।'

'ও হ্যাঁ, কাল অমিতাভ বলছিল বটে গান শুনতে যাবে। তা তোদের সঙ্গে গতকাল দেখা হল তখন তো ডিনারের কথা কিছু বললি না?'

'কী করে বলব? আজ সকালে শুনলাম মালিনী কলকাতায় এসেছে। দু'তিন দিন থাকবে। শুনে ওদের খেতে বললাম। অমিতাভ বলল, তোকে জানিয়ে দেবে। হয়ত রাত্তিরে ফোন করত। আমি তার আগেই জানিয়ে দিলাম। তুই আসতে পারবি তো?

'অবশ্যই পারব। গৌতমের সঙ্গে আমার খুব দরকার। তোদের বাড়িতে গিয়ে রথ দেখা কলা বেচা দু'টোই সেরে নেব। তবে মালিনী থাকলে চোয়াল ব্যথা করে ইংরিজি বলতে হবে। একটু ভাল খাবার-দাবার রাখিস। নইলে পোষাবে না।'

'খাবার ভালোই থাকবে। তবে আজকাল মালিনী বেশ বাংলা বুঝতে পারে। বলতেও পারে একটু একটু। তোর চোয়াল ব্যথা হবে না।'

'দেখা যাক।'

ফোনটা পকেটে পুরে আদিত্য শ্যামলের খোঁজে আপিস ঘরের বাইরে এল। কোথায় শ্যামল? সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে দেখল গেটের সামনে টুলের ওপর শ্যামল বসে আছে।

'তোমার সঙ্গে কথা ছিল, একবার ওপরে আসবে? আর হ্যাঁ, আসার সময় একটু চা এনো।' আদিত্য শ্যামলকে একটা দশ টাকার নোট এগিয়ে দিল।

শ্যামল চা ঢালছিল। আদিত্য সিগারেট ধরিয়ে বলল,

'গতকাল তোমার কাছে কি কেউ আমার খোঁজ করছিল?'

'হ্যাঁ একজন ছোকরা মতো বাবু আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিল। বলল, আদিত্যবাবুকে খুব দরকার। আমি ভাবলাম কোনও মক্কেল হবেন। আপনার আপিস ঘরটা দেখতে চাইলেন। আমি বললাম আজ রবিবার সব বন্ধ, তবু শুনল না। দোতলায় উঠে আপনার নেমপ্লেট দেখে জিজ্ঞেস করলেন আপনার মক্কেল-টক্কেল কেমন হয়।আগের দিন যে একজন বাবু এসেছিল আমি তেনার কথা বললাম। সেই মক্কেলের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করল। তারপর চলে গেল।'

'তোমায় কিছু বকশিস দিয়ে গেল নিশ্চয়।'

'তা, হ্যাঁ, মানে ভালোই বকশিস দিল। সেদিন যে কার মুখ দেখে উঠেছিলুম।'

'ঠিক আছে, তুমি এখন যেতে পার।'

আদিত্য ভাবছে। সকাল থেকে অনেক ঘটনা ঘটল। মনে হচ্ছে ভূতুড়ে টেলিফোন রহস্যের কিনারা হয়ে গেছে। আর কিছু বোঝবার নেই। সত্যিই কি আর কিছু বোঝবার নেই? হয়তো নেই, তবু কোথায় যেন একটা খটকা থেকে যাচ্ছে। অথচ খটকাটা যে কোথায় আদিত্য কিছুতেই ধরতে পারছে না। আদিত্যর মুস্কিল হল সে খুব তাড়াতাড়ি কিছু ভাবতে পারে না। তবে একটা ভাবনা নিয়ে অনেকদিন লেগে থাকতে পারে। তার বন্ধু অমিতাভ বলে এটা খাঁটি গবেষকের গুণ। ভাগ্যের দোষে আদিত্য গবেষণার বদলে গোয়েন্দাগিরিতে নেমেছে।

ফোনটা বেজেই থেমে গেল। বিমল মিসড কল দিয়েছে। মানে ফোন করতে বলছে। আদিত্য বিমলের নম্বরটা ডায়াল করল।

'দু'টো জিনিস জানানোর ছিল স্যার। দরকারি কিনা বুঝতে পারছি না, তবু ভাবলাম জানিয়ে রাখি।' বিমলের গলায় একটু কিন্তু কিন্তু ভাব।

'বল।'

'মন্টুবাবুর পাশের বাড়িতে এক ভদ্রলোক থাকেন। রামানুজ না কি যেন একটা নাম। ভদ্রলোক একটু অদ্ভুত আছেন। রাতবিরেতে পাড়া বেড়াতে বের হন। পোড়ো কারখানাটাতেও রাত্তির বেলা ঢুকতে দেখেছি। অত রাত্তিরে ওইসব জায়গায় কী করেন বলা মুস্কিল।'

'আর কি জানলে?'

'আজ আবার সেই শালাবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বোনের কাছে এসেছিলেন। রাস্তায় হঠাৎ দেখা। চা খাওয়ালাম। কথায় কথায় বললেন, মন্টুবাবুর আর একটা বাড়ি আছে। বাড়িটা ঠিক কোথায় শালাবাবু জানেন না। সম্ভবত পাইকপাড়ার দিকে কোথাও। মন্টুবাবুর এক বিধবা শালী একসময় সেখানে থাকতেন। শালাবাবু বলছিলেন, বড়লোকদের কত সুবিধে ভাবুন। একটা বাড়ি ফাঁকাই পড়ে আছে। ইচ্ছে হল, কিছুদিন শালীকে সেখানে থাকতে দিলেন। আবার ইচ্ছে হল কিছুদিন ফাঁকা ফেলে রাখলেন।'

'সুশান্ত আর দেবীর গতিবিধি কেমন?'

'ওরা তো দোকান থেকে বেরোয়ই না স্যার। আমি দোকানের উল্টোদিকে একটা গাছের আড়ালে টানা আট-নয় ঘণ্টা কাটালাম। ওদের তো একবারের জন্যেও বেরোতে দেখলাম না।'

'শোনো, তোমার পেছনে টিকটিকি লেগেছিল। তুমি ধরা পড়ে গেছ। তোমার পেছন পেছন এসে সুশান্তর লোক আমারও বাড়ি, আপিস সব চিনে নিয়েছে। আর তোমার ওই পাড়ায় যাবার দরকার নেই।'

ওপারে কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর বিমলের গলাটা প্রায় হাহাকারের মতো শোনাল, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না স্যার। আমার পেছনে কী করে টিকটিকি লাগবে? আমি এই ধরনের কাজ আগেও তো করেছি। কখনও এরকম হয়নি। আমি আগাগোড়া ভীষণ সাবধান ছিলাম স্যার। আপনি তো সাবধান হতেই বলে দিয়েছিলেন। আমি আপনাকে খুব বিপদে ফেললাম। কী বলব বুঝতে পারছি না।'

'কিছু বলতে হবে না। তেমন ক্ষতি কিছু হয়নি। এই কাজটা, ধরে নাও, শেষ হয়ে গেল। তোমার আরও কিছু টাকা পাওনা আছে। ক'দিন পরে যোগাযোগ কোরো।'

'আমি আর টাকা নিতে পারব না স্যার। আমি তো আপনার কাজটা ঠিকমত করতেই পারলাম না।'

'বললাম তো আমার কাজের কোনও ক্ষতি হয়নি। তুমি ক'দিন বাদে ফোন করে আমার বাড়ি বা অফিসে এস। আজ রাখলাম।'

আদিত্য প্রায় জোর করেই ফোনটা কেটে দিল। নাহলে বিমলের আত্মবিলাপ কখন থামত কে জানে।

সন্ধে সাড়ে ছটায় মন্টুবাবু এলেন। তাঁকে কিছুটা উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। সুশান্তর পুরো গল্পটা তাঁর কাছে বলতে প্রায় আধঘণ্টা লেগে গেল। সুশান্ত যা যা বলেছে সবটাই মন্টুবাবুকে জানিয়ে দিল আদিত্য। যখন মন্টুবাবুর

টাকা নিয়েছে তখন সব কথা জানানোটাই তার কর্তব্য। সে মন্টুবাবুর কাছ থেকে খানিকটা চরম প্রতিক্রিয়া আশা করছিল। কার্যত কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। সব শুনে মন্টুবাবু অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ধরা-ধরা গলায় বললেন,

'আমি এইরকমই একটা কিছু আশঙ্কা করছিলাম। আপনি খুব ভাল কাজ করেছেন আদিত্যবাবু। টেলিফোন রহস্য সমাধান করে দিয়েছেন। আর আপনাকে দরকার পড়বে না। সুশান্ত যখন বলেছে, সে নিশ্চয় আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেবে। আমি কী করব সেটা আমাকেই ভাবতে হবে। বকুলের সঙ্গেও খোলাখুলি আলোচনা করতে হবে। তবে একটা অনুরোধ। অন্তত আজকের রাত্তিরটা আপনি সুলতার দেওর হয়ে আমাদের বাড়িতে ফিরে চলুন। বকুল আজ রাত্তিরে ওর দাদা-বৌদি-ভাইজিকে খেতে বলেছে। তারা আপনার সঙ্গে আলাপ করতে আসছে। পাশের বাড়ির রামানুজবাবুও থাকবেন। আলাপ হলে দেখবেন আসলে লোকটা মোটেই খারাপ নয়। সুলতা ছোটবেলায় রজনীদের খুব নেওটা ছিল। ওরা সুলতার গল্প শুনতে চাইবে। ওদের সামনে একটা ধোঁকার টাটি খাড়া করে রাখা দরকার। অনেক কেচ্ছা হয়েছে, পাড়ায় আর নতুন করে কেচ্ছা চাই না।'

শেষের কথাগুলো বলতে গিয়ে মন্টুবাবুর গলাটা কান্নায় জড়িয়ে এল।

(৩)

বকুল বেশ সেজেছে। নীল পাড় দেওয়া কালো শাড়ি, চুল খোলা, ভুরুর ওপরে বড় টিপ। আদিত্যর মনে হল, মাজা রঙে কালো শাড়িটা বেশ মানায়। খানিক আগে সস্ত্রীক, সকন্যা রজনী বসাক এসে পৌঁছেচেন। আদিত্য অবশ্য আরও আগে পৌঁছে গিয়েছিল। বসার ঘরে গল্প-সল্প হচ্ছে। মালতী নানারকম ভাজাভুজি এনে টেবিলে রাখল। মন্টুবাবু ভাবনায় ডুবে আছেন, কথা প্রায় বলছেনই না। কথা বলার ব্যাপারে রজনী বসাক অবশ্য একাই একশো। তিনি আদিত্যর মতো অনুগত শ্রোতা মনে হয় বহুদিন পাননি। বাঙালি যে আজকাল আর আগের মতো ঘরকুনো নেই এই তাঁর প্রতিপাদ্য। তিনি বলছিলেন, 'বুঝলেন ভাই, মধ্যবিত্ত বাঙালি যে আজকাল কোথায় কোথায় বেড়াতে যায় সে আপনি ভাবতেই পারবেন না। ইয়োরোপ-আমেরিকা তো আছেই, তাছাড়া মিশর, আফ্রিকান সাফারি, এমনকি মস্কো থেকে রিগা অব্দি সেই বিখ্যাত ট্রেন যাত্রা, কোনটাতেই আর বাঙালি পিছপা নয়। অনেক পরিশ্রম করে একটা ভ্রমণ-সংস্থা দাঁড় করিয়েছি, জানেন। বাঙালিকে সারা পৃথিবী দেখাব, এটাই ছিল স্বপ্ন। সেই স্বপ্নে এখনও মশগুল হয়ে আছি।'

বকুল তার বৌদির সঙ্গে গল্প করছে। সাদামাটা সাংসারিক কথোপকথন। বকুলের কিশোরী ভাইজি মোবাইলে নিজের মনে কী যেন দেখছে। বোধহয় ফেসবুক।

'সুলতা খুব গিন্নিবান্নি হয়ে গেছে নিশ্চয়। ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করে ওকে।' বকুলের বৌদি আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বললেন। 'আমাদের কথা বলে সুলতা? মার কথা বলে? মাসির কথা বলে? মা মরে যাবার পর তো মাসির কাছেই মানুষ। মাসি চলে গেল, সেই থেকে বিয়ে হওয়া অব্দি আমার কাছেই সব আবদার।'

'বৌদির মাসি ছিল জানতাম না তো।' আদিত্য অবাক হবার ভান করল।

'ছিল বৈকি।'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই বেল বাজল। পাশের বাড়ির রামানুজবাবু ঘরে ঢুকলেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে সোজা রজনীবাবুর পাশে গিয়ে বসলেন। তাঁর বিশাল শরীর থেকে অতি মিহি কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'এই যে ভূপর্যটক সাহেব আবার কবে অজানার উদ্দেশে পাড়ি দিচ্ছেন? আমাকেও এবার সঙ্গে নিয়ে চলুন না।'

'আমি আপনাকে নিয়ে যাবার কে? পয়সা খরচা করলেই যেতে পারবেন।' রজনীবাবুর গলাটা একটু বিরক্ত শোনাল।

'একটু কমসম করে দিন। পাসপোর্টটা কবে থেকে করে রেখেছি। পড়েই আছে। তা, এবার যাচ্ছেন কোথায়?'

'স্ক্যান্ডিনেভিয়া যাচ্ছি। নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড। যেতে হলে দু'এক দিনের মধ্যেই জানিয়ে দিতে হবে।'

'দক্ষিণা কত?'

'আমার ঠিক মনে নেই। কাল আমাদের আপিসে এসে জেনে যাবেন।' রজনীবাবু নির্লিপ্ত গলায় বললেন।

'আমাদের রজনীবাবুর একটা ট্র্যাভেল এজেন্সি আছে। রজনীবাবু তার নাম দিয়েছেন 'পান্থজনের সখা'। কী পোয়েটিক নাম বলুন তো।' রামানুজ চাটুজ্জে আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বললেন। 'কিন্তু নাম পোয়েটিক হলে কী হবে, আকাল-চচ্চড়ে দাম। আমাদের মতো হ্যাভনটসদের জন্য নয়। বলি, পাড়ার লোকদের একটু ডিস্কাউন্ট দিতে হয় তো।'

'আপনার সত্যি সত্যি যে কোথাও যাবার ইচ্ছে আছে এমন প্রমাণ তো কখনো পাইনি।'

রজনীবাবু টেবিল থেকে একটা মাসিকপত্র তুলে নিয়ে মুখ ঢাকলেন। রামানুজ চাটুজ্জে আসার পর থেকে তাঁর কথার খেই হারিয়ে গেছে। আদিত্যর সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছিল। সে মন্টুবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল,

'একটু বাইরে থেকে আসছি।'

সে ঘর থেকে বেরিয়ে সদর দরজার দিকে এগোচ্ছে, খেয়াল করেনি কখন বকুল তার সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

'ছাতে গিয়ে সিগারেট খেতে পারেন। চলুন ছাতটা দেখিয়ে দিই। আমাদের ছাতটা কিন্তু খুব সুন্দর।'

দোতলা পেরিয়ে তিনতলায় ছাত। অন্ধকার। বকুল আদিত্যর দিকে মুখ করে পাঁচিলে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। সত্যিই চমৎকার ছাত। একটু দূরে ট্রেন লাইন দেখা যায়। লাইনটা খানিকটা গিয়ে বাঁক নিয়েছে। সুশান্ত আর দেবীর সাইবার কাফেটাও এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। বকুলের শরীর থেকে মৃদু পারফিউমের গন্ধ আসছে। খুব দামি বিদেশি পারফিউম। আদিত্যর একটু নার্ভাস লাগছিল। স্বাভাবিক হবার জন্য সে সিগারেট ধরাল।

'আমারও সুলতাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে জানেন। আরও ইচ্ছে করে ওর ছেলেকে দেখতে। এতদিনে অনেক বড় হয়ে গেছে নিশ্চয়। ওরা এদিকে একদম আসে না।' বকুলকে কিছুটা বিষণ্ণ দেখাল।

'বাবা বুড়োবয়সে বিয়ে করেছে বলে সুলতার প্রচণ্ড অভিমান। বাবার ওপর অভিমান করে কলকাতাকেই ভুলে গেছে। আমাদের সঙ্গেও আর যোগাযোগ নেই। সুলতা ছোটবেলায় আমাদের বাড়িতে খুব আসত। বলতে গেলে আমার বৌদিই ওকে মানুষ করেছে। বিশেষ করে ওর মাসি হারিয়ে যাবার পর থেকে।'

'সুলতা বৌদি আপনার বৌদির কথা খুব বলে। বলে, ওর মাকে ও কখনই সুস্থ দেখেনি। আপনার বৌদিই ওর মায়ের মতো। কিন্তু মাসির কথা কখনো বলেনি তো।'

'ওই দেখুন, আমি আবার আপনাকে এসব পুরোনো কথা বলতে শুরু করলাম। সুলতার মাসির কথা এই বাড়িতে কেউ বলে না। সুলতাকেও ছোট থেকে শেখানো হয়েছিল মাসির কথা না বলতে। অথচ সুলতার মাসিকে আমার খুব মনে আছে। মা মারা যাবার পর সুলতা মাসির কাছেই অনেকটা সময় মানুষ হয়েছে। মাসি অল্পবয়সে বিধবা হয়েছিলেন। প্রায়ই এবাড়িতে আসতেন। মাঝে মাঝে থেকেও যেতেন। সুলতা তার কাছেই বড় হচ্ছিল। তারপর হঠাৎ একদিন মাসি কোথায় যেন হারিয়ে গেলেন। আর কোনোদিন ফিরে এলেন না। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছিল। তারাও কিছু করতে পারল না। পরে শুনেছিলাম মাসি নাকি কোনও বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে গেছেন। পারিবারিক কলঙ্ক। সেই কলঙ্ক চাপা দেবার জন্য মাসির কথা এবাড়িতে আর কেউ মুখে আনত না। আমার খুব কষ্ট হত। সুলতা তখন এতটাই ছোট নয় যে এসব

কিছু বুঝবে না। হয়তো ইচ্ছে করেই সুলতা তার মাসির কথা ভুলে গেছে। হয়ত মাসির ওপরেও একটা অভিমান জমে আছে।'

বকুল একটু চুপ করে রইল, তারপর খানিকটা ক্ষমা চাওয়ার মতো করে বলল, যাগ গে, অনেক অদরকারি কথা বলে ফেললাম, সুলতাকে যেন বলবেন না।'

আদিত্য অনেকক্ষণ চুপ করে আছে। বকুলও আর কথা বলছে না। নীচে টেলিফোনটা বেজে উঠেছে। একটু কি শিউরে উঠল বকুল? একটা ট্রেন আসছে। মালগাড়ি। শম্বুক গতিতে চলতে চলতে একসময় বাঁকের মুখে হারিয়ে গেল ট্রেন। সুশান্তর দোকানের পেছনের দরজা দিয়ে কে যেন বেরোল। গলিতে এসে দাঁড়াল। দূরে লেভেল ক্রসিং-এর দরজা ওপরে উঠে যাচ্ছে। সাইকেল, সাইকেল রিক্সা, ম্যাটাডোর ধীরে ধীরে লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে যাচ্ছে। এখান থেকে সব দেখা যায়।

'আমার কর্তা বললেন আপনি কাল চলে যাচ্ছেন। ট্রেনের টিকিট পেয়ে গেছেন শুনলাম।' বকুল নিস্তব্ধতা ভাঙল।

'কাল রাত্তিরে ট্রেন, বিকেল-বিকেল বেরিয়ে পড়তে হবে।'

'দুটো দিন থাকলেন, আমাদের খুব ভাল লাগল।'

'আমারও খুব ভাল লাগল। আজ শহরটা একটু ঘুরে দেখারও সুযোগ পেলাম। ভাগ্যিস বৃষ্টি ছিল না।'

আদিত্যর কথা শেষ হতে না হতে দু'একটা বৃষ্টির ফোঁটা ওদের গায়ে এসে পড়ল।

'দেখেছেন, বৃষ্টির কথা বলতে না বলতেই বৃষ্টি এসে গেল। মানুষ হলে বলতাম অনেকদিন বাঁচবে। জোরে বৃষ্টি নামবে মনে হচ্ছে।'

'সত্যি বলতে কি বৃষ্টি আমার বেশ ভালোই লাগে। ছোটবেলায় সুযোগ পেলেই বৃষ্টিতে ভিজতাম। আর ভিজলেই জ্বর।' আদিত্য হাসল। বকুলের দিকে তাকাল। বকুল চোখ নামিয়ে নিয়েছে। একটু পরে বলল, 'চলুন নীচে যাওয়া যাক।' অন্ধকারে বকুলের শেষ কথাগুলো খানিকটা দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনাল।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

(১)

সকালটা ইচ্ছে করেই আদিত্য হাতে রেখেছিল। বকুলকে সে বলেছে রাত্তিরের ট্রেন, অতএব বিকেলে বেরোতেই হবে। তার আগে কয়েকটা কাজ সেরে নেওয়া দরকার। মন্টুবাবু আটটা বাজতে না বাজতেই বেরিয়ে গেছেন। আদিত্য যখন বেরোল তখন সাড়ে নটা। বকুলকে বলল, টুকিটাকি কিছু কেনাকাটা আছে। বকুল বলল, 'তাড়াতাড়ি ফিরবেন, দুপুরে একসঙ্গে খাব।'

কিছুটা হেঁটে, কিছুটা অটোতে চড়ে আদিত্য থানায় পৌঁছল দশটা নাগাদ। দেখল, একজন দোহারা চেহারার অফিসার ডেস্কে বসে আছেন।

'বড়বাবু, মানে বলাইবাবুর সঙ্গে দেখা করতে পারি?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'বড়বাবু সাড়ে এগারোটা বারোটার আগে আসেন না, দরকার থাকলে আমাকে বলতে পারেন।'

আদিত্য ইতস্তত করল। তারপর বলল, 'বড়বাবুর ফোন নম্বরটা আমার সঙ্গে আছে। আমি ওঁকে একটা ফোন করে নিই?'

'যাকে ইচ্ছে ফোন করুন। তবে এই জায়গাটা ছেড়ে ওই বেঞ্চিটাতে বসে ফোন করুন।'

আদিত্য বেঞ্চিতে বসে বড়বাবুর নম্বরটা লাগাল। একটা গম্ভীর পুলিশি গলায় 'হ্যালো' শুনতে পেয়ে বলল, 'আমি আদিত্য মজুমদার বলছি। আমার কথা জয়েন্ট কমিশনার গৌতম দাশগুপ্ত মনে হয় আপনাকে বলেছে।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। আদিত্যর মনে হল ওপারে যিনি ফোন ধরে আছেন তিনি স্মৃতি হাতড়াচ্ছেন। আধ মিনিট পরে ভেসে এল,

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। আপনার কথা জয়েন্ট কমিশনার সাহেব অবশ্যই বলেছেন। সাহেব বলেছেন আপনাকে সব রকমের সাহায্য করতে। আপনি বলুন আমি আপনার জন্য কী করতে পারি?' বড়বাবুর গলায় এখন মধু ঝরে পড়ছে।

'আমি আপনার জন্য থানায় অপেক্ষা করছি। আপনি কখন আসবেন?'

'এই মিনিট পনেরোর মধ্যে চলে আসছি স্যার।'

'আসুন। এলে কথা হবে।'

ফোন রাখার কিছুক্ষণ পরেই আদিত্য লক্ষ করল ডেস্কের অফিসার বাবুটির কাছে একটা ফোন এসেছে। এবং তার খানিকটা পরে যখন থানার বাবুদের জন্য কেটলি করে চা এল, ডেস্কের বাবুটি আদিত্যর সামনে এক ভাঁড় চা নিয়ে এসে একগাল হেসে বললেন,

'খেয়ে নিন স্যার। বড়বাবু এসে পড়লেন বলে।'

নিশ্চয় বড়বাবু ফোন করে আদিত্যকে আদর-আপ্যায়ন করার কথা বলে দিলেন। আদিত্যর মনটাও চা-চা করছিল। চা শেষ করে সে একটা সিগারেট খেতে সবে বাইরে বেরিয়েছে, দ্যাখে বড়বাবুর জিপ থানার সামনে এসে দাঁড়াল।

বড়বাবু মানুষটি নাতিদীর্ঘ, স্থূলকায়, কৃষ্ণবর্ণ ও বিরলকেশ। ভারসাম্য রাখার জন্যই বোধহয় নাকের নীচে প্রকাণ্ড গোঁফ রেখেছেন। মানুষটি প্রয়োজন বিশেষে বিনত বা উদ্ধত হতে পারেন। এককথায়, আদিত্যর মনে হল, বড়বাবু লোকটি অতিশয় ঘোড়েল। আবার চা এল, সঙ্গে সিঙ্গাড়া-মিষ্টি। আদিত্য একে সকালে কম খায় তার ওপর একটু আগে ভারি ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়েছে, আর কিছু খাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে সে কাজের কথায় এল,

'গৌতম নিশ্চয় আপনাকে বলেছে কেন আমি এখানে এসেছি। তবু আর একবার বলছি, আপনার অঞ্চলে ড্রাগ পেডলারদের যে গ্যাংটা বেশ কিছুদিন ধরে দৌরাত্ম করে বেড়াচ্ছে তাদের ধরার জন্য গৌতমকে আমি সাহায্য করছি। এ-ব্যাপারে আপনারও আন্তরিক সাহায্য চাই।'

'আমি তো স্যার একশ ভাগ সাহায্য করতে রাজি। দাশগুপ্ত সাহেব বললে আমি করতে পারি না এমন কাজ নেই। অমন সৎ দক্ষ অফিসার আর হয় না। তবে কিনা, যেটা আমি দাশগুপ্ত সাহেবকেও বারবার বলছি, এ তল্লাটে ড্রাগ পেডলারদের কোন গ্যাং আর নেই স্যার।'

'গ্যাং-ই নেই?'

'না স্যার। গ্যাং-ই নেই। আগে ছিল। সেই গ্যাংটা সুশান্ত হালদার বলে একজন চালাত। দেবীরঞ্জন বসাক ছিল তার ডানহাত। কিছুদিন আগে তাদের জেল হয়। জেলের ভাত খেয়ে ছেলে দুটো একেবারে বদলে গেছে। দেখবেন, দুজনে মিলে একটা সাইবার কাফে চালাচ্ছে। ভালোই চলছে। আমাদের তো স্যার এইসব দাগী আসামীদের ভালো হতে সাহায্য করা উচিত। তাই না স্যার?'

'আপনাদের এখানে যদি ড্রাগ পেডলাররা না থাকে তাহলে দুমাস অন্তর রেললাইনের ধারে লাস পড়ে কেন? আব্দুলের ঠেকে পাতাখোররা ভিড় করে কেন?'

'স্যার, আব্দুল কোথা থেকে তার মাল নিয়ে আসে আমরা এখনো ধরতে পারিনি। তবে আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি এই অঞ্চলে এখন আর কোনও গ্যাং নেই স্যার। আর লাস পড়ার কথা যদি বলেন, এদিকটায় এখনও অনেক ওয়াগন ব্রেকার আছে। জায়গাটা রেল লাইনের ধারে তো। তাদের মধ্যে বখরা নিয়ে মারামারি লেগেই থাকে। এসব কথা কর্তারা লালবাজারে বসে ঠিক বুঝতে পারেন না স্যার। সমস্ত ঝামেলা, গণ্ডগোল ড্রাগওলাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়।'

বড়বাবু চুপ করলেন। আদিত্য আর কী জিজ্ঞেস করবে ভেবে পেল না। লোকটা, সন্দেহ নেই, ড্রাগওয়ালাদের টাকায় আকণ্ঠ ডুবে আছে। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আদিত্য বলল,

'আমাকে সাহায্য করার জন্য অনেক ধন্যবাদ।'

'আপনাকে সব রকম সাহায্য করা তো আমার কর্তব্য স্যার। বিশেষ করে জয়েন্ট কমিশনার সাহেব যখন আপনার কথা এত করে বলেছেন।'

বড়বাবুর কণ্ঠে একটা প্রচ্ছন্ন শ্লেষ আছে। একটা চ্যালেঞ্জ। আদিত্য আর কথা না বাড়িয়ে থানা থেকে বেরিয়ে পড়ল।

(২)

ফেরার পথে মন্টুবাবুর পড়শি রামানুজ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা। ভদ্রলোকের হাতে বাজারের থলে। পুঁইশাক, কুমড়োর ফালি উঁকি মারছে।

'আসুন না আমার বাড়িতে, এক কাপ চা খেয়ে যাবেন।' ভদ্রলোক বললেন, 'একাই থাকি, আসুন না কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলা যাবে।'

আদিত্য ঘড়ি দেখল, সাড়ে এগারোটা। বকুল একসঙ্গে খাবে বলেছিল। নিশ্চয় সেটা সাড়ে বারোটার আগে নয়। হাতে সময় আছে। কিছুক্ষণ রামানুজবাবুর সঙ্গে কাটালে মন্দ কী?

রামানুজবাবুর বাড়িটা ছোট, কিন্তু সাজানো। একদিকে রান্নাঘর। রামানুজবাবু বাজার নামিয়ে রেখে চায়ের জল চাপালেন।

'আপনার মতো আমিও পশ্চিমের লোক। আমার ঠাকুরদাদা লাহোরে ওকালতি করতেন।' রামানুজবাবু টি পটে দু চামচ চা পাতা দিতে দিতে বললেন, 'দেশভাগের পর আমার বাবা আর পশ্চিমবঙ্গে ফেরেনি। তবে দুই কাকা এই কলকাতাতেই সেটল করেছিলেন। তাঁদের একজন এখনও বেঁচে আছেন। এই দুই কাকার পরিবারই এখন আমার আপনার জন।'

আদিত্য লক্ষ করল রামানুজবাবুর সেই কমিকাল ভঙ্গীটা আর নেই। গলার আওয়াজ যদিও সেইরকমই মিহি, কিন্তু তার মধ্যেই একটা সিরিয়াস ভাব রয়েছে।

'আমি জয়পুরে বড় হয়েছি। বাবা-মায়ের এক সন্তান। কলেজ থেকে বেরিয়ে রাজস্থান পুলিশে চাকরি পেলাম। বছর দশেক সেখানেই চাকরি করলাম। তারপর একটা বেসরকারি কোম্পানির সিকিউরিটি অফিসার হয়ে আরও পঁচিশ বছর। সংসার করা হয়ে ওঠেনি। ভাবলাম শেষ জীবনটা শিকড়ে ফিরে যাব। কলকাতায় ফিরে এলাম। তাও ছয় বছর হল। এখানকার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মিলে-মিশে ভালই আছি। এই দেখেছেন, নিজের কথাই বলে যাচ্ছি। আপনার কথা বলুন। আপনার কথা শুনব।'

'আমার তো বলার মতো তেমন কিছু নেই। মধ্যপ্রদেশে জন্ম-কম্ম। এখন সেখানেই একটা ব্যাঙ্কে চাকরি করি। আমার জীবনে উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই যা বলা যায়।' আদিত্য সাবধান হয়ে বলল।

'সবার জীবনেই কিছু না কিছু থাকে। আপনারও নিশ্চয় আছে। তবে বলতে না চাইলে অন্য কথা।' রামানুজবাবু একটু থামলেন, তারপর আস্তে আস্তে বললেন,

'আপনি যদি আপনার কথাটা বলতেন তাহলে আমিও আমার কিছু কথা আপনাকে বলতে পারতাম।'

আদিত্য একটু ঘামছিল। খুব তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। রামানুজবাবুকে কি বিশ্বাস করা যায়? আদিত্য ভাবছে কী করবে। মনে পড়ল, কলেজে তার প্রিয় মাস্টারমশাই প্রফেসর শান্তনু মিত্র বলতেন, একজন চিন্তাশীল মানুষের সব থেকে বড় অস্ত্র তার ইন্টুইশন, এমন একটা অনুভূতি যেটা সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। কথাটা যে কতটা দামী গোয়েন্দাগিরি করতে এসে আদিত্য পদে পদে টের পায়। এখানেও তার ইন্টুইশনকেই কাজে লাগাতে হবে। তার মন বলছে, রামানুজ চাটুজ্জেকে বিশ্বাস করা যায়। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর সে বলল,

'আমিও আপনার সঙ্গে কিছু কিছু জিনিস আলোচনা করতে চাই। সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আপনার সন্দেহটাই ঠিক। আমি একজন বেসরকারি গোয়েন্দা। মন্টুবাবু আমাকে ভূতুড়ে টেলিফোন রহস্য সমাধান করার জন্য নিয়োগ করেছেন। তবে আমার এখানে আসার আর একটা উদ্দেশ্য আছে। এই অঞ্চলে একটা ড্রাগ ডিলারদের গ্যাং বেশ কিছুদিন ধরে দৌরাত্ম্য করছে। পুলিশ হাজার চেষ্টা করেও তাদের মাথাটাকে ধরতে পারছে না। এই গ্যাংটাকে ধরার ব্যাপারে পুলিশকে আমি সাহায্য করছি। কিন্তু স্থানীয় থানা থেকে কোনও সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। একটু আগে ওসির সঙ্গে কথা বলে মনে হল তিনি ড্রাগ পেডলারদের থেকে নিয়মিত টাকা পেয়ে থাকেন। তিনি বলার চেষ্টা করলেন, এই অঞ্চলে ওই ধরনের গ্যাং-ট্যাং কিছু নেই। আপনি তো এখানে বেশ কিছুদিন আছেন আপনার কিছু চোখে পড়েছে? মানে অন্য কারো চোখে না পড়লেও আপনার ট্রেনড চোখে অনেক কিছু নজরে আসতে পারে।'

'আপনি আমার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বললেন, এতে আমার খুব ভাল লাগছে। আপনার মতো কারও সঙ্গে কথা বলার জন্য আমি দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে আছি। আমি পুলিশকে সাহায্য করতে চাই। কিন্তু চেষ্টা করে দেখেছি সেটা সম্ভব নয়। আপনি একেবারে ঠিক কথাটা বলেছেন। এই অঞ্চলের পুলিশরা সব বিক্রি হয়ে গেছে। আমার কথা তারা শুনবে কেন?' রামানুজবাবুকে বেশ উত্তেজিত মনে হল।

'আপনি পুলিশকে কী বলতে গিয়েছিলেন?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'তিনটে জিনিস আমার বলার ছিল। আমার ধারণা মন্টুবাবুর বাড়ির পেছনের গলিটাতে কোনও রহস্য আছে। ঠিক কী বলতে পারব না, গলিটা আমার বাড়ি থেকে দেখাও যায় না, পুরোনো কারখানাটার ভাঙা একটা পাঁচিলে আড়াল পড়ে যায়। কিন্তু কয়েকবার ওখান দিয়ে আসার সময় দেখেছি কারা যেন রয়েছে। আমাকে দেখে যেন সরে গেল। সব মিলিয়ে আমার মনে হয়েছে গলিটার ওপরে পুলিশের নজর রাখা উচিত।'

'এটা তো একটা জিনিস হল। আর কিছু?'

'হ্যাঁ, দ্বিতীয়ত আমার মনে হয়েছে আমাকে এই বাড়ি থেকে কেউ তাড়াবার চেষ্টা করছে। রাত্তিরে নানারকম শব্দ শোনা যায়। দিন দুপুরেও ছোটখাট উৎপাত লেগে থাকে। জানলায় ঢিল পড়ে, কাচ ভাঙে, ছাতে কারা যেন পায়চারি করে। আমি এই বাড়িতে থাকলে যেন কাদের খুব অসুবিধে হচ্ছে। আমার

বাড়িওলা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অবশ্য আমাকে বারবার অভয় দিয়েছেন। বলতে গেলে ওদের ভরসাতেই এখানে রয়ে গেছি। তাছাড়া একটা জেদও চেপে গেছে।'

'আর কিছু?'

'হ্যাঁ, তৃতীয় যেটা বলতে চাই সেটা বলার জন্য খানিকটা পিছিয়ে যেতে হবে। জয়পুরে থাকার সময় আমরা একটা বাঙালি পরিবারকে চিনতাম। খুব বেশিদিনের জন্য নয়। মাস আটেক ওরা আমাদের সামনের বাড়িতে ভাড়া ছিল। সেই পরিবারে একটি মেয়ে ছিল তার নাম ছিল আলপনা, আলপনা দত্ত। আমি যখন ওদের চিনতাম তখন আলপনা খুবই ছোট, ফ্রক পরে ইশকুলে যায়। ওই আটমাসের পর তাকে আর কোনোদিন দেখিনি। মন্টুবাবুর বাড়িতে আসার পরে শুনলাম সুলতার এক মাসি, তার নামও আলপনা, বিয়ের আগে আলপনা দত্তই নাম ছিল, এখানে আসত, কখনো কখনো থেকেও যেত, সুলতার দেখাশোনা করত, হঠাৎ সে উধাও হয়ে গেছে। আমার মনে হল এই আলপনা সেই জয়পুরের আলপনা নয়ত? তারপর যখন শুনলাম সুলতার মাসিও জয়পুর থেকে এসেছিল, তখন আমার কৌতূহল আরও বাড়ল। কিন্তু আমার কৌতূহল নিরসনের কোনও উপায় ছিল না। তারপর বছর দুয়েক আগে আমার এক খুড়তুতো ভাইয়ের পুরোনো অ্যালবাম থেকে একটা ছবি বেরিয়ে পড়ল। খুড়তুতো ভাইরা যখন জয়পুরে আমাদের কাছে বেড়াতে গিয়েছিল সেই সময়ের তোলা ছবি। দেখলাম সেই ছবিতে অনেকের সঙ্গে আলপনাও আছে। আমার কী মনে হল, ছবিটা আমি চেয়ে নিলাম। পুরোনো ছবি, কোনও নেগেটিভ নেই, ভেবেছিলাম ছবিটার একটা কপি করে নিয়ে আমার খুড়তুতো ভাইকে ফেরত দিয়ে দেব। করছি করব করে কপিটা আর করানো হয়নি। ছবিটা একদিন মন্টুবাবুদের দেখালাম। একটা রবিবারের দুপুরে ওদের বাড়িতে নেমন্তন্ন হয়েছিল, সেখানে তখন রজনীবাবুরাও ছিলেন। মন্টুবাবুর দ্বিতীয় স্ত্রী তো অবশ্যই ছিলেন। পুরোনো কথা হচ্ছিল। কথায় কথায় সুলতার মাসির প্রসঙ্গ উঠল। আমার তখন ছবিটার কথা মনে পড়ে গেল। ভাবলাম ছবিটা এনে দেখাই, যদি কেউ চিনতে পারে। বলাই বাহুল্য ছবিটা আমার সঙ্গে ছিল না। আমি বাড়ি থেকে ছবিটা নিয়ে এসে সকলকে দেখালাম। কেউই ছবিটাকে চিনতে পারল না। আমি নিশ্চিত হলাম, আমার দেখা আলপনা দত্ত আর সুলতার মাসি আলপনা দত্ত সম্পূর্ণ আলাদা লোক। তারপর, সত্যি বলতে কি, ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিলাম। কিছুদিন আগে আবার ছবিটার কথা মনে পড়ল। মনে হল, একটা কপি করে নিয়ে ছবিটা ফেরত দেওয়া দরকার। একটা অ্যালবামের মধ্যে আলগাভাবে ছবিটা রাখা ছিল। কিন্তু অ্যালবামটা খুলে দেখি ছবিটা সেখানে আর নেই। তন্নতন্ন করে খুঁজলাম, ছবিটা কোথাও নেই। আমি কিন্তু ঠিক জিনিসপত্র হারিয়ে ফেলার লোক নই। গোছানো লোক বলে আমার একটু গর্বই আছে। তাই সমস্ত ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত।'

'ছবিটা হারিয়ে যাবার কথা কাউকে বলেছিলেন?'

'বোধহয় মন্টুবাবুকে বলেছিলাম। ঠিক মনে পড়ছে না।'

'আপনার তিনটে জিনিসই বেশ ইন্টারেস্টিং। আমি মাথায় রাখব।'

আদিত্য ঘড়ি দেখল। সোয়া বারোটা। বকুলের সঙ্গে দুপুরে ভাত খেতে হলে এখনই উঠতে হবে।

## (৩)

রাস্তায় নেমেই রজনী বসাকের সঙ্গে দেখা।

'আপনার সঙ্গে তো ভাল করে আলাপই জমল না সেদিন।' আদিত্যই এগিয়ে গিয়ে কথা বলল।

'কে? ও সূর্যবাবু? কেমন আছেন? আমি এই একটু বকুলের সঙ্গে দেখা করে গেলাম। রোজই অফিস যাবার পথে একবার দেখা করে যাই। আসবেন নাকি একদিন আমাদের অফিসে? দেখাতাম, কত বিচিত্র জায়গায় আমরা বাঙালিকে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছি।'

'আমি তো আজ রাত্তিরের ট্রেনেই ভিলাই ফিরে যাচ্ছি। যেতে হলে এখনই যেতে হয়। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে আপনারা কোথায় কোথায় নিয়ে যান। ভিলাইতেও অনেকে ইন্টারেস্টেড হতে পারে। আপনাদের ব্রোশিয়র বা ফ্লায়ার গোছের কিছু পেলে নিয়ে যেতাম।'

'এখনই চলুন না আমার সঙ্গে।'

আদিত্য একটু ভাবল। বকুল একসঙ্গে লাঞ্চ খাবে বলেছিল। এখন রজনীবাবুর সঙ্গে গেলে সেটা হবে না। সে ঠিক করল রজনীবাবুর সঙ্গেই যাবে। কিন্তু বকুলকে কথাটা জানানো দরকার। আদিত্য রজনীবাবুকে একটু দাঁড়াতে বলে মন্টুবাবুর বাড়িতে ঢুকল।

মালতী বলল, 'বৌদি এইমাত্র চান করতে ঢুকেছে। আধঘণ্টার আগে বেরোবে না।'

'বেরোলে বৌদিকে বলে দিও আমি বৌদির দাদার সঙ্গে ওঁদের আপিসে যাচ্ছি। দুপুরের খাওয়া বাইরে খেয়ে নেব। আমার জন্য অপেক্ষা না করে যেন খেয়ে নেন।'

'পান্থজনের সখা'র আপিসটা ক্যামাক স্ট্রীটে। একটা দশতলা বাড়ির সাততলায়। রজনীবাবুর গাড়ি যখন বাড়িটার পার্কিং লটে দাঁড়াল তখন সোয়া একটা বেজে গেছে। ছিমছাম আপিস। কয়েকজন সুবেশ, সুদর্শন তরুণ-তরুণী ডেস্কে কাজ করছে। ভেতর আপিসে আরও অনেক কর্মচারী। ডেস্কের এপারে ভ্রমণপিপাসুদের ভিড় চোখে পড়ার মতো।

রজনীবাবুর নিজস্ব চেম্বারটি চমৎকার। একদিকে দেয়াল জুড়ে জানলা, ক্যামাক স্ট্রীট লোয়ার সার্কুলার রোডের মোড় পর্যন্ত দেখা যায়। অন্য দিকের দেয়ালে বরফের ওপর সটান দাঁড়ানো একটা মস্ত গ্রিজলি বেয়ারের ছবি, নীচে লেখা ইয়ালোস্টোন ন্যাশানাল পার্ক। রজনীবাবু নিজের চেয়ারে বসে বেল বাজালেন। বেয়ারাকে বললেন,

'অশোককে আসতে বল, আর দু'কাপ কফি দাও। কফি খাবেন তো?' শেষ প্রশ্নটা আদিত্যকে।

কফি এল। অশোককে 'পান্থজনের সখা'র আগামী ট্যুরগুলির খবর-সম্বলিত প্রচারপত্র আনতে বলা হল। আদিত্য জানতে পারল, আগামী ছ'মাসে 'পান্থজনের সখা' ইয়োরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রাচ্যে এগারোটি সফরের আয়োজন করেছে। মাথাপিছু খরচ দেড় থেকে দুলাখের মধ্যে। দামটা আদিত্যর বেশ কমই মনে হল।

'এত কম খরচে নিয়ে যান কী করে?' আদিত্য রজনীবাবুকে জিজ্ঞেস করল।

'ইচ্ছে থাকলে, বুঝলেন, সবই হয়। এটা আমার ব্যবসা নয়, প্যাশান।'

'আপনাদের সব ট্রিপগুলোই দেখছি দুবাই বা লন্ডন দিয়ে যাচ্ছে। ওখানে কি আপনাদের আপিস আছে?'

'ঠিক ধরেছেন। দুটো জায়গাতেই আমাদের ব্রাঞ্চ আছে। তাই হয় দুবাই, না হয় লন্ডন দিয়ে রুটটা হলে আমাদের সুবিধে হয়। তাছাড়া এমিরেটস এবং ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ দুটো কোম্পানির সঙ্গেই আমাদের চুক্তি আছে। ওরা টিকিটের দামে আমাদের ভাল ছাড় দেয়।'

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আদিত্য উঠে দাঁড়াল।

'আজ চলি। ভিলাই থেকে কয়েকজনকে জুটিয়ে নিয়ে আপনাদের সঙ্গে ঝুলে পড়ব। অনেক জায়গায় যেতে ইচ্ছে করে। তবে সবার আগে আফ্রিকা।'

## সপ্তম পরিচ্ছেদ
## (১)

চুল কাটার সেলুনে পৌঁছে আদিত্য দেখল তাদের মেসের নিতাইবাবু কলপ করাচ্ছেন। সেলুনটা ছোট। কুল্লে দু'জন একসঙ্গে চুল কাটতে পারে। কিন্তু দুজন নাপিতের একজন এখনও আসেনি। অতএব একটা চেয়ার ফাঁকাই রয়েছে। অন্যজন ইশারায় আদিত্যকে বসতে বলল।

কাল সন্ধেবেলা আদিত্য মন্টুবাবুর বাড়ি থেকে ফিরে এসেছে। আজ তার হাতে অনেক কাজ।

'কতক্ষণ লাগবে?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'বেশিক্ষণ লাগবে না। মিনিট দশের মধ্যে হয়ে যাবে। আপনি ঘুরে আসতে পারেন। তবে আজকে আমি একা। রঘুয়া দেশে গেছে।'

যে চুল কাটছে তার নাম রমেশ, রঘুয়া তার পার্টনার। এরা ঝাড়খণ্ডের লোক। তবে অনেকদিন কলকাতায় আছে বলে পরিষ্কার বাংলা বলতে পারে। আজ বছর পাঁচেক হল দু'জনে মিলে পাড়ায় এই সেলুনটা খুলেছে। এখান থেকে আদিত্যর মেস খুব দূরে নয়। আদিত্য একবার ভাবল বাড়ি থেকে ঘুরে আসে। কিন্তু তারপর মনে হল, লাভ কী? হঠাৎ বৃষ্টি আসতে পারে। তখন আবার এখানে ফেরা মুস্কিল হবে। তাছাড়া ইতিমধ্যে নিতাইবাবুর কলপ করা শেষ হয়ে গেলে অন্য কোনও খদ্দের এসে চেয়ারটা দখল করে ফেলতে পারে। তার চেয়ে এখানেই অপেক্ষা করা ভাল।

চুল কাটার চেয়ার দু'টোর পেছনে একটা কাঠের বেঞ্চি পাতা। আদিত্য সেখানে গিয়ে বসল। নিতাইবাবুর ওপর তার খুব রাগ হচ্ছে। কলপ-করা লোক এমনিতেই তার অপছন্দ, তার ওপর এই নিতাইবাবু লোকটা রোজ সন্ধেবেলা ঘাড়ে পাউডার লাগিয়ে কোথায় যেন যায়। অনেক রাত্তিরে বাড়ি ফেরে। আদিত্য মাঝেমাঝে দেখেছে, নিতাইবাবু পাড়ার রেস্টোরেন্টে একা-একা বসে বিপুল পরিমাণ মাংস-পরোটা সাবাড় করছে। ভাবতে ভাবতে আদিত্যর হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল। নিতাইবাবু যদি রোজ সন্ধেবেলা সেজেগুজে কোনও কুস্থানেও যায়, নিতাইবাবু যদি রোজ-রোজ রেস্টোরেন্টে বসে কাঁড়ি কাঁড়ি মাংস-পরোটা খায়, তাতে আদিত্যর কী বলার থাকতে পারে? আদিত্যর পয়সায় তো কিছু করছে না। আসলে চুল কাটার জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে বলে আদিত্য বেজায় চটে গেছে। চুলটা এত বড় হয়েছে যে আজ না কাটালেই নয়, অথচ এই সকালের মধ্যেই কয়েকটা কাজ সারতে হবে।

নিতাইবাবুর কলপ-পর্ব শেষ। এখন শ্যাম্পু চলছে। এরপর দাড়ি কামানো আছে, মাথা ও ঘাড়ের দলাই-মলাই আছে। তার মানে আরও ঝাড়া পনেরো-কুড়ি মিনিট। আদিত্য অসহিষ্ণুভাবে ঘড়ি দেখল। সাড়ে নটা বেজে গেছে। আদিত্যর পাশে বেঞ্চির ওপর কিছু পুরোনো পত্র-পত্রিকা রাখা আছে। প্রায় সবই হিন্দি ভাষায় সিনেমা পত্রিকা। তারই মধ্যে অনেক খুঁজে-পেতে একটা বাংলা সিনেমা পত্রিকা পাওয়া গেল। সংখ্যাটা প্রায় এক বছরের পুরোনো। আদিত্য সময় কাটানোর জন্য সেটাই হাতে তুলে নিল।

সিনেমায় আদিত্যর খুব একটা উৎসাহ নেই। বিশেষ করে বাজার চলতি বাংলা সিনেমায়। পুরোনো কিছু হলিউড অবশ্য এখনও বেশ লাগে। আদিত্য ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাতে ওলটাতে নানা তথ্য জানতে পারল। জানতে পারল, কোন নায়কের সঙ্গে কোন নায়িকার এখন লটঘট চলছে। কার সঙ্গে কার আড়ি হয়ে গেছে। জানতে পারল, কোন কোন ছবি মুক্তির প্রতীক্ষায় দিন গুনছে। আদিত্য ভাবল, এতদিনে এদের অনেকেরই নিশ্চয় মুক্তি ঘটে গেছে। পাতা ওলটাতে ওলটাতে একটা জায়গায় আদিত্যর চোখ আটকে গেল। বাংলা সিনেমার ফাইন্যান্সিং-এর ওপর একটা লেখা। প্রতিবেদক লিখছেন, বলিউডের মতো টলিউডেও এখন একটু একটু করে অপরাধ জগতের টাকা ঢুকছে। এর মূল অসুবিধে হল, মাঝেমাঝে নানারকম আইনের ঝামেলায় এইসব টাকার স্রোত শুকিয়ে যায়, কখনও বা যিনি টাকা যোগাচ্ছিলেন তাঁকেই শ্রীঘরে ঢুকতে হয়, ফলে বহু সিনেমা শুরু হয়েও মাঝপথে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

মাঝপথে আটকে যাওয়া এই রকম কয়েকটা সিনেমার কথা প্রতিবেদক লিখেছেন। তার মধ্যে একটি সিনেমা, নাম 'লাভ ইন অকল্যান্ড', যার নামটা ইংরেজিতে হলেও বাকি সব কিছু বাংলায়, অনেকদিন বন্ধ থাকার পর সম্প্রতি আবার শুরু হয়েছে। সিনেমাটি নতুন করে প্রযোজনা করছে 'পান্থজনের সখা' নামে একটি ভ্রমণ-সংস্থা। এই সংস্থাটি ভ্রমণ-পিপাসুদের একটি অভিনব প্যাকেজ দিচ্ছে। যেসব ভ্রমণকারী 'পান্থজনের সখা'র মাধ্যমে নিউজিল্যান্ড বেড়াতে যাবেন তাঁদের অকল্যান্ড, হ্যামিলটন, ওয়েলিংটন, ক্রাইস্টচার্চ ইত্যাদি শহর ঘোরানো ছাড়াও অতি শীঘ্র নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিতব্য 'লাভ ইন অকল্যান্ড' ছবির শুটিংও দেখানো হবে।

'খালি আছে নাকি?' নতুন কোনও খদ্দের সেলুনে ঢুকেছে।

'একটু সময় লাগবে' রমেশ নিতাইবাবুর মাথা দলাই-মলাই করতে করতে বলল, 'এটা হয়ে গেলে যে বাবু বসে আছেন তিনি চুল কাটবেন।'

আদিত্য বুঁদ হয়ে লেখাটা পড়ছে। 'লাভ ইন অকল্যান্ড' ছবির নায়ক-নায়িকার মুখ দুটো আদিত্যর পরিচিত। তাঁদের অনেকগুলো ছবি ছাপা হয়েছে। নায়িকা জানিয়েছেন, নিউজিল্যান্ডে শুটিং করতে যাবার ব্যাপারে তিনি খুবই উৎসাহী, যেহেতু তিনি আগে কখনও নিউজিল্যান্ড যাননি। নায়ক অবশ্য বলেছেন, গত বছরেই ছুটি কাটাতে তিনি নিউজিল্যান্ড গিয়েছিলেন। 'পান্থজনের সখা'র তরফ থেকে শুটিং ও ভ্রমণের ব্যাপারটা দেখাশোনা করছেন কোম্পানির লন্ডন অফিসের কর্ত্রী শ্রীলেখা ভট্টাচার্য। প্রতিবেদনের সঙ্গে তাঁর ছবিসহ একটা সংক্ষিপ্ত বক্তব্যও ছাপা হয়েছে। তিনি বলেছেন, তাঁদের মত প্যাকেজ সারা বাংলায় কেন সারা পৃথিবীতে এই প্রথম। ছবিটা খানিকটা অস্পষ্ট। ভালভাবে খেয়াল করলে দেখা যাবে ছবিতে জনৈকা বয়কাট চুল কালো ফ্রেমের চশমা পরা ভদ্রমহিলা দর্শকের দিকে তাকিয়ে আছেন। ভদ্রমহিলা শুভ্রকেশ, কিন্তু তাঁর মুখচ্ছবিটি এখনও বেশ খুকি-খুকি রয়েছে। আদিত্য নিতাইবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করছে। তিনি অতক্ষণ চেয়ার দখল করে বসে না থাকলে, এই সিনেমা পত্রিকাটা দেখাই হত না। আদিত্য জাদুকরী ক্ষিপ্রতায় পত্রিকাটা তার গেঞ্জির ভেতরে চালান করে দিল। জাদুকরের সাগরেদি করাটা তার এই সময়ে খুব কাজে লাগল।

নিতাইবাবু উঠে পড়েছেন। 'চলে আসুন বাবু, হয়ে গেছে', রমেশ আদিত্যকে চুল কাটতে ডাকছে।

(২)

'ভাস্কর, আমি আদিত্য বলছি, আদিত্য মজুমদার।'

'আদিত্য? আরে কেমন আছিস? কতদিন তোর সঙ্গে দেখা হয় না, কথা হয় না।'

'তুই তো মাঝেমাঝে ফোন করতিস। অনেকদিন করিসনি কেন ?'

'আর বলিস না। আমার পুরোনো মোবাইলটা হারিয়ে গেছে। নতুন একটা কিনেছি, কিন্তু সব ফোন নম্বর পুরোনো মোবাইলে সেভ করা ছিল। এখন একটু একটু করে ফোন নম্বরগুলো উদ্ধার করার চেষ্টা করছি। তুই ফোন করে ভাল করলি। তোর নম্বরটা সেভ করে রাখব।'

'শোন, একটা জরুরি দরকারে তোকে ফোন করেছিলাম। আমার যতদূর মনে পড়ছে, তুই এম এসসি-র পর কিছুদিন ট্যাংরার দিকে একটা মেয়েদের কলেজে পার্টটাইম পড়িয়েছিলি না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ইস্ট মেট্রোপলিটান গার্লস কলেজে। আট মাস মতো পড়িয়েছিলাম। তারপর তো বিদেশ চলে গেলাম।'

'সেই কলেজের কিছু পুরোনো খবর দরকার। এমন কেউ তোর চেনা আছে যে কলেজের পুরোনো খবর দিতে পারে?'

'তোর গোয়েন্দাগিরির জন্য লাগবে?'

'তাছাড়া আর কি?'

'চেনা আছে। আমি যখন ওই কলেজে পড়াতাম, ওখানকার প্রিন্সিপাল ছিলেন মহিতোষবাবু, মহিতোষ ভাদুড়ি। তোদের সাবজেক্টের, মানে অঙ্কের লোক। পুরোনো প্রেসিডেন্সি। তবে আমাদের থেকে অন্তত পঁচিশ বছরের সিনিয়র। এখন রিটায়ার করেছেন। লেক মার্কেটের পেছন দিকে রাজা বসন্ত রায় রোডে থাকেন। ঠিকানাটা মনে আছে। পি ১৩২। একসময় খুব যেতাম তো। কিন্তু ফোন নম্বরটা পুরোনো মোবাইলে ছিল, হারিয়ে গেছে। নাহলে আমি একটা ফোন করে দিতাম।'

'ফোন করার দরকার নেই। আমি ম্যানেজ করে নেব।'

'আমারও তাই মনে হয়। এমনিতেই অমায়িক মানুষ। তার ওপর যদি গিয়ে বলিস তুইও প্রেসিডেন্সিতে পড়েছিস, খুব খুশি হবেন।'

'শোন আজ রাখছি। খুব শিগগির একদিন আড্ডা দিতে হবে। পুরোনো বন্ধুরা সব স্মৃতির গম্বুজ হয়ে যাচ্ছে।'

'যা বলেছিস।' ভাস্কর রেফারেন্সটা ধরতে পারল না।

'রাখছি তাহলে।'

'ও-কে। পরে ফোন করব।'

মহীতোষবাবুর বাড়িটা পুরোনো, মনে হয় বাপ-ঠাকুরদাদার আমলের। একতলা বাড়ি, সামনে এক সময় বাগান ছিল, এখন আগাছার জঙ্গল। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এমন জায়গায় একটা পুরোনো বাড়ি পড়ে আছে অথচ এখনও প্রোমোটিং হয়নি। লোহার গেট আলগা করে লাগানো, আদিত্য গেট খুলে সদর দরজা অব্দি পৌঁছে বেল বাজাল। একটা পুরোনো ফিয়াট গাড়ি বাগানের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িটা চলে তো? একটু পরে দরজার পেছনে চটির আওয়াজ। দরজা ফাঁক হয়ে এক সৌম্যদর্শন বৃদ্ধের জিজ্ঞাসু মুখ উঁকি মারল, 'কাকে চাইছেন?'

'মহীতোষ ভাদুড়ির সঙ্গে দেখা করতে পারি?'

'আমিই মহীতোষ ভাদুড়ি। বলুন কী দরকার?'

'আমি ভাস্কর ঘোষের বন্ধু। যে ভাস্কর কিছুদিন আপনাদের কলেজে কেমিস্ট্রি পড়িয়েছিল, এখন যাদবপুরে আছে। আমি আদিত্য মজুমদার। ভাস্করের সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তাম। যদি পাঁচ মিনিট আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারতাম।'

'ভেতরে আসুন।' ভাস্কর ঠিক বলেছিল। প্রেসিডেন্সি শুনে বুড়োর মন গলেছে। 'আপনারও কি কেমিস্ট্রি?' মহীতোষবাবু বাড়ির ভেতর ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞেস করলেন।

'না, না, কলেজে আমার বিষয় ছিল অঙ্ক।'

'অঙ্ক? স্প্লেনডিড। আজকালকার ছেলেমেয়েরা তো ম্যাথেম্যাটিক্স পড়তেই চায় না। অথচ অঙ্ক ছাড়া সায়েন্স এক পা এগোতে পারে? এখন তো শুনি সোশাল সায়েন্স-এও বেশ অঙ্ক লাগছে।'

আদিত্য মহীতোষবাবুর পেছন পেছন একটা হল পেরিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকেছে। একটা বেতের সোফা সেট, এক দিকে লেখার টেবিল, চেয়ার, দেয়াল আলমারি, সেখানে আদিত্য তার ছাত্রজীবনের কিছু পরিচিত বই দেখতে পেল।

'এবার বলুন কী দরকার।' মহীতোষবাবু সোফায় বসে বললেন।

উত্তরে কিছু বলবার আগে আদিত্য তার একটা ভিজিটিং কার্ড বার করে মহীতোষবাবুর হাতে দিল।

'প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর? বেসরকারি গোয়েন্দা?' মহীতোষবাবুর কপালে তিন থাক প্রশ্নের ভাঁজ। 'হঠাৎ আমাকে আপনার দরকার পড়ল কেন?'

'বলছি। আপনার কলেজের দুটি পুরোনো ছাত্রী সম্বন্ধে একটু জানতে চাই। বছর কুড়ি আগে তারা ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান কলেজে পড়ত। আপনি তখন প্রিন্সিপাল ছিলেন। একজনের নাম ছিল বকুল বসাক, অন্যজন শ্রীলেখা ভট্টাচার্য। দ্বিতীয়জনের পদবীটা ভুলও বলতে পারি।'

'দু'টো নামই ঠিক বলেছেন। দু'জনকেই আমার মনে আছে। তবে আলাদা আলাদা কারণে। বকুল বসাক একটা স্ক্যান্ডেলে জড়িয়ে পড়েছিল। তাকে কলেজ থেকে রাস্টিকেট করা হয়েছিল। পাশের কলেজের একটি ছোকরার সঙ্গে তাকে অত্যন্ত কম্প্রোমাইজিং অবস্থায় কলেজের ছাতে দেখতে পাওয়া যায়। সেই ছোকরা তো আমার কলেজের নয়। তাই তাকে কিছুই করতে পারিনি। কিন্তু বকুল বসাককে কলেজ থেকে বহিষ্কার করেছিলাম। আমার সময় আমি কলেজে স্ট্রিক্ট ডিসিপ্লিন রাখার চেষ্টা করতাম। মেয়েদের কলেজে এটার খুব দরকার।'

'যে ছেলেটির সঙ্গে বকুল বসাককে অশালীনভাবে দেখা গিয়েছিল, তার নাম কি সুশান্ত হালদার?'

'আমি নামটা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম। আপনি বলতে মনে পড়ে গেল। নামটা ওটাই বটে।'

'আর শ্রীলেখা ভট্টাচার্য?'

'শ্রীলেখা ছিল আমাদের কলেজের গর্ব। ভীষণ ভাল অভিনয় করত। বার দুয়েক ইন্টার কলেজ ড্রামা কম্পিটিশনে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার এনেছিল। শ্রীলেখার সঙ্গে কিছুদিন আগেও একটা বিয়ে বাড়িতে আমার দেখা হয়েছে। বলল, অভিনয় একেবারেই ছেড়ে দিয়েছে। লন্ডনে একটা ট্র্যাভেল এজেন্সি চালায়। বিয়ে করেনি। মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে। আমি প্রথমটা দেখে চিনতেই পারিনি।' মহীতোষবাবু একটু থেমে বললেন, 'আচ্ছা, আপনি আমাকে এতসব কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন বলুন তো?'

'বকুলের বর্তমান স্বামীর ধারণা বকুলকে সুশান্ত হালদার ব্ল্যাকমেল করছে। তাই বকুলের অতীত সম্বন্ধে একটু খোঁজ নিচ্ছিলাম। শুনলাম, শ্রীলেখা বকুলের খুব বন্ধু ছিল। তাই তার সম্বন্ধেও একটু জানতে ইচ্ছে করছিল। বকুলের স্বামী আমাকে হায়ার করেছেন।'

মহীতোষবাবু খানিকক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, 'বকুলের সঙ্গে শ্রীলেখার একটা আশ্চর্য বন্ধুত্ব ছিল। দুজন দুজনকে ছেড়ে প্রায় থাকতেই পারত না। বকুল রাস্টিকেট হতে শ্রীলেখা খুব ভেঙে পড়েছিল। তার জন্যে আমার খারাপ লাগত। কিন্তু বকুল বসাকের জন্য আমার কোনও সিমপ্যাথি নেই। ওইসব মেয়ের কপালে ব্ল্যাকমেলই লেখা থাকে।'

## (৩)

আধমরা রোদ। মেঘের ফাঁক দিয়ে মাঝেমাঝে সূর্য উঁকি মারছে। তবে মেঘ সরে গেলেই রোদ্দুর আবার নিজমূর্তি ধারণ করবে। আদিত্যকে ছোটবেলায় কে যেন শিখিয়েছিল, ভাদ্রমাসের অর্ধেক দিন মুচির, অর্ধেক দিন চাষার। কথাটা মিথ্যে নয়। আদিত্য বেলগাছিয়া মেট্রো স্টেশনে নেমে খানিকটা হেঁটে মিল্ক কলোনির মোড় থেকে একটা বাস ধরে নর্দার্ন এভিনিউ-এর মোড়ে গিয়ে নামল। তারপর নর্দার্ন এভিনিউ ধরে খানিকটা হেঁটে একটা দোতলা বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এটা মন্টুবাবুর বাড়ি। এই বাড়ির দোতলায় সুলতার হারিয়ে যাওয়া মাসি থাকতেন। একতলাটা অবশ্য চিরকালই বন্ধ থাকে। তখনও থাকত। দোতলায় মন্টুবাবু কিছুদিন হল নতুন ভাড়াটে বসিয়েছেন। বাড়ির উল্টোদিকে ব্যাঙ্ক। এখানেই আদিত্যর দরকার।

এই অবেলায় ব্যাঙ্কে বিশেষ ভিড় নেই। আদিত্য ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে নিজের পরিচয় দিতে ম্যানেজার খাতির করে বসালেন। থানা থেকে অনুরোধ এসেছে যেন আদিত্য মজুমদারকে সাহায্য করা হয়। ম্যানেজার আদিত্যকে বললেন, 'আপনার জন্য আলপনা সামন্তর একাউন্টের একটা প্রিন্ট আউট নিয়ে রেখেছি। বড়বাবু সেই রকমই বলেছেন।'

ম্যানেজার বেল বাজিয়ে কী একটা নির্দেশ দিলেন। একটু পরে একজন মোটা একতাড়া কম্পিউটার প্রিন্ট আউট দিয়ে গেল।

'সাধারণত ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টগুলো ট্রেস করতে একটু সময় লাগে। এই একাউন্টটাতে তো ছ'বছর আগে শেষ ট্রানজাকশন হয়েছে। যাইহোক বড়বাবু আগে থেকে বলে দিয়েছিলেন বলে প্রিন্ট আউটটা বার করতে কোনও অসুবিধে হয়নি। আপনি বরং এখানে বসে অ্যাকাউন্টটা স্টাডি করুন, আমি হাতের কাজগুলো সেরে নিই।' ম্যানেজার নিজের কম্পিউটার স্ক্রিনে মন দিলেন।

অ্যাকাউন্ট-এর প্রত্যেকটা এন্ট্রি খুঁটিয়ে দেখা বেশ খাটনির কাজ। আদিত্য আর দেরি না করে কাজে লেগে পড়ল। ২০০৪-এর অগস্ট মাস থেকে ২০০৯-এর এপ্রিল মাস এই চার বছর আট মাস অ্যাকাউন্টটা চালু ছিল। উধাও হয়ে যাবার আগের দিন আলপনা সামন্ত প্রায় সমস্ত টাকা তুলে নিয়েছিল। এখন অ্যাকাউন্টে মাত্র চার হাজার টাকা পড়ে আছে।

আদিত্য লক্ষ্য করল, ২০০৪-এর পর থেকে প্রত্যেক সপ্তাহে নিয়ম করে চার হাজার টাকা তোলা হয়েছে। কখনও এর কোনও অন্যথা ঘটেনি। এটা নিশ্চয় আলপনা সামন্তের মাসিক সংসার খরচ। ব্যাপারটা আদিত্যর একটু অস্বাভাবিক মনে হল। তার অভিজ্ঞতা বলে, সাধারণভাবে মাসের গোড়ায় একটা বড় খরচ হয়ে যায়, মুদি, কাজের লোকের মাইনে, কেবল টিভির ভাড়া সবই মাসের গোড়ার খরচ। তারপর সারা মাস একটু একটু করে আরও খরচ হয়। কিন্তু তার পরিমাণটা অনেক কম। আলপনা সামন্তর টাকা তোলার ধরন দেখে মনে হয় সে সারা মাস ধরে সমানভাবে খরচা করত। কেন এমন হবে? আরেকটা জিনিসও অস্বাভাবিক। সাধারণত, যে-কোনোও পরিবারে মাসিক খরচের একটা কম-বেশি থাকে। কোনও মাসে কম খরচ হয়, কোনও মাসে কিছু বেশি। আলপনা সামন্তর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সব মাসে একই রকম খরচ।

প্রত্যেক মাসের শেষ দিন নিয়ম করে একটা টাকা অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে। এটা কী আলপনা সামন্তর বিধবা ভাতার টাকা? কিন্তু টাকাটা আসছে কোথা থেকে? আদিত্য খেয়াল করল, ভাতার টাকাটা কখনও বাড়েনি। চার বছর আট মাস ধরে প্রত্যেক মাসে ঠিক কুড়ি হাজার টাকা করে আলপনা সামন্তর একাউন্টে জমা পড়েছে। এটাও অস্বাভাবিক। প্রথমত, কোনও পেনশন হলে তার পরিমাণ একেবারে কাঁটায় কাঁটায় কুড়ি হাজার হতো না। একটু কম-বেশি হতোই। দ্বিতীয়ত, সেটা বছর বছর বাড়ত। তাহলে টাকাটা কী হিসেবে আসছে? আলপনা সামন্ত প্রত্যেক মাসে চার হাজার টাকা করে জমিয়েছে। এখানেও একটা আশ্চর্য ধারাবাহিকতা আছে। চার বছর আট মাসে তার জমেছিল দুই লাখ চব্বিশ হাজার টাকা। তার থেকে সে দু'লাখ কুড়ি হাজার তুলে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

'দুটো প্রশ্ন ছিল।' আদিত্য ম্যানেজারের দিকে মুখ তুলে বলল।

'বলুন।'

'প্রথম প্রশ্ন, আলপনা সামন্তর কি কোনও ফিক্সড ডিপোজিট ছিল? দ্বিতীয় প্রশ্ন, আলপনা সামন্তর মাসিক চেকটা কোথা থেকে আসত?'

'আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর না, অন্তত আমাদের ব্যাঙ্কে আলপনা সামন্তর কোনও ফিক্সড ডিপোজিট ছিল না। দ্বিতীয় প্রশ্নটা উঠতে পারে ভেবে আমি আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। টাকাটা আসত লন্ডনের একটি ব্যাঙ্ক থেকে। কোনও একটি কোম্পানির অ্যাকাউন্ট থেকে টাকাটা ক্রেডিট করা হত। এর বেশি আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়।'

'না, না, এতেই হবে। আর একটা কথা। আলপনা সামন্ত কি মাঝেমাঝেই ব্যাঙ্কে আসতেন? নাকি কালে ভদ্রে?'

'মাঝেমাঝেই আসতেন। টাকা তুলতেন, পাশ বই আপডেট করাতেন, ফিক্সড ডিপোজিটে সুদের হার জানতে চাইতেন, যদিও ফিক্সড ডিপোজিট তিনি কখনও করেননি। বলা যায় কারণে-অকারণে তিনি ব্যাঙ্কে চলে আসতেন।

আদিত্য উঠে দাঁড়াল। তার যা জানার জানা হয়ে গেছে।

'আমার কাজ হয়ে গেছে। আমি আসছি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রিন্ট আউটটা আমার আর লাগবে না। আমি আমার দরকারি পয়েন্টগুলো নোট করে নিয়েছি।'

'একটু চা খেয়ে যান। চা বলে দিয়েছি। এখনই আসছে।'

চায়ের কথা শুনে আদিত্য আবার বসে পড়ল।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

(১)

মেসবাড়িতে বলরামই আদিত্যর লোকাল গার্জেন। ঘরে ঢুকে বলল,

'খেয়ে নিন, ঢের বেলা হয়েছে। এবার সকালের মিল বন্ধ হয়ে যাবে।'

আদিত্য ঘড়ি দেখল, একটা বাজে। আপিসের দিনে আর বেশিক্ষণ খাবার ঘর খোলা থাকবে না। অথচ তার খিদে নেই। সকাল থেকে অনেকবার চা খেয়েছে। অসংখ্য সিগারেট। খিদেটা মরে গেছে।

'আজ আর খাব না রে। চান করাও হয়নি। একটু পরে চান করে বেরোব। বাইরে কিছু একটা খেয়ে নেব। রাত্তিরে নেমন্তন্ন আছে।'

'একটু কিছু খেয়ে নিন। চান-টান পরে করবেন।' আদিত্য জানে খেতে না উঠলে বলরাম নড়বে না। অগত্যা সে বাথরুমে হাত ধুয়ে খেতে চলল। সঙ্গে সঙ্গে বলরাম। সে যতক্ষণ খাবে, বলরাম ঠায় পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে।

'দেশে যাবি কবে?' আদিত্য খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল।

'সামনের মাসে ছুটি চেয়েছি। মালিক এখনও হ্যাঁ-না কিছু বলেনি।'

'তোর মা-এর জন্য শাড়ি আর বাবার জন্য জামা নিয়ে যাস। আমি টাকা দিয়ে দেব। তোকেই কিনে নিতে হবে।'

মন্টুবাবুদের বাড়ি থেকে চলে আসার সময় মন্টুবাবু নগদ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা হাতে দিয়ে দিয়েছেন। চল্লিশ হাজার পারিশ্রমিক, আরও পাঁচ হাজার ইন্সিডেন্টাল এক্সপেন্স। আদিত্য পাঁচ হাজারটা ফেরত দিতে যাচ্ছিল। খরচ বলতে গেলে কিছুই তো হয়নি। পরে মনে পড়ল বিমলকে টাকা দিতে হবে। তাই পুরো টাকাটাই সে নিয়ে নিয়েছে। এখন কিছুদিনের জন্য সে বড়লোক। অবশ্য পুরোনো কিছু ধারদেনা মেটাতে হবে। যেকোনও কারণেই হোক বকুলের কথা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। আসার সময় বকুল ট্রেনের জন্য কিছু রান্না করা খাবার দিয়ে দিয়েছিল। আর কিছু শুকনো কেক-বিস্কুট।

'আর একটু ভাত দেবে?'

'না না খাওয়া হয়ে গেছে। তুই আমার জন্য এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আয় তো। একটু দাঁড়া, হাত ধুয়ে পয়সা দিচ্ছি।'

আদিত্য ঘরে ফিরে বলরামকে একটা পাঁচশ টাকার নোট দিয়ে বলল,

'এটা ভাঙিয়ে দু' প্যাকেট নিয়ে আসিস। তাড়াতাড়ি আসবি। তুই আবার নীচে গেলে কোথায় যেন হারিয়ে যাস।'

বলরাম সিগারেট নিয়ে ফিরে এসে দেখল আদিত্য ঘরের মধ্যে পাইচারি করছে। মনে হয় গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছে। বলরামকে দেখে ইশারায় সিগারেট ও ফেরত পয়সা টেবিলে রাখতে বলল। বলরাম ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যাবে এমন সময় আদিত্য বলল,

'তোর খাওয়া হয়েছে?'

'এখন খাব কি? অনেক কাজ বাকি। খেতে খেতে তিনটে বেজে যায়।'

'এই কেকগুলো রাখ। আমি কয়েকটা খেয়েছি।' আদিত্য বকুলের দেওয়া অর্ধসমাপ্ত কেকের প্যাকেটটা বলরামের হাতে তুলে দিল।

'কটায় ঘুম থেকে উঠিস?'

'সাড়ে চারটেয় উঠে পড়ি। নাহলে দেরি হয়ে যায়।'

'তোর তো ঘড়ি নেই। বুঝিস কী করে কটা বেজেছে?'

'তিন নম্বরের কাশীনাথবাবু সাড়ে চারটেয় উঠে হাঁটতে যান। বৃষ্টি পড়লে বারান্দায় পাইচারি করেন। সাধারণত নিয়মের হেরফের হয় না। ওঁর ঘরে এলার্ম ঘড়ি বাজে। আমি খাবার ঘর থেকে শুনতে পাই। আমার ঘুম ভেঙে যায়।'

'বাহ ভাল মজা তো, তোর আর ঘড়ির কী দরকার?' বলতে বলতে আদিত্যে হঠাৎ খুব অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

চিন্তা করতে করতে আদিত্যর একটু ঘুম এসে গিয়েছিল, ঘুম ভাঙল মোবাইলের আওয়াজে। গৌতম ফোন করছে।

'কী ব্যাপার, তুই কোথায় উধাও হয়ে গেছিলি? আমি তোকে ফোন করতে গিয়েও করতে পারিনি। কে জানে কোথায় কীভাবে রয়েছিস।'

'আমি তোকে দু'একবার ফোনে চেষ্টা করেছিলাম। বেজে গেল। বোধহয় মিটিং-এ ছিলি।'

'হতে পারে। কোনও খবর আছে?'

'অনেক খবর আছে, আলোচনা করার আছে। ভেবেছিলাম কাল রাত্তিরে অমিতাভদের বাড়িতে তোর সঙ্গে দেখা হলে কথা বলে নেব। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ওখানে হবে না। আর অত দেরিও করা যাবে না।'

'তুই চারটে নাগাদ লালবাজারে আসতে পারবি?'

'নিশ্চয় পারব।'

'তাহলে চলে আয়।'

(২)

'তাহলে এই হল ইন্সপেক্টার কানুনগোর সেই রহস্যময় টেলিফোনের গল্প। এখন মনে হচ্ছে টেলিফোন নম্বরটা কানুনগো কোনোভাবে সুশান্ত হালদারের কাছ থেকেই পেয়েছিল। কিম্বা হয়ত লক্ষ করেছিল সুশান্তর চেলারা এই নম্বরে ফোন করে বকুলকে ভয় দেখায়। কিন্তু এটা জেনে আমাদের তো কোনও উপকার হল না।' গৌতমের গলাটা খুব হতাশ শোনাল।

'আপাতত ব্যাপারটা সেই রকমই দাঁড়াচ্ছে। তবু কিছু খটকা কিন্তু থেকে যাচ্ছে এখনও। তুই আমাকে কয়েকটা ব্যাপারে একটু সাহায্য করতে পারবি?' আদিত্যর গলায় একটা চাপা উত্তেজনা রয়েছে।

'বল।'

'এক, মন্টুবাবুর প্রথম স্ত্রী, নামটা বোধহয় কল্পনা দত্ত, কীভাবে দার্জিলিং-এ মারা গিয়েছিলেন সেটা জানতে হবে। এ ব্যাপারে নিশ্চয় পুলিশ রেকর্ড রয়েছে। যদি একবার ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে পারি তাহলে সব থেকে ভাল হয়। দুই, মন্টুবাবুর শালীর একটা খোঁজ লাগাতে হবে। একটা সোর্স বলছে তিনি মন্টুবাবুর পাইকপাড়ার বাড়িতে থাকতেন। সম্ভবত সেখান থেকেই উধাও হয়ে যান। তিনি কোথায় গেলেন? শুনেছি পুলিশে একটা ডায়েরি করা হয়েছিল। সেখান থেকে হয়ত কিছু হদিশ পাওয়া যেতে পারে। তিন, যে ছবিটা কানুনগোর ডায়েরির মধ্যে ছিল, তার একটা কপি আমার চাই। চার, পুলিশ ফাইল থেকে যদি পাওয়া যায়, সুলতার হারিয়ে যাওয়া মাসির একটা ছবি পেলে খুব সুবিধে হত। আর পাঁচ, একটা খবর নিতে পারবি, মন্টুবাবুর বাড়ির টেলিফোন, যেটাতে ভূতুড়ে কল আসে, গত দুই-আড়াই বছরে কখনও খারাপ হয়েছিল কিনা? এবং তার আগে কীরকম ফ্রিকোয়েন্সিতে খারাপ হত?'

'আমি দেখছি কী করতে পারি।'

'আর একটা কথা। তুই কি তোর টিমের লোকদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেছিলি?'

'একটা খুব ছোট গ্রুপের মধ্যে করেছিলাম। কেন বলত?'

'কী আলোচনা করেছিলি?'

'তোর কাছে মন্টুবাবুর আসার কথা, মন্টুবাবুর বাড়িতে তার মেয়ের দেওর সেজে তোর যাবার কথা, সব কিছু নিয়েই কথা হয়েছিল।'

'আমার মনে হয় তোদের দলের মধ্যে কেউ একজন আছেন যিনি শত্রুপক্ষের কাছে তোদের ভেতরের কথা ফাঁস করে দিচ্ছেন। ইংরেজি স্পাই থ্রিলারে যাকে বলে মোল।'

গৌতম কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর নীচু গলায় বলল,

'কেন তোর এরকম মনে হচ্ছে?'

'দ্যাখ, সুশান্ত যদিও বলছে ওর লোক আমার ছেলেটাকে ফলো করে আমার বিষয়ে সব জানতে পেরেছে, কথাটা আমার বিশ্বাস হয় না। আসলে ওর গল্পের মধ্যে একটা ফাঁক আছে। ওর লোক আমার বিষয়ে সব কিছু জেনে ফেলতেই পারে কিন্তু সে তো আমাকে কখনও দেখেনি। সুশান্তও আমাকে আগে কখনও দেখেনি। তাহলে সাইবার কাফেতে দেখামাত্র সে আমাকে চিনে ফেলল কী করে? ডিটেকটিভ লাইসেন্স পাবার জন্য আমাকে দু'টো ছবি সহ এই লালবাজারেই দরখাস্ত করতে হয়েছিল। একটা ছবি আমার লাইসেন্স-এ লাগানো আছে। অন্যটা নিশ্চয় এখানেই কোথাও আমার ফাইলে রাখা আছে। একজন ভেতরের লোকের পক্ষে সেটার নাগাল পাওয়া শক্ত নয়। আমার ছবি সুশান্তর হাতে আগেই পৌঁছে গেছিল।'

'তোকে মন্টুবাবুর সঙ্গে ও পাড়ার কেউ দেখেনি?'

'একবার রাত্তিরে মন্টুবাবুর সঙ্গে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু রাস্তার আলোগুলো সব কটা জ্বলছিল না। এত কম আলোয় কাউকে দেখে চিনে নেওয়া সহজ কাজ নয়।'

গৌতম অনেকক্ষণ ধরে ভাবল। তারপর বলল,

'তুই যেটা বলছিস সেটা অসম্ভব নয়। অন্য নানা ব্যাপারেও এই ধরনের একটা সন্দেহ আমার মনে দানা বাঁধছিল। আমি সাবধান হব। তবে দু'একজনের ওপর তো নির্ভর করতেই হবে। মন্টুবাবুর প্রথম স্ত্রী ঠিক কতদিন আগে মারা গিয়েছিলেন বলতে পারবি?'

'একেবারে সঠিক বলতে পারব না, তবে মন্টুবাবু বলেছিলেন তাঁর স্ত্রী গত হয়েছেন দশ বছরেরও বেশি হয়ে গেল।'

'ওতেই হবে। আর সুলতার মাসির ব্যাপারটা আমি টালার পুলিশ স্টেশনে খোঁজ লাগাচ্ছি। পাইকপাড়ার ঘটনা হলে ওরাই বলতে পারবে। আর কিছু?'

'আর একটা ছোট্ট ব্যাপার। হয়তো আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবু একটু জেনে রাখা ভাল। 'পান্থজনের সখা' বলে কোনও ট্র্যাভেল এজেন্সির নাম শুনেছিস? বিদেশের নানারকম এক্সটিক জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যায়।'

'পান্থজনের সখা? নামটা চেনা চেনা লাগছে। বোধহয় টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন দেখেছি। খোঁজ নিতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু তুই ঠিক কী জানতে চাস?'

'যতটা জানা সম্ভব। কোম্পানি কেমন চলে, মালিক কেমন লোক, বিশেষ করে বিদেশে কোনও আপিস আছে কিনা।'

'জানিয়ে দেব। আমাকে এখন একটা মিটিং-এ যেতে হবে রে। তোর সঙ্গে কাল সন্ধেবেলা তো দেখা হচ্ছেই।'

রাত্তিরের দিকে গৌতম আবার ফোন করল।

'ভীষণ ইন্টারেস্টিং একটা খবর। এইমাত্র পেলাম। তোকে না জানিয়ে পারছি না। দার্জিলিং-এ কল্পনা দত্তর অপঘাত মৃত্যুর ইনভেস্টিগেটিং অফিসার ছিলেন সেই ইন্সপেক্টার কানুনগো যিনি পরে বদলি হয়ে গোবরায় আসেন এবং সুশান্ত হালদারদের জেলে পাঠান। কাল দুপুরের মধ্যে আরো কিছু তথ্য মেসেঞ্জার দিয়ে তোর আপিসে পাঠিয়ে দেব।'

পরদিন বেলা তিনটে নাগাদ একজন সাদা পোশাকের পুলিশ আদিত্যর আপিসে একটা প্যাকেট পৌঁছে দিল। মোটা প্যাকেট। পুলিশ চাইলে কী না পারে। ঘণ্টা দু'য়েক সেই কাগজপত্র নিয়ে বুঁদ হয়ে রইল আদিত্য। একটা ছবি একটু একটু করে চোখের সামনে ফুটে উঠছে। সেটাকে ধরে রাখার জন্য ভেবেচিন্তে আদিত্য একটা কালপঞ্জী বানাল, তার কিছুটা আবশ্য কাল্পনিক। সে ডায়েরিতে লিখল

জুন, ২০০৪—কল্পনা দত্তর অপঘাত মৃত্যু, সুলতার বয়স তখন ১১ বছর, দেবী-সুশান্তর ৩১/৩২ বছর, বকুলের ২৯/৩০ বছর, রজনীবাবুর ৩৭/৩৮ বছর, মন্টুবাবুর ৪২ বছর

মাস দু'য়েক পরে সুলতার মাসির প্রবেশ

ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ - ইন্সপেক্টার কানুনগোর ট্যাংরা থানায় পোস্টিং

এপ্রিল, ২০০৯ - মাসির অন্তর্ধান

জুলাই, ২০০৯ - রামানুজবাবুর আবির্ভাব

নভেম্বর, ২০০৯ - সুলতার বিয়ে

অগস্ট, ২০১১ - দেবী-সুশান্তর জেল

নভেম্বর, ২০১১ - মন্টুবাবুর সঙ্গে বকুলের বিয়ে

মার্চ-মে, ২০১৩ - দেবী-সুশান্ত জেল থেকে ছাড়া পেল, মার্চে সুশান্ত, জুন মাসে দেবী

কয়েক মাস পর থেকে ভূতুড়ে টেলিফোনের শুরু

মে, ২০১৪ - ইন্সপেক্টার কানুনগো খুন হলেন

জুলাই, ২০১৫ - মন্টুবাবু সাহায্য চাইতে এলেন

'পান্থজনের সখা' সম্বন্ধেও কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। মালিকের নাম, কবে শুরু হয়েছে এসব ছাড়াও জানা গেল লন্ডন এবং দুবাইতে তাদের আপিস আছে। সংস্থাটির শুরু ২০০০ সালে। প্রথমে খুব ভালো চলত না। ২০০৪-০৫ থেকে একটু একটু করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এখন সংস্থাটির বেজায় সুনাম। ভোক্তা মূলত মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত বাঙালি। 'পান্থজনের সখা' ওয়েবসাইটে অনেক ভোক্তাই মুক্তকণ্ঠে তাঁদের তৃপ্তির কথা জানিয়েছেন। বিশেষ করে এটা অনেকেই বলেছেন যে এত অল্প খরচে এত আরামে যে বিদেশ ভ্রমণ করা যায় 'পান্থজনের সখা'র মাধ্যমে না বেড়ালে তাঁরা জানতেই পারতেন না। রিপোর্টটা পড়তে পড়তে আদিত্যর মনে হচ্ছিল এবার ইন্টারনেট কানেকশন সহ একটা কম্পিউটার না কিনলেই নয়। এইসব তথ্য সে নিজেই তো ইন্টারনেট ঘেঁটে বার করতে পারত। এখনই অবশ্য কম্পিউটার কেনার পয়সা নেই।

গৌতমের পাঠানো কাগজপত্রের মধ্যে দুটো ছবিও আছে। একটা সুলতার হারিয়ে যাওয়া মাসির ছবি। কালার ছবি, ছবির ওপর নীল ফেল্টপেন দিয়ে লেখা আলপনা সামন্ত। আদিত্য অনেকক্ষণ ধরে ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইল। বয়েস আন্দাজ তিরিশ-একত্রিশ, একটু গ্রাম্য চেহারা। তেল চুকচুকে পাতাকাটা চুল, সামনের দুটো দাঁত ঈষৎ উঁচু। আদিত্য ছবিটার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসল। তার যে সন্দেহটা হচ্ছে সেটা যাচাই করে নেওয়া কঠিন হবে না। অন্য ছবিটা সাদা-কালো, কানুনগোর ডায়েরির মধ্যে যেটা ছিল। এই ছবিটা সে আগেই দেখেছে। এটাও যাচাই করে নিতে হবে।

আদিত্য ঘড়ি দেখল। ছ'টা বেজে গেছে। একটু পরেই অমিতাভদের বাড়িতে যেতে হবে। তার আগে কয়েকটা ফোন সেরে নেওয়া দরকার। প্রথম ফোন তার বন্ধু ক্রিমিনাল লয়ার সুনন্দ মিত্রকে যে মন্টুবাবুর কাছে তার খবর পৌঁছে দিয়েছিল।

'আদিত্য, বল।' ওপার থেকে সুনন্দর গমগমে গলা শোনা গেল।

'দু'মিনিট কথা বলা যাবে?'

'অবশ্যই। কোর্ট শেষ, চেম্বারে সাতটার আগে যাই না। তুই বল।'

'প্রথমেই তোকে ধন্যবাদ জানাই, আমার কাছে ক্লায়েন্ট পাঠানোর জন্য। তুই কি মন্টুবাবুকে আগে থেকে চিনতিস?'

'মন্টুবাবু? কে বলত? ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'মন্টুবাবু, পোশাকি নাম জিতেন্দ্রনাথ দত্ত, আমার কাছে একটা ব্যাপারে সাহায্য চাইতে এসেছিলেন। বললেন, তুই পাঠিয়েছিস।'

ওপারে কিছুক্ষণ নীরবতা। লাইনটা কেটে গেল নাকি? আদিত্য দু'বার 'হ্যালো, হ্যালো' বলল। লাইন কাটেনি। সুনন্দ ভাবছিল। এবার তার মনে পড়েছে,

'ও হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ভদ্রলোক কী একটা টেলিফোনে গোস্ট কলের সমস্যা নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। আমি বললাম এটা আইনের সমস্যা নয়। আমি কিছু করতে পারব না। তোর কাছে যেতে বললাম।'

'তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে ভদ্রলোক তোর রেগুলার ক্লায়েন্ট নন। তোর কাছে সোজাসুজি অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে নতুন লোকেদের তো তিন-চার মাস লেগে যায়। ভদ্রলোক কি কারও রেফারেন্স-এ এসেছিলেন?'

'এক পুলিসকর্তার রেফারেন্সে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছিল। বুঝতেই পারছিস আমাদের লাইনে করে কম্মে খেতে গেলে পুলিসের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখতেই হয়।'

'আমাকে পুলিসকর্তাটির নামটা বলতে পারবি? অবশ্যই কনফিডেন্সিয়ালি।'

'ও কে। বলছি। তবে জানিস তো এসব কথা পাঁচকান না হওয়াই ভাল।'

'নিশ্চিন্ত থাক। আর কেউ জানতে পারবে না।'

আদিত্য নামটা লিখে নিল। পরের ফোন মন্টুবাবুকে।

'হ্যালুউউউ?'

'মণ্টুবাবু, আমি আদিত্য মজুমদার বলছি। কেমন আছেন?'

'ভাল আছি আদিত্যবাবু, মানে এই অবস্থায় যতটা ভাল থাকা যায় আর কি। আপনার কি খবর?'

'আমার নতুন কোনও খবর নেই। তবে আপনার ভূতুড়ে টেলিফোনের কেস এখনও আমাকে ভাবাচ্ছে। যদি আপনার আপত্তি না থাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'বলুন। তবে বলে রাখি, সুশান্তর সঙ্গে এখনও যোগাযোগ করা হয়ে ওঠেনি। ফলে ভূতুড়ে টেলিফোন আগের মতোই বেজে যাচ্ছে। বকুলকেও এখনও কিছু বলিনি। আদৌ বলব কিনা ভাবছি। একটা কিছু ঠিক করে আপনাকে জানাব।'

'আমার মনে হয়, আর একটা সপ্তাহ যেতে দিন। তারপর না হয় কিছু একটা করবেন। দরকার পড়লে আমি তো আছিই।'

'সে আমি জানি। আপনি কী জিজ্ঞেস করবেন বলছিলেন?'

'হ্যাঁ, আমার প্রথম প্রশ্ন, আমার বন্ধু সুনন্দ মিত্রের কাছে আপনাকে কে পাঠাল?'

'আমি তো উকিল-ব্যারিস্টারের তেমন খোঁজ রাখি না, আমার বন্ধু রজনী বলল সুনন্দবাবুর কাছে যেতে। ওর পুলিশে কে চেনাশোনা আছে, তাকে ধরে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টও করিয়ে দিল। সুনন্দবাবু বললেন এ ব্যাপারে ওঁর করনীয় কিছু নেই। উনি আপনার কাছে যেতে বললেন। আপনার ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর সব দিয়ে দিলেন।'

'বুঝলাম। আর একটা জিনিস জানার ছিল। আপনার মেয়ে সুলতার এক মাসি আপনার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর কয়েক বছর সুলতার দেখাশোনা করতেন। তার সঙ্গে আগে, মানে আপনার স্ত্রী মারা যাবার আগে, আপনাদের যোগাযোগ ছিল?'

'খুব একটা ছিল না। কল্পনার নিজের কোনও ভাইবোন ছিল না। ইনি কল্পনার খুড়তুতো বোন। কল্পনার কাকা দিল্লী না জয়পুর কোথায় যেন চাকরি করতেন। কল্পনার বোন আলপনা ওসব দেশেই বড় হয়েছে। আমাদের বিয়ের সময় ওরা নিশ্চয় এসেছিলেন। তবে আমার ঠিক মনে নেই। কল্পনার এই বোনের বিয়েও হয়েছিল ওসব জায়গায় কোথাও। মাঝখানে ওদের সঙ্গে দীর্ঘদিন কোনও যোগাযোগ ছিল না। আলপনার বিয়ের খবর পেয়েছিলাম, তবে দূরে বলে যাওয়া হয়নি। কল্পনা মারা যাবার কিছুদিন পরে আলপনা হঠাৎ একদিন আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। এসে নিজের পরিচয় দিল, নাহলে তো আমি চিনতেই পারতাম না। ইতিমধ্যে সে বিধবা হয়েছে। ছেলেপুলেও নেই। শ্বশুরবাড়ির কোনও দূর সম্পর্কের আত্মীয়বাড়িতে অপমানে আছে। তারপর থেকে সে মাঝে মাঝেই আসত। সুলতা ওর খুব নেওটা হয়ে পড়ল। পাইকপাড়ায় আমার একটা বাড়ি খালি পড়ে ছিল। আমি ওখানে ওকে থাকতে দিলাম। মাঝে মাঝে সুলতার আবদারে আমাদের বাড়িতেও থেকে যেত। আমি ওর কাছে খুব কৃতজ্ঞ ছিলাম। সুলতাকে ও মায়ের যত্নে মানুষ করত।'

'তারপর কি হল?'

'আপনি নিশ্চয় জানতে পেরেছেন, আলপনা হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে যায়। এটা আমাদের পরিবারের আরেকটা কলঙ্ক। শুনতে পেলাম ওর স্বামীর টাকাকড়ি ম্যানেজ করার জন্য ও যে মাঝে মাঝে ব্যাঙ্কে যেত সেখানেই এক বিবাহিত ভদ্রলোকের সঙ্গে ওর আলাপ হয়। পরে শুনলাম ভদ্রলোক নাকি মাঝে মাঝে পাইকপাড়ার বাড়িতেও আসতেন। তারপর একদিন দুজনে মিলে পালিয়ে যায়। আমরা পুলিশে ডায়েরি করেছিলাম। পুলিস কত দূর চেষ্টা করেছিল জানি না, তবে আলপনার সন্ধান কিছুই দিতে পারেনি। সুলতা খুব কষ্ট পেয়েছিল। ও তখন বড় হচ্ছে, বুঝতে শিখছে। মাসির কথা আর বলত না। মাসির ওপর ওর নিশ্চয় খুব অভিমান হয়েছিল।'

মন্টুবাবু থামলেন। আদিত্য বলল,

'আজ রাখছি। আমি কয়েকদিন পরে ফোন করে খবর নেব। ভাল থাকবেন।'

'আপনিও ভাল থাকবেন।'

তৃতীয় ফোনটা করার আগে আদিত্য অনেকক্ষণ ভাবল। একটা দ্বিধা, একটা দোটানা তাকে ফোন করতে বাধা দিচ্ছে। একবার কয়েকটা সংখ্যা ডায়াল করে মাঝপথে কেটে দিল। শেষে অনেক দোলাচলের পর পুরো নম্বরটা ডায়াল করল সে। ওপাশ থেকে বকুলের গলা শোনা গেল,

'হ্যালো।'

'আমি সূর্য বলছি। সুলতার দেওর। কেমন আছেন?'

'ও সূর্যবাবু? আপনি কোথা থেকে বলছেন? ভিলাই থেকে?' বকুলের গলাটা উষ্ণই শোনাল।

'আমি কলকাতা থেকেই বলছি। সেদিন আমার যাওয়া হয়নি। আর এসি টিকিটটা কনফার্মড হল না। ভাবলাম অত দূর বসে বসে যেতে পারব না। শুক্রবারই যাব ঠিক করলাম। কাল রাত্তিরে আমার ট্রেন।

'এই কদিন কোথায় রয়েছেন?'

'এক পুরোনো কলিগের বাড়িতে। আমি জানতাম না ও এখন এখানে পোস্টেড। সেদিন আপনাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্টেশন যাবার পথে ওর ফোন এল। ওদের বাড়িতে থাকিনি বলে খুব বকাবকি করল। হাওড়া থেকে ওদের বাড়িতে চলে গেলাম। মন্টুবাবু অবশ্য এসব কিছু জানেন না।'

'ভালোই হল। আমাকে মনে করে তবু ফোন করলেন। ভিলাই পৌঁছে গেলে কি আর মনে থাকত?'

'ভাবছিলাম, কাল রাত্তিরে তো চলে যাচ্ছি। আর কোনও দিন দেখা হবে কিনা কে জানে। আসার সময় ভাল করে গুডবাইটাও বলে আসতে পারলাম না। তাই ভাবছিলাম, কাল সকালে আপনার সঙ্গে কোথাও দেখা করা যেতে পারে কি? আমি ঢাকুরিয়ায় আছি। গড়িয়াহাটের কোথাও যদি এক সঙ্গে লাঞ্চ করা যায় খুব ভাল হয়। মন্টুবাবুকেও বলব ভাবছিলাম। কিন্তু উনি ব্যস্ত মানুষ, কাজের দিনে হয়ত আসতে পারবেন না।

তাই ওঁকে আর বিব্রত করছি না। আসলে, ক'টা দিন আপনাদের ওখানে খুব অত্যাচার করলাম তো। একবার অন্তত আপনাকে কোথাও ট্রিট করতে পারলে খুব ভাল লাগবে।'

বকুল উত্তর দিচ্ছে না। আদিত্য ফোনটা ধরেই আছে। প্রায় একযুগ পরে চাপা গলায় বকুল বলল,

'সাড়ে বারোটায় গড়িয়াহাটে ট্রেডার্স অ্যাসেম্বলির সামনে অপেক্ষা করব।'

(৪)

রত্নাবলী বলল তাদের কলেজের কয়েকজন অধ্যাপিকা সম্প্রতি 'পান্থজনের সখা' নামক ট্র্যাভেল এজেন্টদের মাধ্যমে ইটালি ঘুরে এসে খুব পরিতৃপ্ত। রত্নাবলী বলছিল,

'এদের ট্রিপগুলো সাধারণত একটা দেশ বা একটা বড় দেশের একটা অংশতে কনফাইনড থাকে। অন্য এজেন্সিগুলো যেমন পাঁচদিনে সাতটা দেশ দেখিয়ে দেয়, যার ফলে ফিরে আসার পর হোটেলের ঘরগুলো ছাড়া আর কিছুই মনে থাকে না, শুধু পাড়ার লোককে বলা যায় সুইটজারল্যান্ড দেখেছি, ফ্রান্স দেখেছে, জার্মানি দেখেছি, হল্যান্ড দেখেছি, এই দেখেছি ওই দেখেছি, 'পান্থজনের সখা' সেরকম নয়।'

'একটা পুরোনো হলিউডের ছবি ছিল, ইফ ইটস টিউসডে, দিস মাস্ট বি বেলজিয়াম। এইসব ঝটিকা সফর নিয়ে। বেশ মজার ছবি। অনেকদিন আগে দেখেছিলাম।' অমিতাভ বলল।

'আমিও দেখেছি।' আদিত্যর মনে পড়ে গেল। 'দাঁড়া, দাঁড়া, আমরা একসঙ্গেই তো দেখেছিলাম। ইউ এস আই এস-এ দেখিয়েছিল।'

'হোয়্যার ডিড ইয়োর কলিগস ট্র্যাভেল ইন ইটালি?' মালিনী জিজ্ঞেস করল।

'বেশি জায়গা নয়। ভেনিস, ফ্লরেন্স, রোম আর নাপোলি মানে নেপলস। নেপলস থেকে পম্পেইতেও নিয়ে গিয়েছিল। লাস্ট সাপারটা দেখানোর জন্য মিলান-এও নিয়ে যাবার কথা ছিল, কিন্তু ওদেশে পৌঁছে শোনা গেল লাস্ট সাপার-এর রেনোভেশন চলছে। ওপরটা পুরো ঢাকা, দেখতে হলে শুধু পাগুলো দেখতে হবে। তাই ওরা আর যায়নি। কিন্তু যেখানে নিয়ে গেছে খুব ভাল করে ঘুরিয়ে দেখিয়েছে। তাছাড়া কী একটা গণ্ডগোলের ফলে ফেরার প্লেন ধরতে দুদিন দেরি হয়েছিল। 'পান্থজনের সখা' ওদের ভাল হোটেলে রেখেছিল অ্যাট নো এক্সট্রা কস্ট। আর ওদের খরচটাও আশ্চর্য রকমের কম। মালিনী ইউ ফলো মি, রাইট?' শেষের প্রশ্নটা রত্না একটু কন্ট্রিতভাবে মালিনীকে করল।

'জাস্ট ডোন্ট ওয়ারি, আই ফলো ইউ পারফেক্টলি। বিসাইডস আই অ্যাম গেটিং ট্রান্সফার্ড টু বেঙ্গল ভেরি সুন। আই হ্যাভ টু পিক আপ বাংলা।'

'আমি ওকে দু'দিনে বাংলা শিখিয়ে দেব।' গৌতম ভারিক্কি চালে বলল।

'বুঝতেই পারছি রত্না, 'পান্থজনের সখা' তোকে এজেন্ট হিসেবে রেখেছে। তা রাখুক, আমার আপত্তি নেই। তুই শুধু বল, ওদের সঙ্গে কি কোনও ট্যুর গাইড থাকে? ইটালির মত জায়গায় একটা গাইড না থাকলে খুব অসুবিধে।' আদিত্য রত্নার দিকে তাকিয়ে বলল।

'থাকে তো। ওদের সঙ্গে একটি বাঙালি ছেলে সারাক্ষণ ছিল। তাছাড়া ওদের কোনও অসুবিধে হচ্ছে কিনা দেখার জন্য এক বাঙালি ভদ্রমহিলা, যিনি ওদের লন্ডন অফিসটা দেখাশোনা করেন, সেখান থেকে এসে কিছুদিন ওদের সঙ্গে কাটিয়ে গেছিলেন।'

'যাঁরা ইটালি গেছিলেন তাঁদের মধ্যে কারোর সঙ্গে একটু কথা বলা যাবে?'

'কেন? তুই ইটালি যাবি নাকি?' রত্না একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'আমি না, আমার এক মক্কেল। ব্যাপারটা জরুরি। একটু তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করা যাবে?'

'কাল সাড়ে দশটা নাগাদ কলেজে চলে আয়। সুনন্দাদির সঙ্গে কথা বলিয়ে দেব।'

'একবার বারান্দায় আসবি, কথা আছে।' আদিত্য উঠে দাঁড়িয়ে গৌতমকে বলল।

আদিত্য আর গৌতম উঠে বারান্দায় যাচ্ছে, শুনতে পেল রত্না পেছন থেকে বলছে,

'কথা না কচু। দু'টোতে বিড়ি ফুঁকতে যাচ্ছে।'

বারান্দায় সিগারেট খেতে খেতে আদিত্য গৌতমের সঙ্গে তার ধারণাগুলো নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা করল। ভবিষ্যতের করণীয় নিয়েও কথাবার্তা হল। জাল গুটিয়ে আসছে। কয়েক দিনের মধ্যেই ভূতুড়ে টেলিফোন রহস্যের সত্যিকারের সমাধান হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।

## নবম পরিচ্ছেদ

(১)

আদিত্যর ছোটবেলায় কলকাতা সহরের ভাল রেস্তোরাঁগুলো সবই ছিল পার্ক স্ট্রীটে। তার মধ্যে সাহেবি পার্ক স্ট্রীটের একেবারে শেষ প্রান্তের একটি রেস্তোরাঁ ছিল আদিত্যর বাবার সব থেকে পছন্দসই। পার্ক স্ট্রীটে খেতে যাওয়া হলে সেখানেই যাওয়া হত। অনেকদিন হল রেস্তোরাঁটি উঠে গেছে। তবে আদিত্যর বাবার আমলে সচরাচর বাইরে খেতে যাওয়া হত না। আদিত্যর বাবা কলকাতার অভিজাত ক্লাবগুলির সবকটিরই মেম্বার ছিলেন। রাত্তিরে মাঝে মাঝেই ক্লাব থেকে খাবার আসত। সেসব খাবারের স্বাদ এখনও আদিত্যর মুখে লেগে আছে। বিশেষ করে সনাতন রোস্ট, স্টেক, সুফ্লে বা পুডিং জাতীয় সাহেবি খাবার বানানোয় ক্লাবগুলোর জুড়ি ছিল না। বহু বছর হয়ে গেল আদিত্য কোনও ক্লাবে যায়নি।

আজকাল অবশ্য দক্ষিণ কলকাতায় বেশ ভাল ভাল রেস্তোরাঁ হয়েছে। অমিতাভ-রত্না-টুপলুর সঙ্গে অনেকবার আদিত্য সেসব রেস্তোরাঁতে খেয়েছে। তাদের কয়েকটাকে মন্দ লাগেনি। তবে আদিত্য অবাক হয়ে খেয়াল করেছে, যেসব রেস্তোরাঁর খাবার তার ভাল লেগেছিল তার কোনটাই খুব বেশি দিন চলেনি। নিশ্চয় তার যেটা পছন্দ সেটা আমজনতার পছন্দ নয়। আদিত্যর চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল, একটা লাল গাড়ির পেছনের সীট থেকে বকুল তাকে ডাকছে।

'তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন, এখানে একেবারে দাঁড়াতে দেয় না, পার্কিংও নেই। তাড়াতাড়ি উঠুন।'

পেছনের দরজা খুলে আদিত্য বকুলের পাশে বসল। বলল,

'কোথায় যাওয়া হবে আপনিই ঠিক করুন। আমি এসব পাড়ার কিছুই জানি না।'

'লেকের কাছে একটা নতুন জাপানি রেস্টোরান্ট হয়েছে। খুব দূরে নয়। ওখানেই যাই। আপনার মাথায় ভাল মতন কাঁঠাল ভাঙা যাবে।'

'আমার তাতে কোনই আপত্তি নেই।'

বকুল একটা হালকা ছাই রঙের কুর্তা-চুড়িদার পরেছে। চোখে মস্ত গোল গোল রোদ-চশমা। গাড়িতে উঠে আদিত্য আবার সেই হালকা পারফিউমটার গন্ধ পেল। বকুলই ড্রাইভারকে বলল কোথায় যেতে হবে। মিনিট দশেকের মধ্যে আদিত্য দেখতে পেল তারা টেম্পুরা গার্ডেন বলে ছিমছাম একটা রেস্তোরাঁর সামনে পৌঁছে গেছে। পাড়াটা নির্জন, বিশেষ করে এই কাজের দিনের দুপুরে রাস্তায় একটাও লোক নেই। আদিত্যর বেশ নার্ভাস লাগছে। কোনও মহিলাকে নিয়ে সে কখনো কোনও রেস্তোরাঁতে আসেনি। তার ওপর এই মহিলা বিবাহিত এবং তার মক্কেলের স্ত্রী।

'সুসি দিয়ে শুরু করা যাক, না কি? তারপর না হয় এদের একটা প্রন টেম্পুরা মিল আছে সেটা নেওয়া যাবে। আপনার কাঁচা মাছ চলবে তো?'

'কাঁচা মাছ? আপনার চললে আমারও চলবে। আপনিই মেনুটা ঠিক করুন। আমি জাপানি খাবারের কিছুই জানি না। আপনার হাতে নিজেকে সঁপে দিচ্ছি।'

আদিত্যর মনে পড়ল, কলকাতার যে অভিজাত ক্লাবটি থেকে তাদের বাড়িতে প্রায়শই খাবার আসত সেখানে বছরে অন্তত দুবার জাপানি ফেস্টিভাল পালন করা হত। সেই উপলক্ষে সুসি বা টেম্পুরা সে বহুবার খেয়েছে। কিন্তু এখানে সেসব কথা বলার উপায় নেই।

'গতকাল আমার এক পরিচিত আপনার দাদার ট্র্যাভেল এজেন্সি 'পান্থজনের সখা'র খুব প্রশংসা করছিল। 'পান্থজনের সখা'র মাধ্যমে তারা সম্প্রতি ইটালি ঘুরে এসেছে। খুব স্যাটিসফায়েড। আপনি কখনও ওদের সঙ্গে বেড়াতে যাননি?'

'গেছি তো। বলতে গেলে প্রত্যেক বছরেই যাই। কোনও কোনও বছরে একাধিকবারও গেছি। আমার কর্তামশাই অবশ্য কখনো যাননি। ভ্রমণে তাঁর কোনও উৎসাহ নেই, বিদেশ ভ্রমণে তো একেবারেই নেই।

তবে আমার যাবার ব্যাপারে তিনি কখনও বাধা দেননি, বরং উৎসাহ দিয়েছেন। একবার ভেবেছিলাম দাদার এজেন্সিতে একটা চাকরি নেব। একা একা বাড়িতে ভাল লাগে না। দাদাকে বললেই রাজি হয়ে যেত। কিন্তু এই একটা ব্যাপারে আমার কর্তাটি ভীষণ কনজারভেটিভ। তাঁর ধারণা বাড়ির বউ-এর কখনও বাইরে চাকরি করতে যাওয়া উচিত নয়। সে যাক। আপনার কথা বলুন। আপনার সম্বন্ধে তো জিজ্ঞেসই করা হয়নি। আপনার বাড়িতে কে কে আছেন?'

'বাড়িতে কেউ নেই। একা থাকি। মাঝে মাঝে সুলতা-বৌদিদের বাড়িতে যাই। তবে সেও ন-মাসে ছ-মাসে।'

আদিত্য নিজেই অবাক হয়ে গেল কী অনায়াসে সে মিথ্যে কাল্পনিক একটা জীবন বানিয়ে নিচ্ছে।

'বিয়ে করেননি?'

প্রশ্নটা করতে গিয়ে বকুলের গলাটা একটু কেঁপে গেল কি? আদিত্যর মনের ভুল হতে পারে। সে বলল,

'হয়ে উঠল কই?' তারপর নিরীহভাবে বলল,

'আমার কখনো বিদেশ যাওয়া হয়নি, জানেন। তবে যেতে খুব ইচ্ছে করে। ব্যাঙ্ক থেকে চার বছরে একবার বেড়াতে যাবার টাকা দেয়। তাতে বিদেশ যাওয়া যায় না, তবে দেশের মধ্যে দিন কতক বেশ ঘুরে আসা যায়।একবার গোয়া গেছি। একবার কেরালা। একাই।'

'দেশের মধ্যে আমার কোথথাও যাওয়া হয়নি। মেয়েরা তো আর একা বেড়াতে যায় না। আমার কর্তা কিছুতেই কলকাতা ছেড়ে নড়বেন না। দাদার এজেন্সি ছাড়া আমার কোথাও যাবার উপায় নেই। ওরা দেশের মধ্যে ঘোরায় না।'

খাবার এসে গেছে। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ। বকুল জিজ্ঞেস করল,

'কাঁচা মাছ কেমন লাগছে?'

'বুঝতেই তো পারলাম না কাঁচা মাছ। তবে চিংড়িটা সত্যিই ভাল। এটাই বুঝি টেম্পুরা?'

'এটাই টেম্পুরা। আর ওই ভাত দিয়ে মোড়া মাছের টুকরোগুলো সুসি।'

'আপনি খুব রান্না করেন, না?'

'রোজের রান্না মালতীই করে। আমি কখনও-সখনও সখ করে রান্না ঘরে ঢুকি। তবে আমার কর্তার পছন্দগুলো একেবারে সাবেকি। ডাল, ঝোল, তরকারি। এর অন্যথা হলে মুখ ভার। কার জন্য আর নতুন নতুন পদ রাঁধব?'

'একটা চাদর ঢাকা তানপুরা দেখলাম আপনাদের বৈঠকখানায়। আপনার কি গান-বাজনার চর্চা আছে?'

'তানপুরা আমার নয়, সুলতার। সুলতা খুব সুন্দর গান গাইত। ওর বিয়ে হয়ে যাবার পর থেকে তানপুরাটা ওইভাবেই পড়ে আছে। ভিলাইতে সুলতা গান করে না?'

'কখনো শুনিনি। মনে হয় সংসারের চাপে বৌদি গান-টান একেবারে ছেড়ে দিয়েছে। ফিরে গিয়ে একবার জিজ্ঞেস করব।'

বকুলের রোদ চশমাটা কপালের ওপর তোলা। চশমার আয়নায় মেঘের ছায়া পড়েছে।

'সময় কাটান কেমন করে? বই পড়েন? টিভি?'

'সময় কাটতেই চায় না। বই পড়ার অভ্যেস নেই। টিভিও বেশিক্ষণ ভাল লাগে না। ছাদে একটা বাগান করেছি। সেদিন অন্ধকারে দেখানো হয়নি। বাগানের পেছনে খানিকটা সময় কাটে। মাটির টবে একটা জুঁই গাছ হয়েছে। খুব কুঁড়ি ধরেছে। এবার ফুল ফুটবে।'

আদিত্য জানলা দিয়ে দেখল একটা গাড়ি অনেকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। দুটো লোক সামনের সীটে বসে অপেক্ষা করছে। একজন ড্রাইভারের সীটে, একজন তার পাশে। কার জন্য অপেক্ষা করছে? একটা বড় মেঘ এসে আস্তে আস্তে সূর্যটাকে ঢেকে দিচ্ছে। রাস্তাটা আঁধার হয়ে গেল। বকুলের মুখের ওপরেও কি

অন্ধকারের ছায়া পড়ল? ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে বকুলকে। আদিত্য অনেকক্ষণ বকুলের দিকে তাকিয়ে ছিল। বকুলের ভেতরে কী ঘটছে বোঝার চেষ্টা করছিল। ওয়েটার কফি দিয়ে গেছে।

(২)

সন্ধের দিকে গৌতমের ফোন এল। আদিত্য তখন আপিসে। গৌতম বলল,

'কালকের আয়োজন মোটামুটি কমপ্লিট। কাল ভোর-রাত্তিরে সুশান্তর দোকান, আব্দুলের আড্ডা, মন্টুবাবুদের পাড়ার পরিত্যক্ত কারখানা সব এক সঙ্গে রেড হচ্ছে। আমি আমার টিমকে জানিয়ে দিয়েছি। যে নামটা তুই বললি তাকে বলেছি যেন পুরোটা কোঅরডিনেট করে। আমরা আর একটু পরে অপরেশনে যাব। এটা অবশ্য কেউ এখনও জানে না। আমরা যখন অপরেশনে যাব তখন সাইমাল্টেনিয়াসলি 'পান্থজনের সখা'র অফিস রেড করা হবে। এটাও তুই আমি ছাড়া আর কেউ আগে থেকে জানছে না। তোর কী খবর?'

'খবর ঠিকই আছে। সকালে রত্নাদের কলেজে গিয়েছিলাম। প্রথম ছবিটা কেউ চিনতে পারল না। কিন্তু দ্বিতীয় ছবিটা, যেটা তোদের আর্টিস্ট একটু মডিফাই করে দিয়েছেন, দেখানো মাত্রই আইডেন্টিফাইড হয়ে গেল। অর্থাৎ যা সন্দেহ করেছিলাম ঠিক তাই। নতুন কিছু ঘটলে তোকে সঙ্গে সঙ্গে জানাব।'

'ও কে। কাল তাহলে তোকে সকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ তুলে নিচ্ছি।'

'ও কে।'

আদিত্য মোবাইল বন্ধ করে টেবিলে রাখল। আরও দুএকটা ফোন সেরে নিতে হবে। প্রথমে বিমল।

'গুড ইভিনিং স্যার। প্ল্যান সব ঠিক আছে তো?'

'সব ঠিক আছে। তুমি এখন কোথায়?'

'ক্যামাক স্ট্রীটে, একটা রাস্তার চায়ের দোকানে বসে আছি স্যার। যে বিল্ডিং-এ পান্থজনের আপিস, তার ঠিক উলটো দিকে। রজনীবাবু এখনও বেরোননি। বেরোলে আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে জানিয়ে দেব।'

'ঠিক আছে, বসে থাক।'

আদিত্য ফোন ডিসকানেক্ট করে আরেকটা নম্বর লাগাল।

'আদিত্যবাবু, বলুন।' ওপার থেকে মিহি কণ্ঠ ভেসে এল।

'চারদিকে নজর রাখছেন তো?'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার দৃষ্টি এড়িয়ে একটা মাছিও গলতে পারবে না।'

'সন্দেহজনক কিছু দেখলেই জানাবেন।'

'সঙ্গে সঙ্গে জানাব। আপনার কোনও চিন্তা নেই।'

'ঠিক আছে। হয়ত কালই দেখা হয়ে যেতে পারে।'

'ঠিক আছে।'

এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। আদিত্য আপিস বন্ধ করে রাস্তায় নামল। বউবাজার স্ট্রীটে জনস্রোত চলছে। সে ভাবল, এখনো সে এই রাস্তাটাকে বউবাজার স্ট্রীটই বলে। এর আধুনিকতর নাম যে বিপিনবিহারি গাঙ্গুলি স্ট্রীট সেকথাটা মনেই থাকে না। কেন যে কর্পো□□□□□□ কর্তারা পুরোনো নামগুলো পালটে দেন। ইতিহাসের প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা থাকলে এটা ঘটত না। অন্নদাশঙ্করের লাইন মনে পড়ল ''দ্বিধা হও দ্বিধা হও ওগো মা ধরণী/ চিতুরের নাম হল রবীন্দ্র সরণী''।

আদিত্য এখন কলেজ স্ট্রীট ধরে হাঁটছে। পুরোনো বইয়ের দোকানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বই দেখল। তারপর কফি হাউসে গিয়ে বসল। তার ভেতরে ভেতরে একটা দারুণ উত্তেজনা রয়েছে। এক কাপ কালো কফি নিয়ে আদিত্য অনেকক্ষণ বসে রইল। তারপর আরও এক কাপ। যখন বেয়ারারা ফাঁকা চেয়ারগুলোকে টেবিলের ওপর তুলে দিয়ে কফি হাউস বন্ধ করার ইঙ্গিত দিচ্ছে, আদিত্য উঠে পড়ে ঘরমুখো হল। সে মেসবাড়ির

সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠছে, তখন প্রথম ফোনটা এল। দ্বিতীয় ফোনটা এল তার অনেক পরে, প্রায় রাত একটায়। আজ রাত্তিরে আদিত্যর ঘুম হবে না।

(৩)

ঠিক সাড়ে পাঁচটাতেই গৌতমের ফোন এল, 'নীচে নেমে আয়, আমরা এসে গেছি।'

পৌনে ছটার মধ্যে তারা চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের সামনে। স্করপিও গাড়ির মাঝের সীটে গৌতম আর আদিত্য, পেছনের সীটে তিনজন আর্মড পুলিশ, সামনে ড্রাইভারের পাশে গৌতমের খাস বডিগার্ড। পিছনে আর একটা গাড়ি ভরতি পুলিশ। চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল অব্দি যেতে হবে ড্রাইভার এইটুকুই জানত। জিজ্ঞেস করল, 'এবার কোনদিকে স্যার?'

'আদিত্য, রাস্তা বলে দে।' গৌতম আদিত্যকে বলল।

কলকাতা সহর এখনও ঘুমের মোড়ক থেকে বেরোয়নি। শুধু রুগির বাড়ির দু'চারজন যারা কাল সারারাত হাসপাতালে রাত জেগেছিল, চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে। আদিত্য লক্ষ করল সেই টেলিফোনের বুথটা খোলা রয়েছে, যদিও এই মুহূর্তে কেউ সেখান থেকে টেলিফোন করছে না। উলটো দিকের কচুরির দোকানটা এখনও খোলেনি। পুলিশের গাড়ি দুটো যখন মন্টুবাবুর বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল তখন ঘড়িতে ছটা বেজে কয়েক মিনিট। আদিত্যরা গাড়ি থেকে নামতেই ভোজবাজির মতো হঠাৎ কোথা থেকে যেন একটা লোক আবির্ভূত হল।

'কাল সাড়ে আটটা নাগাদ ম্যাডাম ফিরেছেন। ম্যাডামের স্বামী ফিরেছেন আরও আধঘণ্টা পরে। তারপর বাড়িতে আর কেউ আসেনি, বাড়ি থেকেও কেউ বেরোয়নি। আমি সারারাত্তির নজর রেখেছি স্যার।'

'এটা কে?' আদিত্য গৌতমের দিকে তাকাল।

'এ আমাদের লোক। খুব হুশিয়ার ছেলে। সারা রাত্তির মন্টুবাবুর বাড়ির ওপর নজর রেখেছে।।'

'ও, তাই বুঝি।'

গৌতম লোকটিকে বলল, 'তুমি এখন বাইরেই থাক। ভেতরে যাবার দরকার নেই। আদিত্য, তুই অবশ্য উইটনেস হিসেবে আমার সঙ্গে যাচ্ছিস।'

বার তিনেক বেল বাজানোর পর চোখ মুছতে মুছতে মালতী এসে দরজা খুলে দিল। পুলিশ দেখে স্পষ্টতই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে তার মুখে। তারপর আদিত্যকে চিনতে পেরে ব্যাকুল হয়ে বলল,

'এসব কী হচ্ছে দাদাবাবু? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। পুলিশ কেন?'

'তোমাকে বুঝতে হবে না। তুমি দাদা-বৌদিকে খবর দাও।'

খবর অবশ্য দিতে হল না। তার আগেই লুঙ্গি-গেঞ্জি পরে মন্টুবাবুকে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখা গেল, তাঁর পেছন পেছন রাত্রিবাসের ওপর একটা চাদর জড়িয়ে বকুল। মন্টুবাবুই প্রথম কথা বললেন,

'কী ব্যাপার? আপনারা এত ভোরবেলা?' তাঁর গলাটা কাঁপছে।

গৌতম এগিয়ে গেল, পুলিশি কায়দায় বলল,

'আপনার নাম জিতেন্দ্রনাথ দত্ত?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমরা লালবাজার থেকে আসছি। আমি জয়েন্ট কমিশনার ক্রাইম, গৌতম দাশগুপ্ত। আর ইনি আদিত্য মজুমদার, সাক্ষী হিসেবে আমার সঙ্গে এসেছেন। আপনার বাড়ি সার্চ করা হবে। ওয়ারেন্ট আছে।'

'সার্চ করা হবে? কেন? আদিত্যবাবু, আমি কী করেছি?' মন্টু দত্তর গলার আওয়াজটা প্রায় আর্তনাদের মত শোনাল।

'সেটা একটু পরেই বুঝতে পারবেন।' গৌতমের বাহিনী ইতিমধ্যে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়েছে। এত কাণ্ডের মধ্যে বকুল কিন্তু প্রায় অবিচলিতই আছে।

খুব বেশি খুঁজতে হল না। মন্টু দত্তর আলমারির পেছন থেকে গোটা দশেক প্যাকেট বেরোল। একজন উর্দিপরা পুলিশ একটা প্যাকেট থেকে এক চিমটে গুঁড়ো জিভের ডগায় লাগাল, তারপর বলল, 'খাঁটি কোকেন স্যার। সব মিলিয়ে পাঁচ কোটি টাকার কম হবে না।'

'কোকেন!' মনে হল মন্টু দত্ত এবার অজ্ঞান হয়ে যাবেন।

গৌতম এক পা এগিয়ে এল। গম্ভীর গলায় বলল,

'মিসেস বকুল দত্ত, কোকেন ট্র্যাফিকিং-এর চার্জে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল। তাছাড়া ইন্সপেক্টার কানুনগোকে খুন করার চার্জও আপনার ওপর আছে। এই কাজে আপনার মূল সহযোগী সুশান্ত হালদারকে কিছুক্ষণ আগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আপনাকে সাবধান করে দিই, এখন থেকে আপনি যা কিছু বলবেন তা আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হতে পারে।'

ভোজবাজির মতো একজন উর্দিপরা মহিলা পুলিশ আবির্ভূত হয়েছে। আদিত্য লক্ষ করেনি, নিশ্চয় দ্বিতীয় পুলিশের গাড়িটাতে ছিল। মহিলা বকুলের কাঁধে হাত রাখল। বকুল এখনও নির্বিকার। শুধু খুব ঠাণ্ডা চোখে আদিত্যর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

## দশম পরিচ্ছেদ

(১)

'একেবারে গোড়া থেকে বল। আমরা তো কিছুই জানি না।' রত্নাবলী বলল। তাদের বাড়িতে সন্ধেবেলা একটা বড় জমায়েত হয়েছে। সেখানে অমিতাভ-রত্না ছাড়াও রয়েছে গৌতম, গৌতমের কথায় কটা দিনের জন্য দিল্লী ফিরে যাওয়া পিছিয়ে দিয়ে রয়েছে গৌতমের স্ত্রী মালিনী, মন্টুবাবুর পড়শি রামানুজ চট্টোপাধ্যায় এবং অবশ্যই আদিত্য। আদিত্যর পেড়াপেড়িতে বিমলও এসেছে। খুব সংকোচের সঙ্গে ঘরের এক কোণে বসে আছে সে। কিন্তু মন্টুবাবু কিছুতেই এলেন না। বকুল গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে একটা আশ্চর্য নীরবতা গ্রাস করেছে তাঁকে। প্রেসেও যাচ্ছেন না, সারাদিন বাড়িতেই থাকছেন। আদিত্য মূল বক্তা। সে বলতে শুরু করল,

'গোড়া থেকেই বলছি। মাঝে মাঝে একটু অনুমানের মিশেল থাকবে, কিন্তু সেই অনুমানের বাস্তব ভিত্তি আছে। এই সহরের পুবদিকে, পার্ক সার্কাস ও শেয়ালদা স্টেশনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে, রেল লাইন ঘেঁসে, বেশ কয়েক বছর ধরে ড্রাগ ডিলারদের একটা বড় চক্র গড়ে উঠেছিল। ঠিক কতদিন ধরে, সেটা পুলিশ একটু চেষ্টা করলেই বার করতে পারবে। কিন্তু আমাদের গল্পের জন্য সেটা খুব একটা প্রাসঙ্গিক নয়। সে যাই হোক, এই ড্রাগ ডিলারদের মাথা ছিল মহম্মদ আসলাম নামে এক ব্যক্তি। তার ব্যবসা ভালোই চলছিল। বিশেষ করে এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে সে স্থানীয় একটা কলেজ থেকে কিছু একেবারে অল্পবয়স্ক ছাত্রকে কাজে লাগিয়েছিল যারা তার ব্যবসার প্রসারে দু'ভাবে সাহায্য করত। এক, এই অল্পবয়সী মধ্যবিত্ত বাঙালি ছেলেমেয়েগুলোকে পুলিশ চট করে সন্দেহ করতে পারেনি। দুই, ড্রাগের ব্যবসায় এলেও এরা কেউই নিজেরা ড্রাগ অ্যাডিক্ট ছিল না। ফলে অনেক বেশি ঠাণ্ডা মাথায় এরা কাজ করতে পারত। এই ছেলেমেয়েদের লিডার ছিল সুশান্ত হালদার, তার মাসলম্যান ছিল দেবীরঞ্জন। দেবীর বোন বকুলের সঙ্গে সুশান্ত হালদারের প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং বকুলও কিছুদিন পরে এই ব্যবসায় যোগ দেয়। এখানে বলে রাখি, এই ছেলেমেয়েদের মধ্যে সব থেকে মেধাবী ছিল বকুল। না, না, পড়াশোনায় নয়, নিছক বুদ্ধিতে, কল্পনাশক্তিতে, দূরদৃষ্টিতে। আর মাথা ঠাণ্ডা রাখার ব্যাপারে। পড়াশোনা করলে হয়ত বকুল অনেকদূর পৌঁছতে পারত, কিন্তু সেটা হবার নয়, তার মধ্যে যে প্রবল একটা ক্রিমিনাল সত্ত্বা ছিল সেই সত্ত্বাটাই তাকে বক্রপথে চালিত করেছে। ফলে যা অবধারিত তাই ঘটল। ধীরে ধীরে এই পথভ্রষ্ট ছেলেমেয়েগুলোর চালিকাশক্তি হয়ে উঠল বকুল। সুশান্ত হালদার নামেই দলের মাথা, আসলে দলটাকে চালায় বকুল।

'ইতিমধ্যে মাফিয়া ডন মহম্মদ আসলাম নানা রকমের অসুবিধেয় পড়ল। একদিকে পুলিশের উৎপাত, অন্যদিকে আর একটা রাইভাল গ্যাং-এর সঙ্গে এলাকা দখল নিয়ে লাগাতার ঝামেলা। মাঝে মাঝেই তার দলের লোকেদের লাস ট্রেন লাইনের ধারে পড়ে থাকতে দেখা যায়, তার দলের লোকেরাও যে দুচারটে লাস ফেলে আসে না, এমন নয়। কিন্তু এই অশান্তির আবহাওয়ায় ব্যবসা করা যায় না।

'আসলামের ব্যবসার দু'টো দিক ছিল। সে নেপাল থেকে মাল এনে তার একটা অংশ রিটেলে কলকাতায় পাতাখোরদের কাছে বিক্রি করত। এর জন্য তার একটা নেটওয়ার্ক ছিল যেখানে সে এই ছেলেমেয়েগুলোকে কাজে লাগিয়েছিল। সে এদের ধরে রাখার জন্য খুব ভাল টাকা দিত। সাধারণত ড্রাগ অ্যাডিক্টরাই নেশার লোভে ড্রাগ পেডলারের কাজ করে। অর্থাৎ ড্রাগের নেশা ধরিয়ে দিয়েই ড্রাগ পেডলারদের ধরে রাখা হয়। এক্ষেত্রে কিন্তু টাকার নেশা ধরিয়ে ছেলেমেয়েগুলোকে বশে রাখা হত। দেখা যাচ্ছে, ড্রাগের নেশার থেকে টাকার নেশা কোনওভাবেই কম মারাত্মক নয়।

'আসলামের দ্বিতীয় কাজ ছিল নেপাল থেকে মাল এনে মধ্যপ্রাচ্য দিয়ে ইয়োরোপে পাচার করা। এই কাজে দুবাইতে তার এক সহযোগী ছিল। দেশে থাকাটা ধীরে ধীরে অসম্ভব হয়ে পড়ায় আসলাম ঠিক করল

সে পাকাপাকিভাবে দুবাই চলে যাবে। কিন্তু সে দুবাই চলে গেলে তার দেশের ব্যবসাটা কে দেখাশোনা করবে? কলকাতায় আসলামের ডানহাত ছিল আব্দুল। প্রভুভক্তিতে আব্দুলের জুড়ি ছিল না, সে আসলামের জন্য হাসতে হাসতে জীবন দিয়ে দিতে পারত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত একটা অর্গানাইজেশন চালানোর মতো মাথা আব্দুলের ছিল না। এই সময় সুশান্ত হালদার পুরো অর্গানাইজেশনের মাথায় উঠে বসে। এর জন্য যে শঠ বুদ্ধির প্রয়োজন ছিল সেটা বলাই বাহুল্য যুগিয়েছিল বকুল। এককথায় বলতে গেলে বকুলই কার্যত দলের মাথা হয়ে দাঁড়াল।

'দলের কর্তৃত্ব পাবার পর বকুল দু'টো কাজ করল, একটা স্বেচ্ছায়, আরেকটা বাধ্য হয়ে। যেহেতু আসলাম তখন দুবাইতে, দুবাই হয়ে ইয়োরোপে কোকেন পাচার করার সম্ভাবনা তখন অনেক বেড়ে গেছে। সমস্যা হল, সেই সময় দুবাইতে মাল নিয়ে যাবার কোনও স্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল না। এখানে আমাদের বকুলের বড়দা রজনীরঞ্জনের দিকে চোখ ফেরাতে হবে। রজনীবাবু মানুষটা গোড়ায় অসৎ ছিলেন না, কিন্তু বিদেশ ভ্রমণ এবং ট্র্যাভেল এজেন্সি চালানোর পাগলামিটা তখন তার মাথায় ভাল মতন চেপে বসেছে। চাকরি থেকে তাড়াতাড়ি অবসর নিয়ে একটা ট্র্যাভেল এজেন্সি খুলে বসেছেন, স্বপ্ন দেখছেন, বাঙালিকে কম খরচে বিশ্বদর্শন করাবেন। কিন্তু কোম্পানি একেবারেই চলছে না। রিটায়ারমেন্টের পুরো টাকাটাও কোম্পানির গর্ভে চলে গেছে। রজনীবাবুর যখন প্রায় পথে বসার অবস্থা সেই সময় দলের কর্তৃত্ব সুশান্তর বকলমে বকুলের হাতে চলে আসে।

'সুশান্তর মাধ্যমে বকুল তার দাদাকে একটা প্রস্তাব পাঠাল। রজনীবাবুর কোম্পানিকে সুশান্ত অনেক টাকা দিয়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত, কিন্তু সুশান্তর কিছু কিছু কাজ কোম্পানিকে করে দিতে হবে। মূল কাজ কিছু জিনিস নিয়মিত দুবাইতে পৌঁছে দেওয়া। ঠিক কী জিনিস পৌঁছতে হবে সে ব্যাপারে সুশান্ত নিরুত্তর রইল, তবে এই মাল পৌঁছে দেবার কাজটা যে খুব একটা আইনসম্মত নয়, সেটা রজনীবাবুর পক্ষে আন্দাজ করা কঠিন ছিল না। রজনীবাবু লোভে পড়ে গেলেন। শুধু স্বপ্নপূরণের লোভ নয়, মোটা টাকার হাতছানিও বটে। সব মিলিয়ে তাঁর পদস্খলন হল। ক্রমে তিনি সুশান্তর টাকায় দুবাই ও লন্ডনে আপিস খুললেন। তাঁর ব্যবসার প্রভূত উন্নতি ঘটল। আর তাঁর কোম্পানির মাধ্যমে সুশান্ত-বকুলের মধ্যপ্রাচ্য এবং ইয়োরোপের ব্যবসা দিনে দিনে বাড়তে লাগল। রজনীবাবু অবশ্য ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলেন না এই সব কিছুর পেছনে তাঁর সহোদরাও আছেন। রজনীবাবুর ট্র্যাভেল এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করাটা বকুলের প্রথম কাজ।

'এই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটল যার জন্য ড্যামেজ কন্ট্রোল করাটা একেবারে অতি আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মন্টুবাবুর বাড়ির পেছনে যে গলিটা আছে, যার পাশ দিয়ে চলে গেছে রেল লাইন, সেখানেই মূলত কোকেন বা কোকেনজাত অন্যান্য নেশার জিনিসের কেনাবেচা চলত। যোগান আসত রেলগাড়ি করে, লেভেল ক্রসিং-এ রাত্তিরে মালগাড়ি থামিয়ে নিষিদ্ধ বস্তুগুলো নামানো হত। ওই লাইনটা শেয়ালদা স্টেশনে না ছুঁয়ে স্টেশনের পেছন দিয়ে চলে গেছে, তাই এর ওপর দিয়ে খুব বেশি ট্রেন যায় না। ড্রাগ পাচার করার জন্য এটাই আদর্শ রেলরাস্তা। এসব আমরা এখন সুশান্তর কাছ থেকে একটু একটু করে জানতে পারছি।

'আমার বিশ্বাস মন্টুবাবুর প্রথম স্ত্রী কল্পনা দত্ত তাঁর বাড়ির পেছনের গলিতে কিছু একটা ঘটতে দেখেছিলেন। তিনি চিররুগ্না, সারাদিন বাড়িতে থাকেন, তাঁর পক্ষে কিছু একটা দেখে ফেলাটা মোটেই আশ্চর্যের নয়। অচেনা কাউকে যদি তিনি ড্রাগ কেনাবেচা করতে দেখতেন তাহলে কিছু এসে যেত না। তিনি নিশ্চয় চেনা কাউকে কোন গুরুতর অপকর্ম করতে দেখেছিলেন।

'কল্পনা দত্ত একটু পুরোনো ধ্যান-ধারণার মানুষ ছিলেন, ফলে স্বামীর সঙ্গে তাঁর একটা স্বাভাবিক দূরত্ব ছিল। চিররুগ্ন হওয়ার ফলে সেই দূরত্ব আরও বেড়েছিল। তাই তিনি যেটা দেখেছেন সেটা সরাসরি স্বামীকে বলতে তাঁর সংকোচ হল। তাছাড়া নিজের ওপর তাঁর আস্থাও তেমন ছিল না। এটাও দীর্ঘদিন রোগ ভোগের ফল। ফলে তিনি যেটা দেখেছেন সেটা ঠিক দেখেছেন কিনা তা নিয়েও তাঁর সংশয় ছিল। বকুল মাঝেমাঝেই তাঁকে দেখতে আসত। অবশ্য ঠিক তাঁকে দেখতে নয়। মন্টুবাবুর বাড়ির পেছনের গলিতে যে ব্যবসা চলছে

তার রক্ষণাবেক্ষণ করতে আসত বকুল। যাইহোক এই আসা-যাওয়ার ফলে বকুলের সঙ্গে কল্পনা দত্তর একটা সহজ সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। ফলে কল্পনা দত্ত যা দেখেছেন সেটা বকুলকেই প্রথমে বললেন। বকুল, বলাই বাহুল্য, কথাটা হেসে উড়িয়ে দিল। বলল, শরীর রুগ্ন হলে মানুষ এইরকম হ্যালুসিনেশন দেখে। কিন্তু একই সঙ্গে সে মনে মনে ঠিক করল কল্পনা দত্তকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। বলা তো যায় না, উনি কার কাছে আবার এই সব কথা গল্প করে বসবেন।

'রজনীকে দার্জিলিং ভ্রমণের আয়োজন করতে বলা হল। রজনীবাবুর পরিবার, ভাই বোন ছাড়াও পারিবারিক বন্ধু হিসেবে সুশান্ত বেড়াতে যাবে। রজনীবাবুকে বলা হল দার্জিলিং ভ্রমণে মন্টুবাবুদেরও রাজি করাতে হবে। মন্টুবাবু ঘরকুনো লোক, তাঁর স্ত্রী অসুস্থ। দার্জিলিং ভ্রমণে তাঁদের রাজি করানো সহজ কাজ নয়। এই কাজটা রজনীবাবুই একমাত্র করতে পারেন। রজনীবাবু বন্ধুকে বললেন আমাদের সঙ্গে চলো, বৌদিরও একটা হাওয়া বদল হবে। মন্টুবাবু গাঁইগুঁই করে শেষ পর্যন্ত রাজিও হয়ে গেলেন। আমার বিশ্বাস, রজনীবাবু জানতেন না কল্পনা দত্তকে দার্জিলিং-এ নিয়ে গিয়ে খুন করার চক্রান্ত হচ্ছে।

'পিকনিক করতে গিয়ে কল্পনা দত্ত একা ঘুরতে ঘুরতে আলাদা হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর অসুস্থ শরীর, তবু কলকাতার বাইরে গিয়ে, বিশেষ করে হিমালয়-টিমালয় দেখে, তাঁর মনে একটা জোর এসে গিয়েছিল। সেই মনের জোরে তিনি একা একা খানিকটা হাঁটতে সাহস পাচ্ছিলেন। তিনি কোথায় যাচ্ছেন তার খেয়াল রাখছিল দেবী। হয়তো দেবীই তাকে সঙ্গ দিয়ে আরও দূরে নিয়ে যায়। তারপর কল্পনাকে নির্জনে পেয়ে তাঁকে শ্বাসরোধ করে খুন করে। খুন করার পর দেবী মৃতদেহটা ফেলে দেয় একটা খাদে। পুলিশ পরে ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে এই সত্যটাই আবিষ্কার করেছিল। ইনভেস্টিগেটিং অফিসার ছিলেন বাসুদেব কানুনগো। পুলিশ ফোর্সে এত সৎ এবং দক্ষ অফিসার সচরাচর দেখা যায় না। ইন্সপেক্টার কানুনগো আরও কী কী সত্য আবিষ্কার করেছিলেন আমাদের পক্ষে জানা এখন আর সম্ভব নয়। কিন্তু পুলিশের ওপর মহলে সুশান্তদের লোক ছিল। সেই লোক, যার নামটাও আমরা সম্প্রতি জানতে পেরেছি, সুকৌশলে কানুনগোকে বদলি করে দিলেন। একই সঙ্গে কল্পনা দত্ত হত্যা মামলার কিছু অতি দরকারি নথিও লোপাট করে দেওয়া হল। কল্পনা দত্তকে যে হত্যা করা হয়েছে সেই সত্যটাই প্রকাশ্যে এল না। ফলে কল্পনা দত্তর মামলা সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেল। এর জন্য অবশ্য উক্ত পুলিশকর্তাটিকে একটা অবিশ্বাস্য রকম ঘুষ দিতে হয়েছিল, কিন্তু সুশান্তদের আর যাই হোক টাকার অভাব কোনও দিনই ছিল না। কল্পনা দত্তকে খুন করানোটা বকুলের দ্বিতীয় কাজ। এই কাজটা তাকে খানিকটা বাধ্য হয়েই করতে হয়েছিল।

'মন্টুবাবুর বাড়ির পেছনের গলিটাতে অবশ্য আগের মতোই কেনাবেচা চলছিল। সুশান্ত-বকুলের মনে হল, ওই গলিটার ওপর একটা ভাল মতো নজরদারি দরকার। নজরদারিটা সব থেকে ভাল করে করা যায় মন্টুবাবুর বাড়ি থেকে। সুশান্ত-বকুলদের দলে শ্রীলেখা বলে একটি মেয়ে ছিল। কলেজ থেকেই শ্রীলেখা বকুলের অভিন্নহৃদয় বন্ধু। বকুল জানত জয়পুরে কল্পনা দত্তর এক খুড়তুতো বোন থাকে। সম্ভবত কল্পনাই বকুলকে গল্প করেছিল। বকুল এটাও বুঝেছিল যে কল্পনার বোনকে মন্টু দত্তর মনে থাকার কথা নয়। ব্যাপারটা সে কথায় কথায় মন্টু দত্তর কাছ থেকে যাচাইও করে নিয়েছিল। কল্পনা দত্তর বোনকে চিনত একমাত্র কল্পনা দত্ত নিজে, কিন্তু সে-ই তো আর নেই। তাই সুশান্ত এবং বকুল শ্রীলেখাকে আলপনা সামন্ত অর্থাৎ কল্পনা দত্তর খুড়তুতো বোন সাজিয়ে মন্টু দত্তর সামনে হাজির করল।

'শ্রীলেখা কলেজে ভাল অভিনয় করত। সে খানিকটা মেক আপ নিয়ে চেহারায় একটা গ্রাম্যতা আনল। সামনে দুটো নকল দাঁত লাগাল। তারপর সুলতার মাসি সেজে মন্টু দত্তর বাড়িতে পাকাপাকি জায়গা করে নিল। সে ওপর ওপর সুলতার দেখাশোনা করত আর তলায় তলায় মন্টুবাবুর বাড়ির পেছনের গলিতে মাদক কিনতে আসা খদ্দেরদের তদারকি করত। মন্টুবাবু তাকে পাইকপাড়ার বাড়িতে থাকতে দিলেন। শ্রীলেখার টাকা-পয়সার কোনও প্রয়োজন ছিল না। বেআইনি রাস্তায় তার প্রচুর রোজগার ছিল। তবু লোককে দেখানোর জন্য সে নিয়মিত ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকা তুলত। যে টাকাটা সে প্রত্যেক সপ্তাহে তুলত তাই দিয়ে তার

একদিনের খরচটাও চলত কিনা সন্দেহ। ফলে তার টাকা তোলার সঙ্গে তার মাসিক বা সাপ্তাহিক খরচের কোনও সম্পর্কই ছিল না। আসলে, ব্যাঙ্কে যাবার পিছনে তার অন্য একটা উদ্দেশ্য ছিল। সে তার পড়শিদের দেখাতে চাইত সে স্বাভাবিক একজন মহিলা। তার জীবনে কোনও রহস্য নেই, লুকোছাপা নেই। সে চাইত সবাই তাকে বারবার দেখুক। একদিন যে তাকে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যেতে হবে সেটা তার মাথায় ছিল না। আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি, মাসে মাসে 'পান্থজনের সখা'র লন্ডন আপিস থেকে কুড়ি হাজার টাকা তার ব্যাঙ্কে জমা পড়ত।

'সুলতার নকল মাসির ছবি রত্নাদের কলেজে কেউ চিনতে পারেনি। কিন্তু ওই ছবিটাতে পুলিশের আর্টিস্ট খানিকটা রদবদল ঘটিয়ে যেটা দাঁড় করিয়েছিল, সেটা 'পান্থজনের সখা'র শ্রীলেখা ভট্টাচার্য বলে সঙ্গে সঙ্গে আইডেন্টিফায়েড হয়ে গেল।

'বছর পাঁচেক সুশান্তদের নিরুপদ্রবে কাটল। তারপর, তাদের দুর্ভাগ্য, ইন্সপেক্টার কানুনগো গোবরায় বদলি হয়ে এলেন। এমন হতেই পারে যে এটা নিছক কাকতালীয়। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস ব্যাপারটা এরকম নয়। ইন্সপেক্টার কানুনগো নিজেই খানিকটা চেষ্টা করে ওই অঞ্চলে বদলি নিয়ে এসেছিলেন, এমনটা হবার সম্ভাবনাই ষোলোআনা। হয়তো, কল্পনা দত্ত হত্যা মামলার তদন্ত করতে গিয়ে তিনি সুশান্ত-দেবীদের কার্যকলাপের কোনও সূত্র পেয়েছিলেন, হয়ত তিনি টের পেয়েছিলেন গোবরা অঞ্চলের একটি ড্রাগ ডিলারদের গ্যাং এই হত্যার পেছনে আছে। ওপরওলার অঙ্গুলিহেলনে যে কল্পনা দত্ত হত্যা মামলাটা পুরোপুরি চাপা পড়ে গেল, বলাই বাহুল্য, এটা তাঁর মত সৎ এবং কর্তব্যনিষ্ঠ অফিসারের ভাল লাগেনি। তাই অনুসন্ধানটা আবার নতুন করে শুরু করার একটা সুযোগ তিনি খুঁজছিলেন। এবং সেই কারণেই তাঁর গোবরায় আসতে চাওয়া। তবে এসবই আমার অনুমান।

আদিত্য একটু থামল। একঢোঁক জল খেল। চা এসেছে। চায়ের কাপে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে আদিত্য আবার শুরু করল।

'বদলি হয়ে আসার পরেই ইন্সপেক্টার কানুনগো কাজে লেগে গেলেন। তাঁর মনে হল, মন্টুবাবুর বাড়ির পেছনের গলিটার মধ্যে কোনও একটা রহস্য আছে। দেবীরঞ্জন বসাক, সুশান্ত হালদার, আব্দুল আজিজ এদের সকলের সম্বন্ধেই তিনি একটু একটু করে জানতে পারলেন। তিনি কল্পনা দত্তর সূত্র ধরে একদিন মন্টু দত্তর বাড়িতে হাজির হলেন। দেখলেন সেখানে কল্পনা দত্তর এক বোন রয়েছেন। সেই বোনের সঙ্গে কথা বলে কিন্তু তাঁর বেজায় খটকা লাগল। অনুসন্ধান করতে গিয়ে কল্পনা দত্তর অতীত সম্বন্ধে তিনি যতটা জেনেছিলেন, তাঁর মনে হল, এই মহিলা তার কিছুই জানে না। এই মহিলা তাহলে কে? প্রশ্নটা তাঁর মনে ঘুরতে লাগল।'

'শ্রীলেখা বকুলকে ঘটনাটা জানাল। বলল, কানুনগো তাকে সন্দেহ করছে। বকুল শ্রীলেখাকে উধাও হয়ে যেতে বলল। ফলে ইন্সপেক্টার কানুনগো ওই অঞ্চলে বদলি হয়ে আসার দু'মাসের মধ্যেই সুলতার মাসি চিরতরে উধাও হয়ে গেলেন। আমরা অবশ্য তার খোঁজ পেয়েছি। আমরা জানতে পেরেছি তিনি গত কয়েক বছর যাবত 'পান্থজনের সখা'র লন্ডন অফিসটা দেখাশোনা করেন। প্রসঙ্গত জানাই, ইন্সপেক্টার কানুনগো, আসল আলপনা সামন্তের একটা ছবি জোগাড় করেছিলেন, যে ছবিটা আমরা তাঁর ডায়েরির ভেতরে পেয়েছিলাম। রামানুজবাবু কনফার্ম করেছেন এটা তাঁর বহুদিন আগে চেনা আলপনা দত্তরই ছবি। ছবিটা দেখে আমারও একটা খটকা লেগেছিল, কিন্তু কেন খটকা লাগছে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারিনি। পরে বুঝতে পারলাম, ছবির মেয়েটির সঙ্গে মন্টুবাবুর মেয়ে সুলতার একটা অতি সূক্ষ্ম মিল আছে। মাসি-বোনঝির চেহারার মধ্যে ওইটুকু মিল তো থাকতেই পারে। আর আসল আলপনা দত্তর অন্য যে ছবিটা, যেটা রামানুজবাবুর কাছে ছিল, সেটা যে বকুলই কোনও এক ফাঁকে সরিয়ে ছিল এবিষয়ে আমি নিশ্চিত।

'ওই বছরেই সুলতার বিয়ে হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সুলতার বিয়ে দিয়ে দেবার পরামর্শটা আমার অনুমান রজনীবাবুই দিয়েছিলেন। মন্টুবাবু এখানে থাকলে কনফার্ম করতে পারতেন। সবকিছুর আড়ালে অবশ্যই

বকুল। মন্টুবাবুর বাড়িটা ফাঁকা হয়ে গেলে তাদের কাজ করতে সুবিধে হবে।' আদিত্য থামল। রত্নাবলীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'দাঁড়া, বারান্দা থেকে একটা সিগারেট খেয়ে আসি।'

'এখানেই খা। পারমিশন দিলাম। তবে একটা। আর নয়।' রত্না বলল, 'জমাটি গল্পের মাঝখানে উঠতে পারবি না।'

আদিত্য সিগারেট ধরাল, গৌতমের ইশারায় সাড়া দিয়ে তাকেও একটা ধরিয়ে দিল। মালিনী কটমট করে দুজনের দিকে তাকাল। রত্না উঠে গিয়ে বারান্দার দরজাটা খুলে দিতে আদিত্য আবার বলতে লাগল,

'সুলতার বিয়ে হয়ে যাবার পর মন্টুবাবুর বাড়ি ফাঁকা হয়ে গেল। মন্টুবাবু সারাদিন বাড়ি থাকেন না, অনেক রাত্তিরে ফেরেন। বাড়িতে তো কেউ নেই, কার কাছেই বা ফিরবেন? ফলে সুশান্তদের খুব সুবিধে হয়ে গেল। পেছনের গলিটা তারা অবাধে তাদের কুকাজের জন্য ব্যবহার করতে লাগল। কিন্তু ইতিমধ্যে কানুনগোও একটু একটু করে এগোচ্ছেন। গৌতম তাকে পুরো সাপোর্ট দিচ্ছে। বছর দু'য়েকের মধ্যে এমন অবস্থা হল যে ইন্সপেক্টার কানুনগো গ্যাংটাকে প্রায় ধরে ফেলেন আর কি। এই সময় সুশান্ত আর বকুল মিলে একটা প্ল্যান করল।

'বলছি বটে সুশান্ত আর বকুল মিলে, কিন্তু আমার বিশ্বাস প্ল্যানটা বকুলের মস্তিষ্কপ্রসূত একটা মাস্টারস্ট্রোক। অন্য কেউ হলে তদন্তটাকে ভুল পথে চালিত করার জন্য দলের চুনোপুঁটি দু'একটাকে ধরিয়ে দিয়ে ভান করত এরাই যেন রাঘব বোয়াল। বকুল ঠিক উল্টোটা প্ল্যান করল। দলের একেবারে মাথা সুশান্ত হালদার তার সাগরেদ দেবীকে নিয়ে পুলিশের কাছে ধরা দেবে। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে যে প্রমাণগুলো পুলিশের হাতে কৌশলে তুলে দেওয়া হবে তা দিয়ে তাদের বেশিদিন ধরে রাখা যাবে না। সব মিলিয়ে পুলিশের ধারণা হবে তারা যাদের ধরেছে সেই সুশান্ত এবং দেবী নেহাতই চুনোপুঁটি। ফলে পুলিস একজন কাল্পনিক রহস্যের মেঘনাদের খোঁজে ছুটে বেড়াবে। আর পাকাপাকিভাবে পুলিশের নজর সুশান্তর ওপর থেকে সরে যাবে। এই টোপটা কানুনগোর মতো অভিজ্ঞ পুলিস অফিসারও সাময়িকভাবে গিলে ফেললেন।

'সুশান্ত-দেবী জেলে যাবার পর বাইরে থেকে আব্দুল ব্যবসা চালাতে লাগল আর অন্তরালে রইল বকুল। বকুল আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিল মন্টুবাবুর বাড়িটার ওপর পাকাপাকিভাবে কব্জা না করতে পারলে বেশিদিন ওই গলিটায় ব্যবসা চালানো যাবে না। সে সুশান্তর সঙ্গে আলোচনা করে রেখেছিল, সুশান্তরা জেলে যাবার পরেই সে মন্টুবাবুকে বিয়ে করে পাকাপাকিভাবে ওই বাড়িতে বাস করতে শুরু করবে। নিজের শরীর ব্যবহার করা নিয়ে বকুলের কোনও বাতিক ছিল না। সুশান্তর একটু আপত্তি ছিল বটে, কিন্তু বকুলের ঠাণ্ডা যুক্তির কাছে তাকে হার মানতে হল। প্রসঙ্গত, বকুল-সুশান্তর শারীরিক সম্পর্ক বহুদিনের, একথা সুশান্তই আমাদের বলেছে। তাছাড়া কলেজের ছাদে সুশান্তর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে জানাজানি হয়ে যায়। এবং এই কারণে কলেজ থেকে বকুলকে রাস্টিকেট করা হয়।

'বকুল নিশ্চিত ছিল একাকী মন্টুবাবু এক কথায় তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যাবেন। পুরুষের চোরা-চাহনির অর্থ তার থেকে ভাল কে বুঝবে? অতএব রজনীকে দিয়ে বিবাহের প্রস্তাব পাঠানো হল। বকুল এটাও জানত যে একবার বিয়ে হয়ে গেলে সে মন্টুবাবুকে পুরোপুরি বশে রাখতে পারবে। সেটা যে কতটা সত্য সেটা মন্টুবাবুর কথা শুনে প্রথম দিনেই বুঝতে পেরেছিলাম। বকুল মন্টুবাবুকে বিয়ে করার বছর দেড়েক পরে সুশান্ত এবং দেবী জেল থেকে বেরোল।

'আগে থেকেই ঠিক ছিল জেল থেকে বেরোনোর পরে রজনীবাবুর সঙ্গে দেবী-সুশান্ত প্রকাশ্যে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করে দেবে। নাটকের ব্লুপ্রিন্ট আগেই তৈরি ছিল, নাটক মঞ্চস্থ হল, দেবীরঞ্জন সুশান্ত সমভিব্যহারে সর্বসমক্ষে দাদার বাড়ি থেকে বিতাড়িত হলেন। তারপর তারা দুজন মিলে সাইবার কাফে শুরু করল, পাড়ার সবাই ভাবল ছেলে দুটো ভাল হয়ে গেছে। এর কিছুদিন পর থেকে ভূতুড়ে টেলিফোনের উপদ্রব শুরু হয়।

'মণ্টুবাবু যেদিন ভূতুড়ে টেলিফোনের সমস্যা নিয়ে প্রথম আমার কাছে এলেন, আমার মনে হয়েছিল তিনি যে সমস্যাটা নিয়ে এসেছেন আসল সমস্যা সেটা নয়। যেন নকল একটা সমস্যা নিয়ে কেউ তাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে। কেন আমার এরকম মনে হল এককথায় বলতে পারব না, হয়ত একটা ইন্টুইশন কাজ করছিল। হয়তো মনে হয়েছিল এত সামান্য কারণে কেউ এতগুলো টাকা খরচ করে না। তাই প্রথম প্রথম আমার মন্টুবাবুকেই সন্দেহ হচ্ছিল। তারপর একদিন আমি আমাদের মেসের চাকর বলরামের একটা কথায় হঠাৎ ভূতুড়ে টেলিফোনের আসল অর্থ বুঝতে পারলাম। বলরাম বলছিল, রোজ সকালে একজন বোর্ডারের ঘর থেকে ভেসে আসা অ্যালার্ম ঘড়ির শব্দে তার ঘুম ভেঙে যায়। সামান্যই কথা। কিন্তু আমার মনে হল এমনও তো হতে পারে, টেলিফোনটা বাজে অন্য কাউকে শোনানোর জন্য। মন্টুবাবুর বাড়ির কেউ ফোনটা ধরল কি ধরল না সেটা অপ্রাসঙ্গিক।

'আমি মনে মনে একটা থিয়োরি খাড়া করলাম। মন্টুবাবুর বাড়ির পেছনে একটা নির্জন গলি আছে। গলিটাতে এমনিতে লোক যাতায়াত নেই। কানা গলি, একদিক বন্ধ। গলিতে ঢোকার মুখে এক গাদা আবর্জনা পড়ে থাকে। তাই গলিটাকে কেউ ব্যবহার করে না। বস্তুত, ড্রাগ-ডিলাররাই নিয়মিত গলির মুখে আবর্জনা ফেলে যায়, যাতে গলিটাতে কেউ না ঢোকে। এবার ধরা যাক কোনও নেশাড়ুর নেশার বস্তু কেনা দরকার। তার কাছে একটা টেলিফোন নম্বর আছে। সে জানে একটা বিশেষ টেলিফোন বুথ থেকে তাকে এই নম্বরে ফোন করতে হবে। ওপারে কেউ হ্যালো হ্যালো বললেও উত্তর দেওয়া চলবে না। তারপর তাকে দশ মিনিটের মধ্যে মন্টুবাবুর বাড়ির পেছনের গলিতে পৌঁছে যেতে হবে। একটু পা চালিয়ে হাঁটলে সেটা অসম্ভব নয়। সেখানে পৌঁছলে নগদ টাকার বিনিময়ে সে হাতে হাতে নেশার বস্তু পেয়ে যাবে। কেমন করে এটা সম্ভব হচ্ছে?

'খেয়াল করতে হবে, মন্টুবাবুর টেলিফোনটা যখন বাজছে তখন সুশান্তর সাইবার কাফে থেকে সেটা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। সাইবার কাফের কোথাও নেশার বস্তু মজুত করা আছে। টেলিফোনের আওয়াজ শুনে সুশান্ত একজন সাগরেদকে মাল সুদ্ধু পাঠিয়ে দিচ্ছে। সে সাইবার কাফের পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গলির মধ্যে খদ্দেরের জন্য অপেক্ষা করছে। একদিন মন্টুবাবুর ছাদে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতে যখন বকুলের সঙ্গে কথা বলছিলাম তখন এই ব্যাপারটাই ঘটেছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তে ঠিক খেয়াল করতে পারিনি। পরে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলাম। অর্থাৎ ভূতুড়ে টেলিফোনের একটা উদ্দেশ্য আছে। তার উদ্দেশ্য খদ্দের যে আসছে এই বার্তা বিক্রেতার কাছে পৌঁছে দেওয়া। আইডিয়াটা বকুলের মাথা থেকেই বেরিয়েছিল।'

'আমার থিয়োরিটা যাচাই করার জন্য গৌতমের কাছে খোঁজ নিয়ে জানাতে বললাম, মন্টুবাবুর টেলিফোনটা গত দু'বছরে কতবার খারাপ হয়েছে। গৌতম খোঁজ নিয়ে জানাল, একবারও হয়নি। এটা অস্বাভাবিক। আগে কিন্তু টেলিফোনটা মাঝে মাঝে খারাপ হত। যেমন সব টেলিফোন হয়। বুঝলাম, কেউ টেলিফোন কোম্পানির লোকেদের টাকা-পয়সা খাইয়ে টেলিফোনটা যাতে ঠিক থাকে সেই ব্যবস্থা করে রেখেছে। বলাই বাহুল্য, কোটি টাকার ব্যবসা যে টেলিফোনের ওপর নির্ভর করছে তাকে কখনই খারাপ হতে দেওয়া যায় না। নিশ্চিন্ত হলাম, আমার ভাবনাটা ঠিক পথেই চলছে।

'সুশান্তর সাইবার কাফে অবশ্য মাঝে মাঝে পুলিশ রেড করত। কিন্তু রেড হবার আগাম খবর উক্ত পুলিশকর্তা মারফত আগেই সুশান্তদের কাছে পৌঁছে যেত। তারা তখন তাদের স্টক সবসুদ্ধু মন্টুবাবুর বাড়িতে বকুলের জিম্মায় চালান করে দিত। রেড শেষ হয়ে গেলে আবার মালপত্র ফিরে আসত সাইবার কাফেতে। আমরা শেষ যেদিন সাইবার কাফে রেড করলাম, সেদিনও আগে থেকে খবরটা পৌঁছে গিয়েছিল, ফলে সাইবার কাফের পুরো স্টকটাই মন্টুবাবুর বাড়িতে পাচার করা হয়েছিল। আমরা অবশ্য এরকমই আশা করছিলাম। এতে আমাদের এটাই সুবিধে হল যে পুরো স্টকটাই আমরা এক সঙ্গে একটা জায়গায় পেয়ে গেলাম। 'পান্থজনের সখা'র আপিসও যে রেড করা হবে সেটা অবশ্য গৌতম আর আমি ছাড়া আর কেউ জানত না। সেখান থেকেও আমরা কিছু মাল উদ্ধার করেছি।

'যাই হোক, ভূতুড়ে টেলিফোনের মাধ্যমে ড্রাগ বিক্রির কাজে বাধা পড়ল যখন ইন্সপেক্টার কানুনগো এই রহস্যটা ধরতে পারলেন। পুরো রহস্যটা তিনি ধরতে পেরেছিলেন কিনা জানি না, তবে এই ভূতুড়ে টেলিফোন নম্বরটি তিনি জোগাড় করতে পেরেছিলেন। আমরা এই নম্বরটা তাঁর ডায়েরির মধ্যে পেয়েছিলাম। বলাই বাহুল্য, টেলিফোন নম্বরটি খুব নিয়মিত খদ্দের ছাড়া কাউকে দেওয়া হত না। দুর্ভাগ্যবশত সুশান্তরাও তাদের বেতনভুক পুলিশকর্তাটির কাছ থেকে জানতে পারল কানুনগো টেলিফোন নম্বরটি পেয়ে গেছেন। ফলে কানুনগোকেও মরতে হল।

'মন্টুবাবু আমার কাছে টেলিফোন রহস্য সমাধানের জন্য এলেন কেন? কেউ কি তাঁকে পাঠিয়েছিল? নাকি তিনি নিজে নিজেই আমার কাছে এসেছিলেন? প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা আগে দিই। আগেই বলেছি, সুশান্তরা জানত পুলিশের কাছে ভূতুড়ে টেলিফোন নম্বরটা পৌঁছে গেছে। যে পুলিশকর্তাটি সুশান্তদের কাছ থেকে নিয়মিত টাকা পেতেন তিনিই এই খবরটা সুশান্তদের জানিয়ে দিয়েছিলেন। এটা জানার পর দুটো পথ খোলা ছিল। এক, ভূতুড়ে টেলিফোন নম্বরটা পুরোপুরি বাতিল করে দিয়ে মাল বিক্রির সম্পূর্ণ নতুন কোনও উপায় বার করা। দুই, কোনোভাবে পুলিশকে বোঝানো যে ভূতুড়ে টেলিফোনের পেছনে খুব সাধারণ কোনও গল্প আছে। অতএব নম্বরটা নিয়ে আর তদন্তের দরকার নেই। ভূতুড়ে টেলিফোনের সাহায্যে ব্যবসাটা এতটাই ভাল চলছিল এবং এতগুলো নিয়মিত খদ্দের এইভাবে মাল কেনার ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে সুশান্ত-বকুলরা ভাবল ভূতুড়ে টেলিফোন একেবারে বাতিল করে দেবার আগে দ্বিতীয় রাস্তাটা চেষ্টা করা যাক। যদি সেটা কাজ না করে তখন না হয় ভূতুড়ে টেলিফোনের মধ্য দিয়ে মাল বিক্রি পুরো বন্ধ করে দেওয়া যাবে। কিন্তু পুলিশকে কি করে বোঝানো যায় যে আসলে ভূতুড়ে টেলিফোনের পেছনে খুব সাদামাটা কোনও কাহিনি আছে?

'সুশান্তরা তাদের বেতনভুক পুলিশকর্তাটির মাধ্যমে জানতে পেরেছিল যে আদিত্য মজুমদার বলে একটি বেসরকারি গোয়েন্দা আছে যার সঙ্গে জয়েন্ট কমিশনার ক্রাইম গৌতম দাশগুপ্তর গলায় গলায় ভাব। আদিত্য মজুমদারকে যদি ভূতুড়ে টেলিফোনের কোনও আষাঢ়ে গল্প বিশ্বাস করানো যায় তাহলে সেটা গৌতম দাশগুপ্ত পর্যন্ত পৌঁছে যাবার ষোলোআনা সম্ভাবনা। এই বিশ্বাস করানোর কাজটা সম্পন্ন করার জন্যই আমার কাছে মন্টুবাবুর আগমন। অর্থাৎ যাকে ইংরেজিতে বলে 'ফিডিং মিস-ইনফরমেশন' সেই উদ্দেশ্য নিয়েই মন্টুবাবু আমার কাছে এসেছিলেন।

'এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন, মন্টুবাবু কি স্বেচ্ছায় এই কাজে এসেছিলেন নাকি তাঁর অজান্তেই কেউ তাঁকে ব্যবহার করেছিল? আমার প্রথমে মনে হয়েছিল যে আমার কাছে আসার পেছনে মন্টুবাবুর অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে। মন্টুবাবু সাবধানী ব্যবসাদার, তিনি তেমন কারণ ছাড়া পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করবেন কেন? পরে তাঁর আসার কারণটা বুঝতে পারলাম। দ্বিতীয়বার বিয়ে করার পর থেকে মন্টুবাবু এক মুহূর্তের জন্য সুখ পাননি। বকুল তাঁকে মন কোনোদিনই দেয়নি, কিছুদিন পর থেকে, বিশেষ করে সুশান্ত হালদার জেল থেকে বেরোনোর পর থেকে, নানা অছিলায় শরীর দেওয়াও বন্ধ করে দিয়েছিল। আমার বিশ্বাস, প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে কল্পনা দত্তর মতো মন্টু দত্তকেও সরিয়ে দেওয়া হত।

'বকুলের ওপর জোর খাটানো মন্টুবাবুর পক্ষে সম্ভব ছিল না। অথচ বকুলের শরীর ও ব্যক্তিত্ব তাঁকে দিনরাত্রি আকর্ষণ করত, আগুন যেমন পতঙ্গকে টানে। তাঁর মনে হচ্ছিল সুশান্তর সঙ্গে বকুলের একটা গভীর সম্পর্ক আছে, কিন্তু তাঁর কাছে কোনও প্রমাণ ছিল না। প্রমাণ পেলেই বা তিনি কী করতেন তা অবশ্য আমার জানা নেই। যাই হোক, রজনীবাবু যখন তাঁকে আমার বন্ধু সুনন্দর কাছে যেতে পরামর্শ দিলেন এবং সুশান্তদের বেতনভুক পুলিশকর্তাটির সাহায্যে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টও করিয়ে দিলেন, তখন মন্টুবাবু রাজি হয়ে গেলেন। ভাবলেন, হয়তো সুশান্ত-বকুলের সম্পর্কে কিছু দরকারি কথা জানা যাবে। সুনন্দ মন্টুবাবুকে আমার কাছে পাঠাল। সুশান্তরা ঠিক এটাই আশা করেছিল।

'সুশান্তর গল্প মন্টুবাবুকে যখন বললাম, তিনি ভেতরে ভেতরে ছেলেমানুষের মত খুশি হয়ে উঠলেন। যদিও ওপর ওপর চিন্তিত হওয়ার ভান বজায় রাখলেন। তিনি ভাবলেন, বকুল এবার পুরোপুরি তাঁর হয়ে যাবে। তিনি যে খুশি হয়েছেন সেটা বুঝলাম যখন তিনি চলে আসার সময় আমার হাতে নগদ চল্লিশ হাজার টাকা গুঁজে দিলেন। কোনও ঝানু ব্যবসাদার এত সহজে টাকা খরচ করে না।

আদিত্য থামল। রামানুজ চট্টোপাধ্যায়ের দিকে তাকিয়ে বলল,

'রামানুজবাবুও সেদিন অনেক সাহায্য করেছেন। তিনি পেছন দিক থেকে মন্টুবাবুর বাড়ির ওপর নজর রাখছিলেন। আমরা যখন লালবাজারের ভেতরে রটিয়ে দিলাম যে সুশান্তদের সাইবার কাফে, আব্দুলের আড্ডা এবং পরিত্যক্ত কারখানা রেড করা হবে, আমরা জানতাম এই খবর অচিরেই সুশান্তদের কাছে পৌঁছে যাবে, ঠিক যেমন আগেও কয়েকবার গিয়েছিল। ফলে, অনুমান করেছিলাম, সুশান্তরা সাময়িকভাবে সমস্ত মাল মন্টুবাবুর বাড়িতে বকুলের জিম্মায় সরিয়ে দেবে। রামানুজবাবু গভীর রাত্তিরে ফোন করে জানালেন, মন্টুবাবুর বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে মাল ভেতরে ঢুকেছে। আমরা নিশ্চিন্ত হলাম।'

'আমার একটা প্রশ্ন আছে' রামানুজবাবু মিহি গলায় বললেন। 'ধরুন আপনি বকুল-সুশান্তদের আসল প্ল্যানটা ধরতে পারলেন না। আর আপনার কথা শুনে মিস্টার দাশগুপ্তও ওই ভূতুড়ে নম্বরটা নিয়ে ইনভেস্টিগেশন বন্ধ করে দিলেন। তাহলে মন্টুবাবুকে নিয়ে বকুল-সুশান্ত কী করত? সুশান্ত কি মন্টুবাবুর কাছে ব্ল্যাকমেলের টাকা চাইত? তাহলে তাকে কিছু ইনক্রিমিনেটিং ডকুমেন্টও তো তৈরি করতে হত।'

'এই প্রশ্নটা নিয়ে আমিও ভেবেছি। হয়তো কিছু চিঠি এবং ছবি তৈরি করে মন্টুবাবুর কাছ থেকে ওরা কিছু টাকা আদায় করে নিত। কিংবা হয়তো কিছুই না করে কিছুদিন ওরা মন্টুবাবুকে লেজে খেলাত। ঠিক কোনটা করত সেটা অনুমানসাপেক্ষ। হয়ত প্রথমটাই করত যাতে আমি মন্টুবাবুর কাছ থেকে খবর পেয়ে গৌতমকে জানিয়ে দিই এবং ভূতুড়ে টেলিফোনের আসল গল্পটা ব্ল্যাকমেলের গল্পের আড়ালে চাপা পড়ে যায়। কিন্তু একবারে ব্ল্যাকমেলের পুরো টাকাটা ওরা নিত না। ভূতুড়ে টেলিফোন কল জিইয়ে রাখার একটা উপায় ওরা ঠিকই বের করত। তবে একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। ভূতুড়ে টেলিফোন নম্বর নিয়ে পুলিশ ইনভেস্টিগেশন বন্ধ করে দিলে মন্টুবাবুর জীবনের দাম এক কানা কড়িও থাকত না। তাঁর প্রথম স্ত্রীর মতো তাঁকেও সরিয়ে দেওয়া হতো। ভূতুড়ে টেলিফোন নম্বর নিয়ে পুলিশ ইনভেস্টিগেশন বন্ধ হয়েছে কিনা সেই খবর সুশান্ত-বকুলরা তাদের বেতনভুক পুলিশকর্তাটির কাছ থেকেই পেয়ে যেত।'

'বকুল দত্তকে আপনি কীভাবে সন্দেহ করলেন?' আবার রামানুজবাবুর প্রশ্ন।

'বকুল-সুশান্তর বেতনভোগী পুলিশ কর্তাটিকে আমরা আইডেনটিফাই করতে পেরেছি। যদিও প্রমাণের অভাবে আমরা তাঁর কিছুই করতে পারতাম না, আমরা ব্লাফ দিলাম। বললাম, তাঁর বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। আমরা তাঁকে ছেড়ে দেব এই শর্তে তিনি বকুল-সুশান্তদের অর্গানাইজেশনটা সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য আমাদের জানালেন। বলাই বাহুল্য, তাঁকে আমরা ছাড়ছি না। বকুলের পুরো স্টেটমেন্টটা পেলে হয়ত ওই পুলিশ কর্তাটিকে ইনক্রিমিনেট করতে পারব।'

'আমার একটা কথা শোন। তুই যে সেদিন বকুলের সঙ্গে লাঞ্চ খেতে বেরিয়েছিলি সেটা আমরা জানতে পেরেছে। গৌতম আমাদের বলেছে। আমার কথা হল, তুই বকুলের সঙ্গে লাঞ্চ খেতে গিয়েছিলি কেন?' রত্না আদিত্যকে চেপে ধরেছে।

'বলতে পারিস ওটা একটা শো ডাউন। পরস্পর পরস্পরকে যাচাই করে নেওয়ার একটা ঠাণ্ডা যুদ্ধ। আমার একটা সুবিধে ছিল। বকুল জানত আমি কে এবং আমি জানতাম যে বকুল আমার আসল পরিচয় জানে। কিন্তু বকুল জানত না যে আমিও বকুলের আসল পরিচয় জানি। বোধহয় ভেবেছিল আমি ওর প্রেমে পড়ে গেছি। খেতে খেতে লক্ষ করলাম বকুলের দু'জন বডিগার্ড বাইরে গাড়িতে অপেক্ষা করছে। আশ্বস্ত হলাম, বকুলই দলের মাথা।'

'শো ডাউন না ছাই। গৌতম বলছিল, আদিত্য মেয়েটার বেধড়ক প্রেমে পড়ে গেছে। নাহলে ওর বুদ্ধির এত প্রশংসা করে। বলছিল, এবার আদিত্যটার একটা বিয়ে দিতে হবে। নয়ত কোন ক্রিমিনালের সঙ্গে কবে ভিড়ে যাবে কে জানে।' রত্না আদিত্যকে ছাড়বে না।

আদিত্য একটা উত্তর দিতে গিয়েও চুপ করে গেল। তার মনে পড়ে গেল গতকাল রাত্তিরেও সে বকুলকে স্বপ্নে দেখেছে।

(২)

বলরাম ঘরে ঢুকে দেখল আদিত্য একমনে কাজ করছে। বলরামকে দেখে বলল,

'এটা কী জানিস? এটাকে বলে ল্যাপটপ।'

'কী নাম বললেন? এটা তো কম্পিউটার। বসিরহাট থেকে এক বাবু হোটেলে আসেন, তাঁর কাছে দেখেছি।'

'ঠিকই বলেছিস। এটা একটা ছোট কম্পিউটার। সঙ্গে নিয়ে ঘোরা যায়।'

'কিনলেন, নাকি কারো কাছ থেকে নিয়ে এলেন? এসব জিনিসের তো দাম খুব।'

আদিত্যর সামর্থের ওপর বলরামের খুব একটা ভরসা নেই।

'কিনলাম রে। নগদ পঞ্চান্ন হাজার দিয়ে কিনলাম।'

'প-ঞ্চা-ন্ন হা-জা-র?' বলরামের গলায় স্পষ্ট অবিশ্বাস।

'পুরো পঞ্চান্ন হাজার। পুলিশের কাছ থেকে একটা পাঁচ লাখ টাকার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি জানিস। মানে পাঁচ লাখ টাকার পুরস্কার। আমি এখন বড়লোক।'

বলরাম কিছু বলতে পারল না। তার চোখদুটো ছানাবড়া হয়ে গেছে। আদিত্য বলল,

'তোকেও একটা পুরস্কার দিতে হবে। তুই অ্যালার্ম ঘড়ির কথাটা না বললে ভূতুড়ে টেলিফোনের আসল রহস্যটা আমার মাথাতেই আসত না। ভাবছি তোকে একটা ভাল অ্যালার্ম ঘড়ি কিনে দেব।' আদিত্য জুত করে একটা সিগারেট ধরাল।